শিক্ষা বিচার

বিনোবা

সর্ব সেবা সংঘ প্রকাশন

প্রকাশক ঃ
পরমেশ বসু
সর্বোদয় প্রকাশন সমিতি
সি-৫২ কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট
কলিকাতা ১২

মুদ্রক ঃ
শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বাগ
ব্রাহ্ম মিশন প্রেস
২১১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট
কলিকাতা ৬

মূল্য ঃ
তিন টাকা পঞ্চাশ নয়াপয়সা

প্রথম প্রকাশ ৩,৩০০ কপি
এপ্রিল ১৯৫৮

प्रकाशक :
परमेश वसु
सर्वोदय प्रकाशन समिति
सि-५२ कलेज ष्ट्रीट मार्केट
कलिकाता १२

मुद्रक :
श्रीदेबेन्द्रनाथ वाग
ब्राह्म मिशन प्रेस
२११ कर्णओयालिस ष्ट्रीट
कलिकाता ६

मूल्य :
तिन रुपये पचास नये पैसे

पहलीबार: ३,३०० कपि
एप्रिल १९५८

शिक्षा-विचार

विनोबा

अनुवाद :

रणेन्द्रकुमार दास



ভূমিকা

বর্তমান গ্রন্থে বিনোবাজীর বিভিন্ন সময়ে রচিত শিক্ষাবিষয়ক কয়েকটি প্রবন্ধের বাঙলা অনুবাদ সংগ্রহ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। বিনোবাজীর শিক্ষাসম্বন্ধীয় ও সাধারণ চিন্তাধারার সহিত পরিচিত হইবার এই সুযোগ দান করিয়া অনুবাদক যে বাঙালী পাঠকগণের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন এ বিষয়ে সন্দেহ নাই।

ভূদান আন্দোলনের প্রবর্তক হিসাবে আজ বিনোবার নাম এদেশের ঘরে ঘরে ছড়াইয়া পড়িয়াছে ও পড়িতেছে। তিনি গান্ধীজীর সুপরিচিত উত্তর-সাধকগণের মধ্যে অন্যতম। স্বাধীনতালাভের পর গান্ধীজীর প্রধানতম শিষ্য ও সহকর্মীদের মধ্যে অনেককেই সদ্য স্বাধীন এই নবীন রাষ্ট্রের ভার লইয়া সরকারী কাজের মধ্যে জড়াইয়া পড়িতে হইল। অল্প যে কয়জন সেদিকে গেলেন না বিনোবা তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম, শ্রেষ্ঠ বলিলেও অন্যায় হইবে না। যাঁহারা রাষ্ট্রশাসনের ভার লইলেন তাঁহাদের কাজ যে সহজ ছিল না বা হইল না গত দশ বৎসরের ভারতবর্ষের ইতিহাস তাহার সাক্ষ্য দিবে। গান্ধীজীর এই শিষ্যদের চেষ্টার ফলে যে ভারতবর্ষীয় রাষ্ট্র ও সমাজ ধীরে ধীরে রূপ ধারণ করিতে চলিয়াছে তাহা ঠিক কিরূপ হইবে বা তাহা গান্ধীজীর পরিকল্পনা অনুযায়ী হইবে কিনা সে কথা আজ বলা কঠিন। তবে একথা সকলেই স্বীকার করিবেন যে গান্ধীজী শুধু রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার কথা বলেন নাই, তিনি যে ধরণের স্বাধীনতার কথা বলিয়াছিলেন তাহা আরও ব্যাপক, আরও সুদূরপ্রসারী। সে স্বরাজ ব্যক্তিগত ও রাষ্ট্রীয়জীবনের সকল স্তর ব্যাপিয়া জুড়িয়া থাকিবে ইহাই ছিল তাঁহার পরিকল্পনা।

গান্ধীজীর শিষ্যবর্গের মধ্যে যাঁহারা রাষ্ট্রগঠনের ভার লইবেন তাঁহারা হয়তো বলিবেন যে গান্ধীজীর পরিকল্পিত স্বরাজ তো একদিনে আসিবে না, সে স্বরাজ কঠিন সাধনার ফলে ধীরে ধীরে প্রতিষ্ঠিত হইবে এবং তাহার জন্য সর্বপ্রথমে রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার ভিত্তি দৃঢ়তর করিয়া তুলিতে হইবে। উহা হইয়া যাইলে তবে অন্যসব ধীরে ধীরে আসিবে। যাঁহারা এ ধরণের মত পোষণ করেন তাঁহাদের সঙ্গে তর্ক করা শুধু নিষ্ফল নহে, নিষ্প্রয়োজনও বটে। মানুষ বড় না সমাজ বড়, সমাজ আগে না রাষ্ট্র আগে এ ধরণের তর্কের কোনদিনই নিরসন হয় না, কারণ এই তিনটিই এমন অঙ্গাঙ্গীভাবে পরস্পরের সহিত যুক্ত যে লোকে রুচি ও মত অনুযায়ী ইহাদের পৌর্বাপর্য স্বীকার করে। তবে একথা ঠিক যে যাঁহারা এ ধরণের মত পোষণ করেন তাঁহাদের দৃষ্টি স্বভাবতই যায় শাসন-ব্যবস্থার দিকে; সাক্ষাৎভাবে সমাজগঠনের চেষ্টা সে ব্যবস্থার অঙ্গীভূত হয় কিনা বলা কঠিন, হইলেও গৌণভাবে, মুখ্যত নহে। সাধারণ-ভাবে বলিতে পারা যায় যে প্রতীচ্যের ও বহুল পরিমাণে বর্তমান প্রাচ্যের জননায়ক ও রাষ্ট্রনেতারা এই পথেই চলিতেছেন।

বিনোবা কিন্তু এপথে যান নাই, যাঁহারা এ পথ গ্রহণ করিয়াছেন তাঁহাদের সমালোচনা বা বিরুদ্ধাচরণ করেন নাই; তিনি সম্পূর্ণ এক নূতন পথে গান্ধীজী প্রবর্তিত ধারা পরিচালিত করিয়া লইয়া যাইতে চাহিয়াছেন।

সমাজরচনা প্রসঙ্গে গান্ধীজী সর্বোদয়ের কথা বলিয়াছেন, তিনি অহিংসার উপর প্রতিষ্ঠিত, সম্পূর্ণভাবে বিকেন্দ্রিত শোষণবিহীন যে সমাজ ও রাষ্ট্রতন্ত্রের পরিকল্পনা করিয়াছেন তাহা সেই সর্বোদয়েরই বাহরূপ। সে সমাজে ও রাষ্ট্রে মানুষ সর্বতোভাবে নিরাসক্ত হইয়া প্রেম ও প্রীতির ভিত্তিতে নবসমাজ রচনা করিবে। বিনোবার দৃষ্টি সেই সর্বোদয়ের দিকে। বিনোবা নবসমাজ রচনা করিতে চান, কাঞ্চনমুক্তি, ভূদান আন্দোলন, গ্রামদান, সম্পত্তিদান, নঈ-তালীম, বুনিয়াদী শিক্ষা এ সকলই তাঁহার সেই নবসমাজ রচনার উপায় সরূপ।

এই কথাটি না বুঝিলে বিনোবাজীর শিক্ষাবিষয়ক এই প্রবন্ধগুলির সম্যক্ তাৎপর্য আমরা বুঝিতে পারিব না। এইজন্যই এই বিষয়ের অবতারণা করিলাম।

বিনোবা প্রকৃতই শিক্ষক, লোকশিক্ষক। বস্তুত বিনোবার দৃষ্টিতে গ্রামদান আন্দোলন করুন বা না করুন শিক্ষক লোকশিক্ষক। তিনি শুধু বিদ্যালয়ের গৃহকক্ষেই তাঁহার শিক্ষাদান সীমাবদ্ধ রাখেন না তাঁহার প্রভাব শিক্ষার্থীর জীবনের ও সমাজের সকল স্থান জুড়িয়া থাকে। প্রচলিত শিক্ষা-ধারায় শিক্ষকের কর্ম অধিকাংশ ক্ষেত্রে শ্রেণীকক্ষেই পর্যবসিত হয়, এক আধজন শিক্ষকের প্রভাব শিক্ষার্থীর জীবনের বিস্তৃততর ক্ষেত্রে ছড়াইয়া পড়ে। তাহার একটা বড় কারণ এই যে এই পুরাতন শিক্ষার সহিত জীবনের যোগসূত্র সর্বত্র সুস্পষ্ট নহে। পুরাতন শিক্ষাধারার সহিত গান্ধীজী প্রবর্তিত নঈ-তালিমের এইখানে বড় পার্থক্য। এখানে আমি শুধু বৃত্তিমূলক শিক্ষার কথা বলিতেছি না, সমগ্র জীবনের কথা বলিতেছি, যে জীবন নিজের ও অপরের সেবায়, কর্মে, প্রেমে ও আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া ওঠে। আচার্য বিনোবা সেই শিক্ষার কথাই বলিয়াছেন, তিনি তাই সমগ্র জীবনকেই শিক্ষার কেন্দ্ররূপে দেখিয়াছেন; তিনি তাই বলিয়াছেন শিক্ষার্থীকে পূর্ণভাবে জীবনযাপন করিতে দিতে হইবে। তিনি বার বার এই জীবনধর্মী শিক্ষার কথা বলিয়াছেন। যাঁহারা বর্তমানকালের শিক্ষাশাস্ত্র চর্চা করেন তাঁহাদের কাছে আচার্যের এই কথাগুলি অত্যন্ত সুপরিচিত ঠেকিবে। কারণ বর্তমান শিক্ষা-শাস্ত্রের ইহা মূল উপজীব্য বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। রুশো হইতে ডিউই পর্যন্ত সকল শিক্ষাতাত্ত্বিক এই কথাটির উপর জোর দিয়াছেন। সে হিসাবে বর্তমান গ্রন্থ যে রুশোর শিক্ষানীতির সমালোচনার দ্বারা আরম্ভ ইহা সুষ্ঠুই হইয়াছে।

আসল কথা এই যে নবসমাজ পরিকল্পনা বাদ দিয়া নঈ-তালিমের পরিকল্পনা দুর্বল হইয়া যায়। আজ যে দেশে বুনিয়াদী শিক্ষা চলিতেছে না, চলিলেও তাহার বাহ্য কাঠামোটাই হইতেছে তাহাতে প্রাণপ্রতিষ্ঠা হইতেছে না, তাহার মূল কারণ আমাদের এই নবসমাজ গঠনের সাহস নাই। এই ধরণের সমাজ ও রাষ্ট্র আজিকার জগতে চলিবে কিনা এ বিষয়ে আমাদের মনে যথেষ্ট সংশয় আছে। কিন্তু আচার্য বিনোবার সম্মুখে ভবিষ্যৎ সুস্পষ্ট, ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা সুস্পষ্ট। এবং সেই পথে শিক্ষার কি কাজ হইবে তাহাও সুস্পষ্ট। তাই তিনি শিক্ষাসম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন।

বিনোবা তাঁহার দৃষ্টিভঙ্গী হইতেই বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থার, সরকারী ও বেসরকারী শিক্ষাপ্রচেষ্টার সমালোচনা করিয়াছেন। এমন কি 'বুনিয়াদী' নামে প্রচলিত শিক্ষাপ্রচেষ্টাও তাঁহার সমালোচনার বিষয়ীভূত হইয়াছে। নঈ-তালীমকে তিনি একটি বিশিষ্ট প্রকারের চিন্তাধারারূপে দেখিয়াছেন। তাহার নূতন ব্যাখ্যাও দিয়াছেন। যাহা হউক তাঁহার এই সমালোচনাগুলি যাঁহারা নঈ-তালীমে বিশ্বাসী তাঁহারা তো শ্রদ্ধার সহিত পাঠ করিবেনই, আর যাঁহারা শিক্ষার সাহায্যে অনতিবিলম্বে নবসমাজ রচনা করিতে নাও চাহিয়াছেন, যাঁহারা প্রচলিত শিক্ষাধারার কথঞ্চিৎ হেরফের করিয়া সংস্কার সাধন করিয়া চলিতে চাহিয়াছেন তাঁহারাও মন দিয়া শুনিতে পারেন, এ বিষয়ে চিন্তা করিলে তাঁহারাও উপকৃত হইবেন।

বিনয় ভবন
শান্তিনিকেতন
১৮ এপ্রিল ১৯৫৮

শ্রীঅনাথনাথ বসু

দো শব্‌দ

ইস্ পুস্‌তক মেঁ শিক্‌ষণ সম্‌বন্‌ধী মেরে বিচারোঁ কা সংগ্‌রহ কিয়া গয়া হৈ। ইস্‌মেঁ কে ৫-৭ লেখ 'মধুকর' মেঁ আ চুকে হৈ, ফির ভী একত্‌র সংগ্‌রহ কে লিয়ে ইস্‌মেঁ লে লিয়ে গয়ে হৈঁ। মেরা সারা জীবন হী শিক্‌ষণ-কার্‌য় মেঁ বীতা হৈ ঔর বীত রহা হৈ। কভী আত্‌ম-শিক্‌ষণ চলা ঔর কভী বিদ্‌য়ার্‌থিয়োঁ কা শিক্‌ষণ। ইসলিয়ে পাঠকোঁ কো ইসমেঁ কেবল অনুভবপূর্‌ণ বিচার হী মিলেংগে স্‌বচ্‌ছন্‌দ বিচার নহীঁ।

দস বর্‌ষ কে ভীতর সারে দেশ মেঁ নবীন শিক্‌ষণ চালূ করনে কা সংকল্‌প দেশ নে কিয়া হৈ। এয়্‌সে অবসর পর য়হ পুস্‌তক বহুত উপয়োগী হোগী, এয়্‌সী মৈঁ আশা করতা হূঁ।

ডাংগরস্থরূড়া
(কোরাপুট, উড়ীসা) বিনোবা
৩১. ৮. ৫৫

দু'টি কথা

এই বইয়ে শিক্ষা সম্বন্ধে আমার বিচার-ধারা সংগ্রহ করা হয়েছে। এর মধ্যেকার কয়েকটি লেখা 'মধুকর'এ ইতিপূর্বে প্রকাশিত হয়েছিল। তবু একত্র সংগ্রহ করার জন্যে তা এ বইয়েও সংকলিত হয়েছে। আমার সারাজীবন শিক্ষার কাজে অতিবাহিত হয়েছে, এখনও হচ্ছে। কখনও আত্ম-শিক্ষা, কখনও বা ছাত্র-শিক্ষার কাজ হয়েছে। কাজেই এ বই থেকে পাঠক কেবল অনুভবপূর্ণ বিচারই পাবেন, স্বচ্ছন্দ-বিচার নয়।

দশ বছরের মধ্যে সারা দেশে নতুন শিক্ষা-ব্যবস্থা প্রবর্তন করার সংকল্প দেশ গ্রহণ করেছে। এ সময় এ বইটি খুবই উপযোগী হবে বলে আমি আশা করি।

ডাংগরস্থরুড়া
(কোরাপুট, উড়িষ্যা) বিনোবা
৩১. ৮. ৫৫

সূচীপত্র

শিক্ষা-বিচার

বিনোবা

মুক্ত শিক্ষা

[ফরাসী গ্রন্থকার রুশোর 'এমিলী' নামে শিক্ষা-বিজ্ঞানের পুস্তক সম্বন্ধে কোন এক সভায় সভাপতির যে-ভাষণ দেওয়া হয়েছিল তারই বিচার-সার কিছু অদলবদল করে উদ্ধৃত করা হল]

রুশোর প্রতিভা

ফরাসী রাষ্ট্র-বিপ্লব সম্পর্কে ফরাসী চিন্তানায়ক রুশো ও ভলটেয়ারের নাম সমধিক প্রসিদ্ধ। এই দুই লেখকের ভাষায়, চিন্তাপ্রণালীতে ও রচনাশৈলীতে তেজস্বিতা, জীবন্তভাব এবং বৈপ্লবিক মনোভাব পরিস্ফুট। শক্তিমান নৃপতিদের বাহুবল হতেও প্রভাবশালী ছিল তাঁদের লেখনী,—জনসাধারণ তাঁদের লেখনীকেই বেশী ভয় করত। বস্তুত রুশো ভলটেয়ারের রচনাগুলিই পরবর্তীকালে ফরাসী রাষ্ট্র-বিপ্লব সম্ভব করে তুলেছিল। এঁদের মধ্যে রুশো ছিলেন বিশেষভাবে ভাবপ্রধান—প্রবন্ধাদি লিখবার জন্যে তিনি কখনও অলঙ্কারশাস্ত্র পড়েননি।

আগ্নেয়গিরির উত্তপ্ত লাভাপ্রবাহ যেমন ভিতরের প্রচণ্ড শক্তিতে আগ্নেয়গিরির গহ্বরে স্থির থাকতে না পেরে প্রবলবেগে উর্ধ্বে উৎক্ষিপ্ত হয়, তেমনি লাভা হতেও জ্বালাময়ী ভাবগুলি রুশোর অনিচ্ছা সত্ত্বেও এবং তিনি না চাইতেই তাঁর লেখনীমুখে নিঃসৃত হত—তাঁর লেখাতে সরাসরি হৃদয়ের কথা পাওয়া যায়—এইজন্য তাঁর বিচারগুলি খুব যুক্তিসহ না হলেও ইতিহাস তাঁকে জ্বলন্ত পাবক বলে স্বীকার করে নিয়েছে। তাঁর রচনাগুলির মূলসূত্রই ছিল মৃত জীবন থেকে জীবিত মৃত্যু শ্রেয়।

এই প্রভাবশালী ও প্রতিভাবান লেখকের শিক্ষা সম্বন্ধীয় বিচারসমূহ গভীরভাবে চিন্তা করে দেখা দরকার।

শিক্ষার তিন বিভাগ

রুশোর মতে শিক্ষাকে তিনভাগে ভাগ করা যায়—যথা, [১] স্বাভাবিক শিক্ষা, [২] ব্যক্তি বা সমাজ থেকে প্রাপ্ত শিক্ষা, ও [৩] ব্যবহারিক শিক্ষা।

যে শিক্ষাদ্বারা শরীরের প্রত্যেক অবয়বের পূর্ণ এবং সুশৃঙ্খল বিকাশ সাধন করা যায়, ইন্দ্রিয়গুলি দক্ষ, শক্তিশালী ও কার্যকুশল হয়ে ওঠে, বিভিন্ন মনোবৃত্তির সর্বাঙ্গীন স্ফূরণ হয় এবং স্মৃতি, প্রজ্ঞা, মেধা, স্থৈর্য, যুক্তি প্রভৃতি চিত্তবৃত্তিগুলি কুশল ও প্রখর হয়, সেই শিক্ষাকে স্বাভাবিক শিক্ষা (নিসর্গ শিক্ষা) বলা হয়। অর্থাৎ রুশোর মতে নৈসর্গিক

প্রবৃত্তিগুলির শিক্ষাকে নিসর্গ শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত করা যায়।

ভাষান্তরে নিসর্গ শিক্ষার দ্বারাই মানুষের শারীরিক, মানসিক ও বৌদ্ধিক তথা আত্মিক বিকাশ হয়। তদনুরূপ প্রকৃতি ও সমাজ থেকে মানুষ যে-স্থান লাভ করে এবং কর্মের দ্বারা যে-অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে, এই সমস্ত বাহ্য-বস্তুর জ্ঞান বা ভৌতিক জ্ঞানকে রুশো ব্যবহারিক শিক্ষা বলে অভিহিত করেছেন। কার্যগত অভিজ্ঞতার দৃষ্টিতে নিসর্গ শিক্ষালব্ধ বিকশিত বৃত্তিগুলি কিভাবে বহির্জগতে কাজে লাগানো যায়, সেই সম্পর্কে শিক্ষকগণ যে মৌখিক ও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা দেন সেই শিক্ষাকে রুশো ব্যক্তি-শিক্ষা নাম দিয়েছেন। অর্থাৎ রুশোর মতে ব্যক্তি-শিক্ষা নিসর্গ শিক্ষা ও ব্যবহারিক শিক্ষাকে যুক্ত করে দেয়।

বস্তুত রুশো শিক্ষার কয়টি ভাগ করেছেন সেটাই বড়ো কথা নয়,—এমন কোন ধরাবাঁধা নিয়ম নেই যে অমুক বিষয়ে নির্দিষ্ট কয়েকটি ভাগ করতে হবে। কারণ, বিষয়টি অনুশীলন করতে যে-কয়টি ভাগ করলে সুবিধা হয় সে-কয়টি ভাগ করাই উচিত। পক্ষান্তরে বিষয়টি যে-দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করা হবে, তার উপরই বর্গীকরণ নির্ভর করবে। সুতরাং রুশো শিক্ষার যে তিনটি ভাগ করেছেন, সেটাই যে সব অবস্থায় প্রয়োজন তা নাও হতে পারে। কারণ ব্যক্তি-শিক্ষাই হোক আর ব্যবহারিক শিক্ষাই হোক—উভয়েরই উৎস বহির্জগৎ।

কেবল নিসর্গ শিক্ষাই অন্তর হতে লাভ করা যায়। এই দিক থেকে দেখলে ভিতরের শিক্ষা আর বাইরের শিক্ষা—শিক্ষার এই দুই ভাগ করলে দোষ কি? এই দৃষ্টিকে আর একটু প্রসারিত করলে একথা বলা যেতে পারে যে, যেহেতু বাহ্য-শিক্ষা সম্পূর্ণ অভাবাত্মক এবং ভিতরের শিক্ষা ভাবাত্মক (যা আছে তার বিকাশ), সেহেতু শিক্ষার একটিমাত্র সংজ্ঞা হতে পারে—তা হচ্ছে ভিতরের শিক্ষা এবং এইটিই শিক্ষার একমাত্র সত্য বা তাত্ত্বিক বিভাগ।

বাহ্য-শিক্ষার অবিরল উৎস

উপরোক্ত বাহ্য-শিক্ষা যে কেবল শিক্ষকের কাছেই পাওয়া যায় তা নয়, প্রকৃতপক্ষে এই অনন্ত বিশ্বের প্রত্যেক বস্তু থেকেই মানুষ নিরন্তর বাহ্য-শিক্ষা লাভ করছে। এই শিক্ষায় কখনও বাধা উপস্থিত হয় না। শেক্সপীয়ার বলেছেন, প্রবহমানা স্রোতস্বিনীর মধ্যে স্বচ্ছ সাবলীল ভাষায় রচিত গ্রন্থসমূহ দেখতে পাই, প্রস্তররাজিতে দর্শনশাস্ত্র লুকায়িত হয়ে আছে আর বিভিন্ন পদার্থের মধ্যে শিক্ষার সমগ্র তত্ত্বটি নিহিত রয়েছে।

ছোটবড় সকল বৃক্ষ, কুসুমসম্ভার, নদী, পাহাড়, আকাশ নক্ষত্ররাজি প্রত্যেকেই নিজ নিজ ভাবে মানুষকে শিক্ষা দিচ্ছে। নৈয়ায়িকদের অণু থেকে সাংখ্যের মহৎ তত্ত্ব পর্যন্ত, জ্যামিতির বিন্দু থেকে ভূগোলের সিন্ধু পর্যন্ত আর বাল্যকালের এক

উক্তি অনুসারে 'উচ্চ পর্বতশৃঙ্গ থেকে তুলসীর মূল পর্যন্ত' সকল ক্ষুদ্রবৃহৎ বস্তুই গুরুরূপে আমাদের শিক্ষা দান করছে। বিচক্ষণ বৈজ্ঞানিকের দূরবীণে কুশলী ব্যক্তির চর্মচক্ষুতে, কল্পনাকুশল কবির দিব্য দৃষ্টিতে অথবা যুক্তিবাদী তত্ত্বজ্ঞানীর জ্ঞানচক্ষুতে যে সকল পদার্থ প্রতিভাত হয়, কিম্বা যে সকল পদার্থ অপ্রত্যক্ষ থেকে যায়, এইসব থেকেই আমরা সকল সময় শিক্ষা লাভ করছি। সর্বজনের শিক্ষার জন্যে এই বিশাল সৃষ্টিরূপ এক শাশ্বত, দিব্য, পরমাশ্চর্য ও পবিত্র গ্রন্থ ভগবান উন্মুক্ত করে রেখেছেন। এই কেতাবের সামনে বেদ, কোরান, বাইবেল সবই নিরর্থক ও নির্বল।

বাহ্য-শিক্ষার কার্য অভাবাত্মক

এই গ্রন্থ-গঙ্গা যতই গভীর হোক না কেন, মানুষ আপন পাত্র অনুসারেই তা থেকে জল নিতে পারবে। এই কারণে আমাদের ভিতরে যে জাতীয় ও যে পরিমাণ শিক্ষালাভের ক্ষমতা থাকে সেই জাতীয় সেই পরিমাণ শিক্ষাই আমরা বহির্বিশ্ব থেকে আহরণ করতে পারি—এই অভিজ্ঞতা আমাদের প্রত্যেকেরই রয়েছে।

আমরা সকলে কত বই পড়ি, কত বিষয় শিখি, কত যুক্তি-তর্ক শুনি এবং কত বস্তু দেখি। কিন্তু এ সকল হতে আমাদের প্রত্যয়ে কতটুকু উদ্ভাসিত হয়? মোট কথা বাহ্য জগৎ হতে গৃহীত বিভিন্ন অনুভূতি আমাদের মনে থাকে না। কেবল

বিচিত্র অনুভূতি হতে উদ্ভূত সংস্কারগুলি বাকী থেকে যায়, অর্থাৎ শিক্ষা অথবা বিষয়জ্ঞান ক্রমে সংস্কার বা সহজ জ্ঞানে পরিণত হয়। আগেই বলেছি যে, আমাদের ভিতরে যার সম্ভাবনা নেই, বাহির থেকে তাকে লাভ করা অসম্ভব এই কারণে শিক্ষার এইরূপ পরিণাম ঘটে। সুতরাং নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে যে, বাহ্য-শিক্ষা অভাবাত্মক, এই শিক্ষা কোন নিরপেক্ষ স্বতন্ত্র তাত্ত্বিক বস্তু নয়।

চিরন্তন বিবাদ

এইরূপ দার্শনিক তত্ত্ব-বিচার ক্ষেত্রে সাধারণত একটি dilemma বা কূট-সমস্যার উদ্ভব হয়। এই ক্ষেত্রে বলা যেতে পারে যে, ধরা যাক্ বাহ্য-শিক্ষার কোন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নেই, অথচ সত্যসংস্কার গড়বার জন্যে বাহ্য নিমিত্তের প্রয়োজনও কেউ অস্বীকার করতে পারে না। পক্ষান্তরে বাহ্য-শিক্ষার একটি বাস্তব স্বতন্ত্র অস্তিত্ব স্বীকার করলে দেখা যাবে যে, অন্তর্বিকাশজাত সহজ জ্ঞান কেবলমাত্র ভিতরের তাত্ত্বিক বস্তুর বিকশিত অবস্থা মাত্র নয়, বাহ্য-শিক্ষারূপ সত্যবস্তুও সেই সহজ জ্ঞানের অংশরূপে বর্তমান থাকবে। অর্থাৎ দুই পক্ষেরই বিপ্রতিপত্তি (dilemma) সিদ্ধ হচ্ছে, অস্তিত্ব না থাকলেও অস্তিত্ব সিদ্ধ হচ্ছে, অস্তিত্ব থাকলে বাহ্য-বস্তুও সহজ জ্ঞানের অংশ—এই অসম্ভব সিদ্ধান্তে উপনীত হতে হচ্ছে। এই অবস্থায়

এই দুই শিক্ষার প্রকৃত সম্বন্ধ কি?—এই প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক।

কিন্তু এইরূপ দার্শনিক বাদ-প্রতিবাদ কোন নূতন কথা নয়, এই বিপরীত সিদ্ধান্তও নূতন নয়। এইরূপ বাদ ও এইরূপ সিদ্ধান্ত সকল দার্শনিক বিচারেই দেখতে পাওয়া যায়। উদাহরণ স্বরূপ 'সুখের সঙ্গে বাহ্য-বস্তুর কি সম্বন্ধ'?—এই প্রশ্নের বৈদান্তিক বাদ-প্রতিবাদ সম্বন্ধে বিবেচনা করা যাক্। এখানেও উপরোক্ত প্যাঁচ রয়েছে। যদি বল বাহ্য-বস্তুর মধ্যে সুখের অস্তিত্ব আছে, তাহলে সুখকর বস্তুতে সর্বদা সুখ হওয়া উচিত, কিন্তু তা হয় না। মানসিক অবসাদের অবস্থায় অন্যসময় যে বস্তু সুখকর ছিল তা থেকে সুখানুভূতি হয় না। পক্ষান্তরে যদি বল যে, বাহ্য-বস্তুতে সুখের অস্তিত্ব থাকে না, সুখ মনের বস্তুনিরপেক্ষ অনুভূতিমাত্র, তাহলেও দেখা যায় যে, এই অনুভূতি বস্তুর অভাবে হয় না। শেক্সপীয়ারের কথায় বলা যায়, কল্পনা যদি ঘোড়া হত, তাহলে প্রত্যেকেই ঘোড়-সওয়ার হত। কিন্তু তা হয় না; একথা কঠোর সত্য—অর্থাৎ সত্যিকারের ঘোড়া ছাড়া ঘোড়ায় চড়ার সুখ পাওয়া সম্ভব নয়। তাহলে এই প্রশ্নের প্রকৃত সমাধান কি করে করা যায়?

ঠিক এই রকমেরই ন্যায়শাস্ত্রের একটি উদাহরণ দেওয়া যাক। মাটি ও ঘটের কি সম্বন্ধ?—এই হল প্রশ্ন। যদি বল যে, মাটিও যা ঘটও তাই, তাহলে ঘটে যেমন জল ভরা যায় মাটিতেও তেমনি জল ভরা যাবে। আর যদি বল, মাটি

ও ঘট ভিন্ন ভিন্ন বস্তু, তাহলে বলব—আমার মাটি আমাকে দিয়ে দাও আর তোমার ঘট তুমি নিয়ে নাও। এই অবস্থায় প্রশ্ন ওঠে, বাস্তবিক পক্ষে এই দুইয়ের সম্বন্ধটি তাহলে কি হবে? যদি সোজাসুজি বলে ফেলি যে, সম্বন্ধটির প্রকৃত স্বরূপ কি তা আমি বলতে অক্ষম, তাহলে এই কথায় আমার অজ্ঞতাই প্রকাশ পাবে। এইজন্য এই সম্বন্ধের রুচিসম্মত সর্বজনস্বীকৃত ও মার্জিত নাম দেওয়া হয়েছে—'অনির্বচনীয় সম্বন্ধ'। কিন্তু এই নাম দেওয়া সত্ত্বেও একপক্ষ যেমন তুলনা-মূলকভাবে নির্ণয় করে বলেছেন—'বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং মৃত্তিকেত্যেব সত্যম্'—অর্থাৎ মাটিই সত্য ঘট মিথ্যা, তেমনি তুলনামূলকভাবে বলা যেতে পারে যে, অন্তঃশিক্ষা ভাবাত্মক কার্য আর বাহ্য-শিক্ষা অভাবাত্মক কার্য।

বাহ্য-শিক্ষার 'ভাব' অল্প

কিন্তু এত কথা বলার পরও আর একটি এমন প্রশ্ন থেকে যায় যা পূর্বের সকল সমাধানই ব্যর্থ করে দেয়। আমি শিক্ষাকে দুই ভাগে বিভক্ত করেছি, যথা—অন্তঃশিক্ষা ও বাহ্য-শিক্ষা। এই দুইয়ের মধ্যে অন্তঃশিক্ষা বা আত্মিক বিকাশ নিরপেক্ষ স্বতন্ত্র বস্তু সন্দেহ নেই, কিন্তু এই বস্তু প্রতিটি মানুষের অন্তরতম প্রদেশে বর্তমান থাকে। এই কারণে বিকাশের ব্যাপারে বাহির থেকে আমাদের কিছুই করার নেই। বিকাশের সহায়তা করতে পারে এমন কোন

পাঠ্যক্রমও রচনা করা যায় না ; পাঠ্যক্রম রচিত হলেও তাকে কার্যে প্রয়োগ করা সম্ভব নয়।

অন্য পক্ষে সমষ্টিগতভাবে বাহ্য-শিক্ষা আর ব্যক্তিগতভাবে ব্যক্তি-শিক্ষা উভয়েই অভাবাত্মক—এ সিদ্ধান্তে আমরা উপনীত হয়েছি।

এ অবস্থায় প্রশ্ন ওঠে 'ন হি শশকবিষাণং কোঽপি কস্মৈ দদাতি'—কেউ কাউকে কখনো খরগোসের শিং দেয় না—এই যুক্তি অনুসারে সমগ্র শিক্ষাবিষয়ক প্রচেষ্টাই কি মূর্খতা নয় ?

বাহ্যত এই কাতরোক্তি যতটা নিরুত্তরণীয় ও অভ্রান্ত বোধ হচ্ছে, বস্তুত তা নয়। কারণ, যখন বলা হয় বাহ্য-শিক্ষা অভাবাত্মক তখন এ কথার তাৎপর্য এই নয় যে, এটা কোন কাজই নয়। আসলে বাহ্য-শিক্ষা একটি কাজ এবং প্রয়োজনীয় কাজ, তবে এটি অভাবাত্মক কাজ—অভাবাত্মক বলার প্রকৃত অর্থ এই—অন্তরের মধ্যে যে-ভাব নেই, যে বৃত্তি নেই সে সকলের উদয় করা শিক্ষার উদ্দেশ্য নয়। পক্ষান্তরে সুপ্ত সম্ভাবনাকে জাগ্রত করাই শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য। অধিকাংশ লোকের শিক্ষার উপযোগিতা সম্বন্ধে যে-ধারণা আছে, আসলে শিক্ষার উপযোগিতা তা নয়। কিন্তু তাতেই অবশ্য শিক্ষা অপ্রয়োজনীয় হয়ে যায় না। উগ্র সমাজ-সংস্কারকের বিধবা-বিবাহ আন্দোলনের কাছে সমাজসেবী 'কার্বের' 'বিধবা-বিবাহ-প্রতিবন্ধ-নিবারণ' চেষ্টা বিধবা-বিবাহ প্রচলনের পক্ষে নিতান্তই

অনুপযুক্ত প্রচেষ্টা বলে প্রতীয়মান হলেও বাস্তবিক 'কার্বের' প্রচেষ্টাই যে সমধিক উপযোগী, এ কথা অস্বীকার করবার উপায় নাই। ফলকথা, শিক্ষা উত্তেজক ঔষধের সঙ্গে তুলনীয় নয়, শিক্ষার কাজ হচ্ছে বাধা দূর করা।

রাস্কিন শিল্প ও কলা সম্বন্ধেও অনুরূপ ব্যাখ্যা দিয়েছেন। শিল্পকারকে মৃত্তিকা বা প্রস্তর থেকে মূর্তি তৈরী করতে হয় না, কারণ মূর্তি প্রস্তর বা মৃত্তিকায় সম্ভাবনারূপে লুক্কায়িত থাকে। নিহিত মূর্তিকে প্রকট করাই শিল্পকারের কাজ। অনুরূপভাবে দেখলে এ কথা স্পষ্ট হয় যে, শিক্ষাকার্য অভাবাত্মক কার্য হলেও একটি প্রয়োজনীয় কার্য এবং প্রতিবন্ধ-নিবারণের দ্বারা আত্মবিকাশের সহায়তা করে বলে বাহ্য-শিক্ষায় সামান্য কিছু ভাবাত্মকতারও উদ্ভব হয়। এই কথা মনে রেখেই সাবধানতার সঙ্গে বলা হয়েছে যে, শিক্ষা-কার্য 'তুলনামূলকভাবে অভাবাত্মক'। শিক্ষার অর্থ আত্ম-বিকাশ এইভাবে দেখলে বোঝা যায় যে, শিক্ষা অভাবাত্মক, অর্থাৎ শিক্ষাকার্যে ভাবাত্মকতা খুবই সামান্য।

মূর্খতাপূর্ণ পদ্ধতি

কিন্তু যেহেতু শিক্ষা থেকেই ছাত্রদের ভিতরে যা নেই সেই বস্তু অপরিমেয়রূপে পাওয়া যাবে—এই কথা আমরা বলে থাকি, সেই কারণে আমাদের শিক্ষাপদ্ধতি অত্যন্ত অস্বাভাবিক, বিপরীত ও হাস্যাস্পদ হয়ে গিয়েছে। অল্প-

বয়সের তীক্ষ্ণধী ছেলে-মেয়েদের অত্যধিক পাঠে উৎসাহিত করা হয়। পিতা চান যে, ছেলে-মেয়ের মস্তিষ্কে যত পারা যায় ঢুকিয়ে দেওয়া যাক। বিদ্যালয়েও অনুরূপ শিক্ষাপদ্ধতিই অনুসৃত হয়ে থাকে। পক্ষান্তরে যে-সব ছেলে-মেয়েদের বুদ্ধি তীক্ষ্ণ নয়, তাদের উপেক্ষা করা হয়ে থাকে। বুদ্ধিমান বলে পরিচিত ছাত্ররা কোনমতে কলেজে পৌঁছানো পর্যন্ত টিকে থাকে, কিন্তু প্রায়ই কলেজে গিয়ে তারা আছাড় খায়। আর কলেজে যারা টিকে যায় এবং পরে পাশ করে বেরোয়, তারা কর্মজীবনে অক্ষম প্রতিপন্ন হয়। এর একমাত্র কারণ এই যে, কোমলমতি ছেলে-মেয়েদের অপরিণত বুদ্ধির উপর অতিরিক্ত বোঝা চাপানো হয়ে থাকে। তেজস্বী ঘোড়া ঠিক-মতো চললে তাকে মারধর করার দরকার হয় না। কিন্তু ঘোড়া যদি ছটফটে হয় আর তাকে এই অবস্থায় চাবুক লাগানো যায়, তাহলে কি হয়? ঘোড়া ভড়কে গিয়ে নিজে খানায় পড়বে আর প্রভুকেও সঙ্গে সঙ্গে খানায় ফেলবে। এটা মূর্খতার পরিচায়ক এবং বর্বর পদ্ধতি। এমন পদ্ধতি আর কোথাও না হোক অন্তত জাতীয় বিদ্যালয়গুলিতে বন্ধ করা উচিত।

শিক্ষার রহস্য

বস্তুত যেইমাত্র শিক্ষার্থী মনে করবে সে শিক্ষালাভ করছে অমনি তার শিক্ষার সমস্ত আনন্দই নষ্ট হয়ে যাবে। শিশুদের

পক্ষে খেলাধূলা করাই সব চেয়ে ভাল ব্যায়াম। এই কথারও মর্ম একই—খেলাতে ব্যায়াম হয়ে যায়। কিন্তু আমি ব্যায়াম করছি,—এরকম অনুভূতি তাতে থাকে না। খেলার সময় আশেপাশের সমস্ত জগতই লুপ্ত হয়ে যায়। শিশুরা যেন ধ্যানমগ্ন হয়ে অদ্বৈত অনুভূতিতে লীন হয়ে থাকে। দেহের হুঁসই থাকে না। ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ক্লান্তি, রোগ কিছুরই বোধ থাকে না। মোট কথা, খেলার তাৎপর্য আনন্দ বা মনো-রঞ্জন—এই কথাই সিদ্ধ হয়; খেলা ব্যায়ামরূপ কর্তব্যে পরিণত হয়ে যায় না। সর্বপ্রকার শিক্ষায়ও এই মতই প্রয়োগ করা প্রয়োজন। শিক্ষা একটি কর্তব্য কার্য,—এইরূপ ধারণা কৃত্রিম। এই কৃত্রিম ধারণার পরিবর্তে শিক্ষা একটি আনন্দময় কার্য—এইরূপ স্বাভাবিক ও উৎসাহ-দায়ক ভাবনা সৃষ্টি করা উচিত। শিক্ষা আনন্দময় এই ধারণা তো দূরের কথা। শিক্ষা কর্তব্য কার্য—এই ধারণাও আজকাল বিরল হয়ে পড়েছে। গোলামি মনো-বৃত্তিসম্পন্ন ছাত্রদের মধ্যে শিক্ষা সম্বন্ধে একটিমাত্র ধারণা আছে—তারা মনে করে শিক্ষা শাস্তি ছাড়া আর কিছুই নয়। বালকের মধ্যে জেদ অর্থাৎ স্বাধীন মনোভাবের আভাস পাওয়ামাত্র স্বজনেরা বলাবলি করেন, 'একে এখন পাঠ-শালায় বেঁধে রাখতে হবে।' পাঠশালা কি? না, বেঁধে রাখবার জায়গা। এই মনোভাবের দরুণই শিক্ষকদের পবিত্র কাজটি জেলখানার রক্ষকদের কাজে পর্যবসিত হয়েছে।

শিক্ষাকার্য

কিন্তু এ দোষ কার? শিক্ষাবিষয়ক মতানুসারে আমরা যে-ভ্রান্ত পদ্ধতি অবলম্বন করেছি (কিম্বা কোন পদ্ধতিই অবলম্বন করিনি) দোষ সেই শিক্ষাপদ্ধতির। ছাত্রদের শিক্ষা অজ্ঞাতসারে অর্থাৎ সহজভাবে হওয়া চাই। একেবারে বাল্যাবস্থায় বালকেরা মাতৃভাষা যেমন সহজ পদ্ধতিতে শেখে, পরবর্তীকালের শিক্ষাও অনুরূপ সহজ পদ্ধতিতে হওয়া চাই। ছোট শিশু ব্যাকরণের অর্থ জানে না। কিন্তু সে কখনো 'আমি খেয়েছ' এরূপ বলে না। এর থেকে বোঝা যায় যে, সে ব্যাকরণ বোঝে। 'ব্যাকরণ'—এই কথা হয়তো সে জানে না, কিম্বা ব্যাকরণের সূত্র হয়তো তার জানা থাকে না, কিন্তু ব্যাকরণের আসল কথা তার শেখা হয়ে যায়।

মনে রাখতে হবে যে, উদ্দেশ্য ও উপায় যেন উল্টাপাল্টা না হয়ে যায়। উদ্দেশ্যের জন্যেই উপায়। উপায়ের জন্যে উদ্দেশ্য নয়। যুক্তি সম্বন্ধেও একই কথা। গৌতমের ন্যায়-শাস্ত্র অথবা Aristotle-এর তর্কশাস্ত্র অধ্যয়ন করার চরম উদ্দেশ্য কি? এজন্যে নয় কি যে, এতে চিন্তায় শৃঙ্খলা আসবে এবং তাতে আমরা যথার্থভাবে কার্যকারণ সম্বন্ধ নির্ণয় করতে পারব?

দীপশিখা স্তিমিত হতে দেখলে বালকও তৎক্ষণাৎ এই অনুমান করে থাকে যে, দীপে তেল নিশ্চয়ই কমে গেছে। তার মস্তিষ্কে সমস্ত যুক্তি বর্তমান রয়েছেই। এ কথা বলা

বাহুল্য যে, সে 'পঞ্চাবয়ব' বাক্য বা সিলজিজম দিয়ে কার্য থেকে কারণ নির্ণয় করে দেখাতে পারে না। কিন্তু তার মধ্যে মূলত যুক্তিদ্বারা কারণ নির্ণয় করার শক্তি থাকেই। শিক্ষা তর্কশক্তি সঞ্চার করতে পারে না, শিক্ষা শুধু তর্কশক্তিকে বারবার আহার লাভের সুযোগ দিতে পারে। সকল শাস্ত্র, সকল শিল্পকলা, সকল সদ্‌গুণ বীজরূপে মানুষের অন্তরে আপনা থেকেই থাকে। সেই বীজ আমরা দেখতে পাইনে বলে একথা বলা চলে না যে, এ সকলের বীজ (সম্ভাবনা) আমাদের মধ্যে নেই।

রুশোর বিচার-বিভ্রাট

কিন্তু রুশোর লেখা থেকে অনেক সময়ে মনে হয়েছে যে, উপরোক্ত মত রুশো মানেন না। কারণ তিনি কখনো কখনো এই কথাও বলেছেন যে, মানুষ সম্ভবত দুর্বল ও নীতিহীন। শিক্ষার উদ্দেশ্য মানুষকে বলবান ও নীতিমান করে তোলা। মূলত সে পশু, কিন্তু তাকে মানুষ করে তুলতে হবে। 'পাপোঽহং পাপকর্মাঽহং পাপাত্মা পাপসম্ভবঃ'—'আমি পাপী, আমি পাপ কাজ করি, আমি পাপাত্মা, পাপ থেকেই আমার জন্ম হয়েছে।' তার প্রথম অবস্থার পশুরূপ শিক্ষাদ্বারা পরিবর্তিত হয়ে মনুষ্যরূপে পরিণত হবে—এরকম কথা তিনি কোথাও কোথাও লিখেছেন। এর বিরোধী কথাও যে তাঁর গ্রন্থে পাওয়া যায় না তা নয়।

এই কারণে উপরোক্ত মতই যে তাঁর মত একথা বলা কঠিন।

পক্ষান্তরে যদি ধরে নেওয়া যায় এটাই তাঁর মত, তাহলে একথা বলবার যথেষ্ট কারণ রয়েছে যে দোষ তাঁর নয়—দোষ সেই যুগের এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থার। স্বাধীনচেতা তীক্ষ্ণ-বুদ্ধিসম্পন্ন লোকেরাও সমকালীন 'পরিস্থিতির দাস' না হলেও সেই পরিস্থিতির উর্ধ্বে উঠতে পারেন না। ভেবে দেখুন, রুশোর সময় ফরাসী দেশের কি ভয়াবহ অবস্থা ছিল! আজ (১৯২৩) ভারতবর্ষে একত্রিশ কোটী লোক যেমন পশুবৎ ভয়াবহ জীবন যাপন করছে সেই সময় ফরাসী দেশেও মানুষের অবস্থা অনুরূপ ভয়াবহ ছিল। বস্তুত আগ্নেয়গিরিসদৃশ উগ্র ও প্রচণ্ড উচ্ছ্বাসে পূর্ণ ছিল রুশোর হৃদয়। তাঁর মত অশান্তচিত্ত ভাব-প্রধান ব্যক্তি যদি মানুষের দোষই দেখে থাকেন, তাকে পাপময় ভেবে থাকেন, তাহলে সমসাময়িক অবস্থার কথা বিবেচনা করে তাঁকে ক্ষমা করতে হবে। দাস-মনোভাব দেখলেই তাঁর মন খিঁচড়ে যেত, তাঁর রক্ত গরম হয়ে উঠত আর তিনি সংযম হারিয়ে ফেলতেন। ঐ অবস্থায় মানুষের মধ্যে নানা দুর্নীতি দেখে হয়তো তাঁর ধারণা জন্মেছিল যে, মানুষ পশু-স্বভাব নিয়ে জন্মায় এবং শিক্ষাদ্বারা পরিবর্তিত হয়ে অল্পবিস্তর মানবীয় স্বভাব লাভ করে। এইভাবে দেখলে রুশোর মত কেন এমন হয়েছিল তা আমাদের কাছে পরিষ্কার হতে পারে। কিন্তু রুশোর প্রতি আমাদের যতই সহানুভূতি থাক না কেন, তাঁর

এই মত তিনি যে-অবস্থায় এবং যে-কারণেই ব্যক্ত করে থাকুন না কেন, একথা নিঃসংশয়ে বলা যায় যে, তাঁর উপরোক্ত মত নিতান্ত অসঙ্গত ও অযৌক্তিক।

মানুষ স্বভাবত অসৎপ্রকৃতির নয়

মানুষ স্বভাবত দুষ্টপ্রকৃতির—এই মত মানবজাতির পক্ষে অপমানকর তো বটেই, চরম নৈরাশ্যেরও পরিচায়ক। মানুষের অন্তরতম সত্তা যদি দুষ্ট সত্তা হত তাহলে শিক্ষাদ্বারা তার উন্নতির আশা থাকত না। যেহেতু কোন বস্তুর ধর্ম সেই বস্তু থেকে পৃথক করা সম্ভব নয়, সেহেতু মানুষ যদি মূলত অসৎ হয়ে থাকে তাহলে তাকে পরিবর্তিত করে সৎ করাও অসম্ভব হবে (কেননা তার ধর্ম থেকে তাকে পৃথক করা যাবে না)। আর তাকে কখনও সৎ করা যাবে না—এই মত স্বীকার করলে সমাজে ঘোরতর নিরাশার সৃষ্টি হবে এবং পাশবিকতার রাজত্ব সুরু হয়ে যাবে। কারণ, শিক্ষাদ্বারা মানুষের সংশোধন হবে না—এ ধারণা দৃঢ়বদ্ধ হয়ে গেলে ভয় দেখিয়ে মানুষকে শাসনে রাখা ছাড়া আর কোন উপায় থাকবে না। অর্থাৎ এই নিরাশাবাদ থেকেই দণ্ডমূলক রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হবে।

আজকাল অনেকেই না ভেবে-চিন্তে আবেগভরে বলে থাকেন, বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের উপর থেকে চিরতরে আমাদের বিশ্বাস চলে গিয়েছে। সাধারণত এই জাতীয় উক্তির মধ্যে উচ্ছ্বাসই থাকে। যদি সত্যই বিশ্বাস না থাকত তাহলে

সমস্ত অহিংস আন্দোলনই 'নিরাশাবাদের আন্দোলনে' পর্যবসিত হত। স্বাবলম্বী ব্যক্তি ঠিকই বলে থাকেন যে, গভর্ণমেন্টের উপর বিশ্বাস করলে কাজ হয়না। কিন্তু এই কথার অর্থ যদি এই হয় যে, ইংরেজের হৃদয় নেই, সুতরাং সংশোধন হওয়া সম্ভব নয়, তাহলে অহিংস আন্দোলনের অর্থ হবে—'যমেরও অসাধ্য রোগের চিকিৎসা'। 'প্রত্যেক মানুষেরই আত্মা আছে'—এই মৌলিক বিশ্বাসই সত্যাগ্রহ অথবা শিক্ষার মূল ভিত্তি। শত্রুদের আত্মা নেই—এই কথা মেনে নিলে যেমন সত্যাগ্রহের মৃত্যু হয়, তেমনি মানুষ স্বভাবত অসৎ—এ ধারণা থাকলে শিক্ষা থেকে ফলপ্রাপ্তির অধিকাংশ আশাই নষ্ট হয়ে যাবে। ফলে, 'চাবুক পড়ে সপাসপ্, বিদ্যা আসে ঝপাঝপ্'—এই বাক্যই শিক্ষার যথার্থ সূত্র হয়ে দাঁড়াবে। এইজন্যেই চিন্তাশীল তত্ত্বজ্ঞানী শিক্ষাবিদেরা সুনিশ্চিতভাবে জানেন যে, মানুষের মনে পূর্ণতার সমস্ত ভাব বীজরূপে স্বতঃই বর্তমান রয়েছে।

সহজ শিক্ষাই সত্যকার শিক্ষা

এই সঙ্গত সিদ্ধান্ত স্বীকার করলেই দেখা যাবে যে, আজকালকার শিক্ষাপদ্ধতি অত্যন্ত হাস্যাস্পদ ও ভ্রান্তিপূর্ণ। এই সিদ্ধান্ত অনুসারে 'শিক্ষার উদ্দেশ্য হচ্ছে সুযোগ্য নাগরিক তৈরী করা'। কিন্তু এই সমস্তই ভিত্তিহীন বলে প্রমাণিত হবে। শিক্ষা দেওয়ার সময় শিক্ষার প্রভাব শিক্ষার্থীদের উপর পড়তে

দেখে শিক্ষক যদি মনে করেন যে, এ তাঁরই গৌরব, এ তাঁরই কীর্তি, তাহলে বলতে হবে শিক্ষার প্রকৃত তত্ত্ব সম্বন্ধে তাঁর কোন জ্ঞানই নেই। আগেই বলা হয়েছে যে, শিক্ষাপদ্ধতি এমন হওয়া উচিত যাতে ছাত্রদের একথা মনে না হয় যে, তারা শিক্ষালাভ করছে। আর তাই যদি আমরা চাইব, তাহলে সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষকেরও মন থেকে গুরুগিরির ভাবটি দূর করে দিতে হবে, যাতে তাঁর কখনও মনে না হয়—'আমি ছাত্রদের শিক্ষা দিচ্ছি'। গুরু সহজভাবে শিক্ষা না দিতে পারলে ছাত্র স্বাভাবিকভাবেই শিক্ষালাভ করতে পারবে না। ছাত্রদের যদি বলা হয় যে, তাদের যে-পদ্ধতিতে শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে তা একটি নামকরা পদ্ধতি (যথা—ফ্রোবেল, পেস্টাঁলাঁজী অথবা মণ্টেসরী), তাহলে শুধু নামের জন্যে তাদের মনে কোন সাড়া জাগে না। তারা বুঝে নেয় যে, এই শিক্ষা কতকগুলি কথা-মাত্র, বিশেষ কোন শিক্ষাপদ্ধতির অর্থহীন অনুকরণ, এতে প্রাণের স্পর্শ নেই। শিক্ষা বীজগণিতের ফরমুলা নয় যে, প্রয়োগমাত্র উত্তর বেরিয়ে আসবে। আজকালকার শিক্ষা শিক্ষাই নয় এবং পদ্ধতিও প্রকৃত পদ্ধতি নয়। শিক্ষা কি ? না, বীজের অন্তর্নিহিত প্রেরণার স্বতঃস্ফূর্ত বহিঃপ্রকাশ।

শিক্ষার অনির্বচনীয় স্বরূপ

সহজ শিক্ষা দোষযুক্ত হলেও চলতে পারে, কিন্তু বিশিষ্ট পদ্ধতির দাস হয়ে ধরাবাঁধা নিয়মে যান্ত্রিক শিক্ষায় সহজ

শিক্ষা হয় না। কারণ, আসলে শাস্ত্র হচ্ছে কতকগুলি প্রাণহীন নিয়মের সমষ্টি। এ ছাড়া প্রচলিত শাস্ত্রের আর কি অর্থ হতে পারে? শিক্ষা-বিজ্ঞানী স্পেন্‌সার (Spencer) শিক্ষা-বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় গ্রন্থে ব্যক্ত করেছেন—'শিক্ষাদ্বারা লোকোত্তর পুরুষের সৃষ্টি করা যায় না'।

তাহলে এরকম শাস্ত্রের মূল্য কি? সত্যিকারের শাস্ত্র তো বলবে—'এতদ্ বুদ্‌ধ্বা বুদ্ধিমান্ স্যাৎ কৃতকৃত্যশ্চ ভারত' —হে অর্জুন! এই জ্ঞান লাভ করলে বুদ্ধিমান এবং কৃতকৃত্য হয়ে যাবে। যে শাস্ত্র নিশ্চিতভাবে একথা বলতে পারে না সে শাস্ত্র তো মানুষকে ধোঁকা দেওয়ার এক সুন্দর ব্যবস্থা ছাড়া আর কিছু নয়। শেক্সপীয়ার কোন্ নাট্যশাস্ত্র পড়েছিলেন? অলঙ্কারশাস্ত্র কণ্ঠস্থ করে কি কেউ কখনও প্রতিভাবান কবি বা কাব্যরসিক হয়েছেন? 'শাস্ত্র', 'পদ্ধতি' এসব কতকগুলি প্রাণহীন কথা ছাড়া আর কিছু নয়, এদের কোন গুরুত্ব নেই। ভ্রান্তিবশতই এদের এত গুরুত্ব দেওয়া হয়ে থাকে। 'যাস্তেষাং স্বৈরকথাস্তা এব ভবন্তি শাস্ত্রাণি'— ভর্তৃহরির এই বাক্য খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। বাস্তবিকই শ্রেষ্ঠ পুরুষদের বাণীই শাস্ত্র। শিক্ষা-বিজ্ঞান সম্বন্ধেও এই মতই প্রযোজ্য।

কোন পদ্ধতি ছাড়াই যা পদ্ধতিযুক্ত বা নিয়মিত হয় এবং যা কোন গুরু দিতে পারেন না, অথচ আপনিই প্রদত্ত হয়, তা-ই হচ্ছে শিক্ষার অনির্বচনীয় স্বরূপ। এইজন্যেই দিব্যদৃষ্টি-

সম্পন্ন মহাপুরুষেরা বলেছেন যে, শিক্ষা কি করে দেওয়া যায় তা তাঁরা জানেন না—'ন বিজানীমঃ' (কেন উপনিষদ)। সুতরাং শিক্ষাপ দ্ধতি, পাঠ্যক্রম, রুটীন এসব অর্থহীন শব্দমাত্র। এসব আত্মবঞ্চনা ছাড়া আর কিছুই নয়। বস্তুত প্রাণধারণের নানা উপায় থেকে শিক্ষা পাওয়া চাই। যখন জীবনযাত্রার সঙ্গে যুক্ত নানা কর্ম ব্যতীত 'শিক্ষা' নামে এক স্বতন্ত্র ক্রিয়ার প্রভাব শিক্ষার্থীদের উপর পড়ে তখন শরীরে বিষ প্রবেশ করলে যেমন শরীর অসুস্থ হয়ে পড়ে তেমনি মনের উপর শিক্ষার বিষক্রিয়া লক্ষিত হয়। কর্ম ব্যতীত জ্ঞান-ক্ষুধার উদ্রেক হয় না। আর ক্ষুধিত না হয়ে যদি জ্ঞানকে অন্তরে গ্রহণ করা যায়, তাহলে সেই অবস্থায় ঐ জ্ঞান হজম করার শক্তি মনের পাকযন্ত্রে থাকে না।

মস্তিষ্কের মধ্যে কেবল কতকগুলি বই ঢুকিয়ে দিতে পারলেই যদি মানুষ জ্ঞানী হত, তাহলে লাইব্রেরীর আলমারী-গুলিও জ্ঞানী হতে পারত। জোর করে জ্ঞান ঢুকিয়ে দেওয়াতে বদ্‌হজম হয়ে বুদ্ধি বিকৃত হতে থাকে আর তাতে মানুষের নৈতিক মৃত্যু ঘটে।

নিবৃত্ত-শিক্ষার ব্যাখ্যা

ছাত্র-শিক্ষা সম্বন্ধে যে কথা খাটে জন-শিক্ষা বা লোক-সংগ্রহ সম্বন্ধেও সে কথা প্রযোজ্য। মহাপুরুষদের সম্মুখে সাধারণ লোকেরা শিশুর সমান। আচার্য ভীষ্ম আজীবন

ব্রহ্মচারী ছিলেন। প্রশ্ন উঠেছিল, অপুত্রক ব্রহ্মচারীর সদ্‌গতি কি করে হবে? তখন বলা হল, ভীষ্ম সমগ্র সমাজের পিতা, সুতরাং সবাই তাঁর সন্তান। এইজন্যে জন-শিক্ষার সমস্যা মহাপুরুষদের কাছে শিশুশিক্ষার সমস্যারূপে প্রতীয়মান হয়। কিন্তু আজ শিক্ষা-সমস্যার মতো জনশিক্ষার সমস্যাটিকেও খুবই জটিল করে ফেলা হয়েছে।

জন-শিক্ষার সমগ্র দায়িত্ব জ্ঞানী পুরুষদের—একথা বলা বহু লোকের ফ্যাসান হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রকৃত পক্ষে জন-শিক্ষা কোন বিশেষ ব্যক্তির উপর নির্ভর করছে এমন নয়। 'আকাশকে পঙ্গপাল ধরে আছে এবং তারা সরে গেলে আকাশ নীচে পড়ে যাবে'—এই ধারণার বশবর্তী হয়ে যদি পঙ্গপাল সামনে না গিয়ে পিছনের দিকে চলতে থাকে তাহলে যেমন হয়, ঠিক তেমনই হবে যদি কেউ ভাবেন—'জনশিক্ষা আমার উপর নির্ভর করছে'। 'কর্তাঽহম্', 'আমি কর্তা'—এইরূপ বলা অজ্ঞতার পরিচায়ক। বাস্তবিক পক্ষে যেখানে 'কর্তাঽহম্'—এই ভাবনা রয়েছে, সেখানে কর্তব্য কখনও সুসম্পাদিত হতে পারে না। শিক্ষার ন্যায় জন-শিক্ষাও [লোক-সংগ্রহ] অভাবাত্মক কার্য [নেগেটিভ] বা প্রতিবন্ধ-নিবারক কার্য। এই কারণে শ্রীশঙ্করাচার্য লোকসংগ্রহের-সংজ্ঞা নির্ণয় করতে গিয়ে বলেছেন, 'লোকস্য উন্মার্গপ্রবৃত্তি-নিবারণ: লোক-সংগ্রহঃ'—মানুষের কুপথে যাওয়ার প্রবৃত্তির নিবারণকে লোক-সংগ্রহ বলা হয়। মূল কথা হচ্ছে, প্রকৃত

শিক্ষক যেমন শিক্ষা দান করেন না, শিক্ষকের কাছ থেকে আপনিই শিক্ষালাভ হয়ে যায়, তেমনি জ্ঞানীপুরুষ স্বয়ং লোক-সংগ্রহ করেন না, তাঁর হাতে লোক-সংগ্রহ অনায়াসে হতে থাকে। সূর্য নিজে কাউকে আলো দেন না, সূর্যের জ্যোতি স্বাভাবিক ভাবে বিচ্ছুরিত হওয়াতে সবই আলোকিত হয়ে ওঠে। এই অভাবাত্মক কর্মযোগকে গীতা সহজ কর্ম বলে উল্লেখ করেছেন। আর মনু এই সহজ কর্মের 'নিবৃত্ত-কর্ম' এই সুন্দর সংজ্ঞা দিয়েছেন। মনুর সংজ্ঞানুযায়ী সহজ শিক্ষার সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে নিবৃত্ত-শিক্ষা। যে আচার্যেরা এই-রূপ নিবৃত্ত-শিক্ষা দিতে সক্ষম তাঁরাই সমাজের গুরু, তাঁরাই সমাজের পিতা। অর্থের বিনিময়ে যে সব শিক্ষকেরা শিক্ষা দেন, তাঁরাও গুরু নন। আর কেবল জন্ম দিয়ে যে ব্যক্তি পিতা হন, তিনিও পিতা নন। এমন প্রকৃত আচার্যদের পদতলে বসে যারা শিক্ষালাভ করেছেন তাঁরাই 'মাতৃমান, পিতৃবান, আচার্যবান'—এই গৌরবের পাত্র। আর অন্যেরা সবাই অনাথ শিশুর মতন। বাস্তবিকই আজকাল নিবৃত্ত-শিক্ষার মতো উদার শিক্ষা লাভ করার সৌভাগ্য কয়জনের হয়?

(মহারাষ্ট্র-ধর্ম, ৪র্থ সংখ্যা, জানুয়ারী, ১৯২৩)

কেবল শিক্ষকতা

দেশসেবায় আত্মনিয়োগে উৎসুক এক যুবককে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, 'বলুন তো, আপনার মতে আপনি কোন্ কাজ ভাল করে করতে পারেন?' উত্তরে নবযুবকটি বলেছিলেন, 'আমার মনে হয় আমি কেবলমাত্র শিক্ষাকার্য করতে পারি আর এ কাজ আমার ভালও লাগে।'

'ঠিকই বলেছেন। কারণ, মানুষ যা অনায়াসে করতে পারে তা তো তার ভালই লাগবে। কিন্তু বলুন তো, আপনি আর কোনো কাজ করতে পারবেন কিনা?'

'আজ্ঞে না। আর কোনো কাজ আমার দ্বারা হবে না। আমি শুধু শিক্ষকতা করতে পারব। আর তা যে খুব ভাল করেই করতে পারব সে-বিষয়ে আমি নিশ্চিত।'

'নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই। ভাল শেখাতে যে পারবেন তাতে আর সন্দেহ কি? তবে কোন্ কাজ ভাল করে শেখাতে পারবেন বলুন তো? সূতা কাটা, তূলা ধোনা, কাপড় বোনা, —এসব ভাল শেখাতে পারবেন?'

'না, ওসব শেখাতে পারব না, ওসব আমার আসে না।'

'তবে সেলাই, কাপড় রঙ্গানোর কাজ, ছুতোরের কাজ?'

'না, ওসব কিছু নয়।'

'রান্নার কাজ, মশলা বাটা প্রভৃতি ঘরের কাজ শেখাতে পারবেন?'

'না, আমি তো কোনো কাজ কখনও করিনি। আমি কেবল শিক্ষার···।'

'ভাই, যা কিছু শেখানোর কথা বলছি, তাতেই আপনি না—না করছেন অথচ বলছেন যে, শুধু শেখানোর কাজ করতে পারেন—এর মানে কি? আচ্ছা, মালীর কাজ শেখাতে পারবেন?'

দেশসেবাভিলাষী একটু বিরক্ত হয়ে বললেন, 'একথা কেন জিজ্ঞেস করছেন? আমি তো প্রথমেই বলেছি আর কোনো কাজ আমি করতে পারি না, আমি সাহিত্য শেখাতে পারি।'

প্রশ্নকর্তা একটু রহস্য করে বললেন, 'ঠিক বলেছেন, এখন আপনার কথা কিছু বুঝতে পেরেছি। আপনি রামচরিতমানসের (তুলসীদাসের রামায়ণ) মতো বই কি করে লিখতে হয় তা শেখাতে পারেন?'

এতে দেশসেবাভিলাষী রেগে গিয়ে বেশ কড়া জবাব দিতে উদ্যত হলেন। কিন্তু তিনি কিছু বলবার আগেই প্রশ্নকর্তা বলে উঠলেন, 'শান্তি, ক্ষমা, ধৈর্য এসব শেখাতে পারবেন?'

এবার চূড়ান্ত হয়ে গেল, আগুনে যেন ঘৃতাহুতি পড়ল। কিন্তু আগুন জ্বলে উঠবার আগেই প্রশ্নকর্তা তাড়াতাড়ি জল ঢেলে আগুন নিবিয়ে ফেললেন। বললেন, 'আমি আপনার কথা বুঝেছি। আপনি লেখাপড়া এসব শেখাতে

পারবেন। এসবেরও জীবনে কিছু কিছু প্রয়োজন আছে, একেবারে যে প্রয়োজন নেই তা নয়। আচ্ছা, আপনি বুনাই শিখতে প্রস্তুত আছেন?'

'কোনো নূতন জিনিস শিখবার উৎসাহ এখন আর নেই, তাছাড়া বুনাইয়ের কাজ আমি কিছুতেই শিখতে পারব না। কারণ, আজ পর্যন্ত আমার হাত ঐ জাতীয় কোনো কাজে অভ্যস্ত হয়নি।'

'মানলাম, শিখতে হয়তো একটু বেশী সময় লাগবে। কিন্তু একেবারেই শিখতে পারবেন না তা কেন বলছেন?'

'আমার তো মনে হচ্ছে একাজ আমি কখনও শিখতে পারব না। কিন্তু ধরুন, খুব চেষ্টা করে খেটেখুটে শিখতে পারলাম, তা হলেও এ কাজ বড্ড নটখটে কাজ। জেনে রাখুন, ওসব আমার দ্বারা হবে না।'

'বেশ, আপনি যেমন লেখার কাজ শেখাতে প্রস্তুত, তেমন লেখার কাজ কি আপনি নিজে করতে পারবেন?'

'নিশ্চয়ই করতে পারব। কিন্তু কেবল বসে বসে লেখার কাজও বড়ো বিশ্রী কাজ, তবু তা করতে আমার কোন আপত্তি নেই।'

কথাবার্তা এখানেই শেষ হল। এর ফল কি হল সেকথা জানার আমাদের কোন প্রয়োজন নেই। শিক্ষকদের মনোভাব জানবার পক্ষে এই কথোপকথনই যথেষ্ট।

আজকালকার শিক্ষকদের চিত্র

আজকালকার শিক্ষকের অর্থ হচ্ছে ঃ—(১) জীবনযাত্রা নির্বাহের জন্যে যে সকল কাজের প্রয়োজন, তার একটিও করতে অক্ষম, (২) কোনো নূতন কাজ শেখার অসামর্থ্য আর যে কোনো কাজ করার অনিচ্ছা, (৩) শুধু শিক্ষকতার অহংকারে পূর্ণ, (৪) গ্রন্থকীট ও (৫) অলস।

শুধু শিক্ষকতা হচ্ছে জীবন থেকে বিযুক্ত প্রাণহীন শবের মতো। আর শিক্ষকেরাও শুধু দেহেই বেঁচে থাকেন, অন্তরে তাঁরা মৃত ('তাঁরা মৃতজীবী')।

বুদ্ধিজীবী ও মৃতজীবীতে তফাৎ

মৃতজীবীদের কেউ কেউ বুদ্ধিজীবী আখ্যা দেন। কিন্তু এটা শব্দের অপপ্রয়োগ। বুদ্ধিজীবী কে? একজন গৌতম বুদ্ধ, একজন সুকরাত, একজন শঙ্করাচার্য বা জ্ঞানেশ্বর চৈতন্যময় অন্তর-জীবনের (বুদ্ধি-জীবনের) জ্যোতিকে উদ্বুদ্ধ করে তোলেন। গীতায় বুদ্ধিগ্রাহ্য জীবনের অর্থ অতীন্দ্রিয় জীবন বলা হয়েছে। যে ইন্দ্রিয়ের দাস, যে দেহাসক্তিতে পূর্ণ, সে বুদ্ধিজীবী নয়। বুদ্ধির অধিপতি আত্মা। যে বুদ্ধি আত্মাকে পরিত্যাগ করে দেহের দাসত্ব অবলম্বন করেছে, সে বুদ্ধি ব্যভিচারী বুদ্ধি। এই ব্যভিচারী বুদ্ধির জীবনই মরণ। আর যে ব্যক্তি এই ব্যভিচারী বুদ্ধিদ্বারা জীবনধারণ করে সে-ই মৃতজীবী। 'কেবল শিক্ষকতা'র

উপর নির্ভর করে যারা বেঁচে থাকে তাঁরাও বিশেষ অর্থে মৃতজীবী। এইসব লোকদেরই মনু 'মৃতকাধ্যাপক' বা 'বেতনভোগী' শিক্ষক বলেছেন এবং শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়ায় এদের অংশ গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন। তিনি ঠিকই করেছেন। কারণ শ্রাদ্ধক্রিয়ায় মৃত পূর্বপুরুষদের স্মৃতিকে সঞ্জীবিত করতে হয়। কাজেই যারা বাস্তব জীবনকেই মৃত করে তুলেছে শ্রাদ্ধে তাদের কী উপযোগিতা থাকতে পারে?

'আচার্য' শব্দের অর্থ

পূর্বকালে শিক্ষকদের আচার্য বলা হত। আচার্যের অর্থ হচ্ছে আচারবান। যিনি নিজের আদর্শ-জীবনের প্রভাবের দ্বারা সমাজের সকল লোককে অনুরূপ জীবন যাপনে উদ্বুদ্ধ করেন, তিনিই আচার্য। এইরূপ আচার্যদের পুরুষকার দ্বারাই রাষ্ট্র ও সমাজ গঠিত হয়েছে। আজ ভারতবর্ষকে নতুন জীবনের দিকে অগ্রসর করে দিতে হবে। ভারতবর্ষের রাষ্ট্র ও সমাজকে গড়ে তোলার কাজ আমাদের সামনে রয়েছে। আচারবান শিক্ষকদের সহায়তা ব্যতীত একাজ সম্ভব নয়।

সেইজন্যেই রাষ্ট্রীয় শিক্ষার প্রশ্নটি সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। এই প্রশ্নের গূঢ় তাৎপর্য এবং এর ব্যাপকতা ভাল করে বুঝে নিতে হবে। দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায় ক্রমেই বীর্যহীন ও

অকর্মণ্য হয়ে পড়ছে। এর একমাত্র প্রতিকার জাতীয় শিক্ষার আগুনকে প্রজ্বলিত করাতেই।

অগ্নির দুই শক্তি

কিন্তু 'অগ্নি' হওয়া চাই। অগ্নিদেবের দুইটি শক্তি—প্রথম 'স্বাহা' আর দ্বিতীয় 'স্বধা'। যেখানে এই দুই শক্তি আছে সেখানে অগ্নিও আছে। 'স্বাহা' হচ্ছে আত্মাহুতি,আত্মত্যাগের শক্তি। আর 'স্বধা'র অর্থ আত্মোপলব্ধির শক্তি। জাতীয় শিক্ষার দ্বারা এই দুই শক্তিকে জাগ্রত করে তুলতে হবে। এই শক্তি জাগ্রত হলে তবেই এই শিক্ষাকে রাষ্ট্রীয় শিক্ষা বা জাতীয় শিক্ষা বলা যাবে। আর সব শিক্ষাই প্রাণহীন, তেজহীন, মূর্খতাপূর্ণ শিক্ষা।

উপর উপর দেখা যায় যে, আমাদের শিক্ষকরা খুব আত্মত্যাগ করেছেন। কিন্তু এ কথার যথার্থতা বিচার করে দেখা দরকার। বস্তুত স্বার্থত্যাগ বা নিজের কিছু ত্যাগ করার অর্থ আত্মত্যাগ নয়। আত্মত্যাগকে যাচাই করে নেওয়া যায়। যেখানে আত্মত্যাগের শক্তি আছে সেখানে আত্মোপলব্ধির শক্তিও থাকবে। কারুর আত্মোপলব্ধির (আত্মধারণার) শক্তি না হলে কিসের জন্যে সে ত্যাগ করবে? যে আত্মার দাঁড়াবার শক্তি নেই, সে ঝাঁপ দেবে কি করে? তাৎপর্য, আত্মত্যাগের শক্তি যাঁর হয়েছে তাঁর প্রথমেই আত্মোপলব্ধি হয়ে গেছে। এই 'স্বধা' অর্থাৎ আত্মোপলব্ধির (নিজেকে

জানার) শক্তি শিক্ষকদের মধ্যে আজও উদ্বুদ্ধ হয়নি। এই-জন্যেই আত্মত্যাগের যে আভাস পাওয়া যায় তা আভাসমাত্রই। প্রথমে 'স্বধা' হবে, তবে তো 'স্বাহা'। জাতীয় শিক্ষকদের এমন স্বধা-সাধনে সিদ্ধিলাভ করবার জন্যে প্রয়াসী হতে হবে।

জীবনের দায়িত্ব গ্রহণ

শিক্ষকদের 'কেবল শিক্ষণ'রূপ ভ্রান্ত ধারণা ত্যাগ করতে হবে। কৃষকদের মতো স্বাধীনভাবে জীবনযাত্রা নির্বাহের দায়িত্ব শিক্ষকদের নিজেদের গ্রহণ করতে হবে। আর শিক্ষার্থী-দেরও সেই কাজে দায়িত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করতে দিয়ে শিক্ষার পরিবেশটি সৃষ্টি করে তুলতে হবে—যে পরিবেশের মধ্যে বাস করে শিক্ষার্থীরা আপনা থেকেই শিক্ষিত হয়ে উঠবে। 'গুরোঃ কর্মাতিশেষেণ'—এ কথার অর্থ 'গুরুর কাজ সম্পন্ন করে তারপর বেদাভ্যাস করতে হবে'। 'গুরুর কাজের' অর্থ গুরুর ব্যক্তিগত সেবা নয়। কারণ, ব্যক্তিগত সেবার কাজ বেশী নয়, আর এতে সেবকের সংখ্যাও খুব বেশী লাগার কথা নয়। সুতরাং 'গুরুর কাজ' এই কথার অর্থ গুরুর জীবনযাত্রা নির্বাহের কাজে ভাগ নিয়ে তার দায়িত্বের অংশ গ্রহণ করা। এইসব দায়িত্ব পালনের সময় যে-সকল সমস্যার উদ্ভব হবে, গুরুর নিকট সে-সকল সমস্যা সমাধানের জন্যে উপস্থাপিত করতে হবে। আর গুরুর কর্তব্য হবে সে-সকলকে নিজের জীবনের সমস্যা বলে গ্রহণ করে যথাশক্তি তাদের সমাধানের চেষ্টা করা। এই হল প্রকৃত শিক্ষার যথার্থ রূপ।

দুই-এক ঘণ্টা শিক্ষকতার জন্যে

জীবনযাত্রা নির্বাহের মধ্যে বেদাভ্যাসের জন্যে কিছু সময় রাখা প্রয়োজন। প্রত্যেক কাজই উপাসনা সন্দেহ নেই। তথাপি কাজের মধ্য দিয়ে উপাসনা করলেও সকালসন্ধ্যা অল্প সময় উপাসনার জন্যে দিতে হয়। এই যুক্তি বেদাভ্যাস বা শিক্ষাকার্যেও প্রয়োগ করা দরকার।

সারাংশ, জীবনযাত্রা নির্বাহের দায়িত্ব পালনের জন্যে দিনের অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করা উচিত আর এইসব কাজকে শিক্ষার কাজ বলেই মনে করতে হবে। তাছাড়া দুই-এক ঘণ্টা লেখাপড়ার জন্যেও দিতে হবে।

আদর্শ শিক্ষকের সঙ্গে থাকাই শিক্ষালাভ

মহৎ আদর্শকে আপন জীবনে রূপায়িত করা শিক্ষকদের কর্তব্য। এই রূপায়ণের দ্বারা শিক্ষকের জীবন থেকে আশে-পাশে শিক্ষার আলোক ছড়িয়ে পড়বে এবং শিক্ষার পরিবেশও আপনা থেকেই গড়ে উঠবে। এইরকম শিক্ষক বিনা আয়াসেই এক একটি শিক্ষার কেন্দ্র হয়ে পড়েন এবং এই কারণেই তাঁর সঙ্গে থাকাই শিক্ষাপ্রাপ্ত হওয়া।

পবিত্র জীবন যাপনের প্রয়াসী হওয়া মানুষের শ্রেষ্ঠ কর্তব্য। পবিত্র জীবনই শিক্ষার ভারগ্রহণে সমর্থ। শিক্ষা-দানের জন্যে 'কেবল শিক্ষণে'-র সাধ থাকার প্রয়োজন নেই।—('মধুকর' থেকে)

অসুস্থ মনের লক্ষণ

কোন ঘরে ঔষধে পূর্ণ অনেক শিশি দেখলে মনে হবে যে, ঘরের অধিবাসী বোধ হয় একজন রুগ্ন ব্যক্তি। কিন্তু কোন ঘরে যদি অনেক বই দেখা যায় তাহলে আমরা বলি যে, ঘরের অধিবাসী বেশ পণ্ডিত লোক। এরকম মনে করা অন্যায় নয় কি? কারণ স্বাস্থ্যরক্ষার প্রথম নিয়ম যেমন বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া ঔষধ ব্যবহার না করা, তেমনি পাণ্ডিত্যের প্রধান লক্ষণ হবে যথাসম্ভব বইয়ে চোখ না বুলানো। এখানে ঔষধের শিশি যেমন রোগ সূচিত করে, বইকেও তেমনি অসুস্থ মনের চিহ্ন হিসেবে মানতে হবে।

'সু' থেকে 'অ' ভাল

শত শত বছরের পর যাঁদের জ্ঞানের জ্যোতি আজও পৃথিবীময় ছড়িয়ে রয়েছে তাঁরা সাক্ষর হওয়ার চেয়ে সার্থক জীবনলাভ করার জন্যেই ব্যাকুল ছিলেন। কারণ আজ-কালকার সুশিক্ষিত সমাজে অনায়াসে এমন অনেক সাক্ষর লোক পাওয়া যাবে যাদের জীবন মোটেই সার্থক নয়, সম্পূর্ণ ব্যর্থ (নিরর্থক)। পক্ষান্তরে নিরক্ষর লোকের জীবনও পূর্ণভাবে সার্থক হতে পারে। এর বহু দৃষ্টান্ত ইতিহাসে রয়েছে। নানাদিক থেকে সুশিক্ষিত ও অশিক্ষিত লোকদের জীবন

তুলনা করে দেখলে 'অক্ষরাণামকরোঽস্মি'—গীতোক্ত এই বচনানুসারে 'সু' থেকে 'অ'-কেই বেশী পছন্দ হয়।

সত্যজ্ঞান সৃষ্টিতে

বই তো লিখিত শব্দসমষ্টি। কাজেই বইয়ের সংস্পর্শেই সার্থক জীবনলাভ হবে এ আশা করা উচিত নয়। ডাল, ভাত প্রভৃতি শব্দ শুনে কারুর কি পেট কখনও ভরেছে?—এ প্রশ্ন খুবই তাৎপর্যপূর্ণ।

কবি বলেছেন—পুঁথিতে লেখা কূয়োয় কেউ ডোবে না আর পুঁথিতে লেখা নৌকোতেও কেউ নদী পার হতে পারে না। 'অশ্বে'র অর্থ 'ঘোড়া' অভিধানে আছে। অভিধানে এই কথা দেখে বালকদের মনে হয় যে, অভিধানে 'অশ্ব' শব্দের অর্থ রয়েছে (অশ্ব বলতে কি বুঝায় তাই বুঝি অভিধানে আছে)। কিন্তু এরকম মনে করা ভুল। কারণ অশ্ব বলতে কি বুঝায় তা তো আস্তাবলে দাঁড়িয়ে আছে। তাকে অভিধানে ঢোকানো তো সম্ভব নয়। 'অশ্ব' মানে 'ঘোড়া' অভিধানের এই কথা শুধু এইটুকুই বলছে যে, 'অশ্ব'-শব্দেরও যে অর্থ, 'ঘোড়া'-শব্দেরও সেই অর্থ। অশ্ব বস্তুটি কি তা জানতে হলে আস্তাবলে গিয়ে দেখতে হবে। অভিধানে কেবল সমানার্থ-বাচক শব্দ দেওয়া হয়। সেইরকম বইয়ে শব্দের অর্থ থাকে না, তা থাকে সৃষ্টিতে। যখন এই কথার সম্যক উপলব্ধি হবে, তখনই যথার্থ জ্ঞানের আস্বাদ পাওয়া যাবে।

দুই অক্ষরের সার্থকতা

যিনি জপের পন্থা খুঁজে বের করেছিলেন, তাঁর এক উদ্দেশ্য ছিল—লেখাপড়ার সংক্ষিপ্ত রূপ দেওয়া। 'লেখাপড়া চেঁচিয়েই মরছে' দেখে তিনি ভেবেছিলেন যে, ওর মুখে জপের টুকরো ফেলে দিতে পারলে বেচারার চেঁচানো বন্ধ হয়ে যাবে আর তাতে জীবন সার্থক করার জন্যে যেসব কাজ করা দরকার তার জন্যে যথেষ্ট সময় সে পাবে। লেখাপড়াকে সংক্ষেপ করার আসল উদ্দেশ্য হল এই। বাল্মীকি একশত কোটি শ্লোকে রামায়ণ লিখেছিলেন। লেখা হয়ে গেলে রামায়ণ অধিকার করার জন্যে দেব, দানব আর মানুষের মধ্যে ঝগড়া শুরু হল। ঝগড়া কিছুতেই মিটছে না দেখে মহাদেবকে মধ্যস্থ মানা হল। তিনি একশ কোটি শ্লোক তিন ভাগ করে প্রথমে প্রত্যেককে তেত্রিশ কোটি শ্লোক দিলেন। এক কোটি শ্লোক হাতে রইল। তখন আবার তা থেকে প্রত্যেককে তেত্রিশ লক্ষ করে শ্লোক দিলেন। এইভাবে ভাগ করতে করতে শেষে একটি মাত্র শ্লোক অবশিষ্ট থেকে গেল। রামায়ণের শ্লোক বত্রিশ অক্ষরসম্বলিত অনুষ্টুপ ছন্দে লেখা। শঙ্করজী এই ৩২-অক্ষরও দশ-দশ করে তিনজনের মধ্যে ভাগ করে দিলেন। তখন বাকী রইল দুইটি অক্ষর। সেই দুইটি অক্ষর হল—'রা-ম'। মহাদেব বেঁটে দেওয়ার মজুরী বাবদ এই দুইটি অক্ষর নিজে নিলেন। মাত্র দুই অক্ষরেই মহাদেব আপনার অক্ষরজ্ঞান পিপাসা মিটিয়ে দিলেন আর তাতেও দেব, দানব বা মানুষ

কেউই জ্ঞানে তার সমকক্ষ হতে পারেনি। মহাপুরুষরাও রাম-নামের মধ্যেই তাঁদের সমগ্র সাহিত্যচর্চা সীমিত করেছেন। কিন্তু এই দুর্ভাগা মানুষ তা বুঝল না।

পাঠ কণ্ঠস্থ করা বৃথা

সাধুসন্তেরা রামায়ণ পাঠ দুই অক্ষরেই সমাপ্ত করেছেন; আর-ঋষিরা বেদকে এক অক্ষরের মধ্যে কেন্দ্রীভূত করেছেন। অক্ষরজ্ঞানের আকাঙ্ক্ষা না যায় তো 'ওঁ'-শব্দের জপের দ্বারাই সেই আকাঙ্ক্ষা মিটবে। এতেও না মেটে তো ছোট 'মাণ্ডুক্য উপনিষদ্' পড়। আর তাতেও যদি বাসনা না যায়, তো 'দশোপনিষদ্' দেখ। 'মুক্তিকোপনিষদের' এক শ্লোকে উপরোক্ত উপদেশ রয়েছে। এ থেকে ঋষিদের অভিমত বা বিচার স্পষ্ট বোঝা যায়। কিন্তু আমরা যেন মনে না করি যে, ঋষিরা অন্তত এক অক্ষর জপ করা প্রয়োজন মনে করতেন। একই হোক আর অনেকই হোক শব্দ কণ্ঠস্থ করাতে জীবন সার্থক হয় না, অর্থাৎ তাতে বাস্তবকে অনুভব করা যায় না। পুঁথিতে বেদের অক্ষর (জ্ঞানসূচক শব্দগুলি) পাওয়া যায়, কিন্তু শব্দের অর্থ তো জীবনে খুঁজে নিতে হবে। তুকারাম সম্বন্ধে কথিত আছে যে, তিনি সংস্কৃত না জেনেও বেদার্থ অনুধাবন করেছিলেন। একথা আজ পর্যন্ত কেউ অস্বীকার করেননি। শঙ্করাচার্য অষ্টম বর্ষেই বেদাভ্যাস সমাপ্ত করেছিলেন। একথা শুনে এক শিষ্য আশ্চর্যান্বিত হয়ে তাঁর

গুরুর কাছে জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'গুরুদেব, আচার্য কি করে আট বছরেই বেদ-পাঠ শেষ করতে পেরেছিলেন?' গম্ভীর হয়ে গুরু উত্তর দিয়েছিলেন, 'আচার্যের বুদ্ধি বাল্যকালে হয়ত অত তীক্ষ্ণ ছিল না, তাই তাঁর আট বছর লেগেছিল'।

দুঃখ সহ্য করার অধিকার

একটি লোক ঔষধ খেতে খেতে অস্থির হয়ে উঠল। যতই সে ঔষধ খায়, ততই তার অসুখ বেড়ে চলে। অবশেষে হতাশ হয়ে সে একজনের পরামর্শে ক্ষেতে কাজ করতে আরম্ভ করল। কিছুদিন ক্ষেতে কাজ করার পর তার সব অসুখ সেরে গেল আর সে বেশ হৃষ্টপুষ্ট হয়ে উঠল। আপন অভিজ্ঞতালব্ধ আরোগ্যলাভের এই উপায় সে তখন সকলকে বলতে আরম্ভ করল। কারুর হাতে ঔষধের শিশি দেখলেই খুব আন্তরিকতার সঙ্গে সে উপদেশ দিত—'ঔষধ খেলে কিছু হবে না। হাতে কোদাল তুলে নাও, সুস্থ হয়ে উঠবে।' লোকেরা বলত, 'তুমি নিজে ঔষধ তো আর বাকী কিছু রাখনি। এখন অন্যের বেলায় ঔষধ না খাওয়ার পরামর্শ দিচ্ছ।' সংসারে এমনই হয়। অন্যের অভিজ্ঞতার কথা শুনে কেউ কিছু শিখতে চায় না। মানুষ নিজে অভিজ্ঞতা লাভ করতে চায়, নিজেই ঠোক্কর খেয়ে শিখতে চায়। আমি তো ঠিকই বলি, 'বই পড়ে কোন লাভ হয় না, বৃথা কতকগুলি বই পড়ার ঝঞ্ঝাট কাঁধে নিও না।' লোকেরা বলে, 'তুমি

তো অনেক বই পড়ে শেষ করেছ আর আমাদের বলছ বই না পড়তে।' আমি বলি, 'হ্যাঁ, আমি পড়ে ভুল করেছি বলেই তো তোমাদের বলছি সে-ভুল না করতে।' এই কথায় তারা বলে, 'আমাদেরও অভিজ্ঞতা হওয়া চাই।'—'ঠিক আছে, অভিজ্ঞতা সঞ্চয় কর। দুঃখ সহ্য করে অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের জন্মগত অধিকার তোমাদের রয়েছে।'

আমরা ইতিহাসলব্ধ অভিজ্ঞতা থেকে পাঠ গ্রহণ করি না। তাই তো বারবার ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি হয়ে থাকে। আমরা যদি ইতিহাসের কদর করি, তাহলে অতীত অবস্থাকে অতিক্রম করতে সক্ষম হই। ইতিহাসকে উপেক্ষা করাতে বর্তমানে ইতিহাসের মূল্য অতিরিক্তভাবে বেড়ে গেছে। কিন্তু সেকথা বুঝতে পারলে তো?—('মধুকর থেকে')

জীবনের দুই ভাগ

আজকালকার অদ্ভুত শিক্ষাপদ্ধতির ফলে জীবন দুইভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। জীবনের প্রথম পনের-কুড়ি বছর মানুষ জীবনযাত্রা নির্বাহের ঝঞ্ঝাট থেকে মুক্ত থেকে লেখাপড়া করে এবং তারপর শিক্ষার বস্তাবন্দী হয়ে জীবনের বাকী দিনগুলি কাটিয়ে দেয়। এই ব্যবস্থা প্রকৃতির পরিকল্পনা-বিরোধী ব্যবস্থা।

একহাত লম্বা শিশু কি করে তিন হাত লম্বা মানুষে পরিণত হয় সেকথা সে নিজেও জানে না, অন্যেরাও জানে না। শরীর প্রতিদিনই বাড়ে এবং অনবরত অল্প অল্প করে বেড়ে চলে। এজন্যে এবৃদ্ধির পরিমাপ করা পর্যন্ত সম্ভব নয়। আজ ঘুমের আগে দুইফুট ছিল আর কাল সকালে হয়ে গেল আড়াই ফুট—এ রকম কখনো হয় না। আজকালকার শিক্ষাপদ্ধতি অনুসারে তো মনে করা হয় যে, অত বছর পর্যন্ত মানুষ যদি নিজের জীবন সম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপে দায়িত্বহীন থাকে তো কোন ক্ষতি নেই। শুধু তাই নয়, তাকে অত বছর পর্যন্ত দায়িত্বহীনই থাকতে হবে এবং তার পরের দিন থেকেই সমগ্র দায়িত্ব নেওয়ার জন্যে তাকে প্রস্তুত থাকতে হবে। সম্পূর্ণ দায়িত্বহীন অবস্থা থেকে হঠাৎ পূর্ণদায়িত্বসম্পন্ন হওয়া তো হনুমানের সমুদ্র-লঙ্ঘনের মতো এক প্রকাণ্ড লক্ষ

প্রদান করা। এত বড় ব্যবধান উল্লঙ্ঘন করতে গিয়ে যদি হাত-পা ভেঙ্গে যায়, তাতে আর আশ্চর্য হওয়ার কি আছে!

কুরুক্ষেত্রে ভগবদ্‌গীতা

ভগবান কুরুক্ষেত্রেই অর্জুনের কাছে ভগবদ্‌গীতা বলেছিলেন। আগে ভগবদ্‌গীতার ক্লাস নিয়ে তারপর অর্জুনকে কুরুক্ষেত্রে ঠেলে দেননি। সেইজন্যেই তো অর্জুনও গীতার তত্ত্ব আত্মসাৎ করতে পেরেছিলেন। জীবনের সঙ্গে কোন রকম সম্পর্ক না রেখে আমরা 'জীবনের প্রস্তুতির শিক্ষা' দিয়ে থাকি। এইজন্যেই সেই শিক্ষা পেয়ে মানুষ মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যায়।

প্রকাণ্ড লম্ফপ্রদানের ফল

বিশ বছরের উৎসাহী যুবক লেখাপড়া করার সময় কত উচ্চাকাঙ্ক্ষার স্বপ্নসৌধই না রচনা করে চলে! 'শিবাজীর মতো মাতৃভূমির সেবক হব, বাল্মীকির মতো মহাকাব্য রচনা করব, অথবা নিউটনের মতো যুগান্তকারী বৈজ্ঞানিক গবেষণায় উত্তীর্ণ হব'—এই জাতীয় কত কল্পনাই তার মনে জাগে, কত আশাতে তার মন ভরে ওঠে! অবশ্য অনেকেরই ভাগ্যে এরকম কল্পনা করার অবসরও মেলে না। যে অল্প কয়েকজনের মেলে তাদের কথাই আলোচনা করা যাক্‌। আশা-আকাঙ্ক্ষায় মগ্ন হয়ে থাকার সময় পেরিয়ে যখন সে

জীবনক্ষেত্রে এসে দাঁড়ায়, তখন এইসব কাল্পনিক উচ্চাকাঙ্ক্ষার পরিণাম কি হয়? জীবন-সংগ্রামের মধ্যে যখন বাস্তবের সম্মুখীন হতে হয়, নুন-তেল-কাপড়ের সমস্যা, পেটের দায় উদ্ধারের সমস্যা যখন তার সামনে এসে পড়ে, তখন বেচারার সমস্ত আশার প্রাসাদটিই ভেঙ্গে চূরমার হয়ে যায় আর সে দীনস্য দীন হয়ে পড়ে। জীবনের দায়িত্ব বস্তুটি সম্বন্ধে কাল পর্যন্ত যে সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিল, আজ পর্বতপ্রমাণ দায়িত্ব এসে তারই সামনে দাঁড়াল। এখন সে কি করে? কি আর করবে? কখনও আমাদের শিবাজী মহারাজ পেটের দায়ে বন্‌বন্ করে ঘুরে মরেন; কখনও বাল্মীকি কবি করুণ সুরে গান গেয়ে হৃদয়বেদনা লাঘব করেন; কখনও বা আমাদের সেই নিউটন হওয়ার স্বপ্নবিলাসী কোথাও চাকুরী খোঁজেন, বিয়ে করেন, কন্যাদায় থেকে উদ্ধার হওয়ার জন্যে প্রাণপাত করেন এবং অবশেষে শ্মশানে গিয়ে সকল দায় থেকে মুক্ত হন। এমনি করেই উচ্চাকাঙ্ক্ষী যুবকদের সকল কল্পনার অবসান ঘটে। হনুমানের সমুদ্র লঙ্ঘন করার পরিণাম এমনই হয়ে যায়।

ম্যাট্রিক ক্লাসের এক ছাত্রকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'ম্যাট্রিক পাশ করার পর তুমি কি করবে?'

'কেন, কলেজে পড়ব।'

'বেশ। কলেজে তো যাবেই, তারপর কি করবে? আমি বলছিলাম, লেখাপড়া করে তারপর কি করবে?'

'সে তো অনেক দেরী। এখনই তা ঠিক করব কেন? পরে ভেবে দেখা যাবে।'

তিন বছর পর সেই ছাত্রকে আবার উপরোক্ত প্রশ্ন করলাম।

উত্তরে সে বলল, 'এখনও কিছু ঠিক করিনি।'

'ঠিক করনি? এসম্বন্ধে চিন্তা করেছিলে কি?'

'না মহাশয়, এসম্বন্ধে কোনো চিন্তা করিনি। পাস করে কি করব ঠিক বুঝতে পারছি না। তা এখনও তো দেড় বছর বাকী আছে, পরে দেখা যাবে।'

'পরে দেখা যাবে'—একথা তিন বছর আগেও ছেলেটি বলেছিল। তবে তিন বছর আগে এসম্বন্ধে কোন চিন্তাভাবনাই ছিল না। এখন দেখলাম একটু যেন ভাবনা হয়েছে।

দেড় বছর পর সেই ছাত্রকে—আর ছাত্র কেন বলি, এখন তো সে সংসারী—আবার সেই প্রশ্ন করলাম। এবার দেখি যুবকটি চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়েছে, কণ্ঠস্বরের বেপরোয়া ভাব একেবারে লুপ্ত হয়ে গেছে। 'ততঃ কিম্? ততঃ কিম্? ততঃ কিম্?'—আচার্য শঙ্করের সেই সনাতন প্রশ্ন তার মাথায় তখন ঘুরছে, কিন্তু প্রশ্নের কোন জবাব খুঁজে পাচ্ছে না।

মৃত্যুদিনকে পিছনে ঠেলতে ঠেলতে এমন একদিন এসে উপস্থিত হয় যেদিন মৃত্যু ছাড়া আর গতি থাকে না। যে-ব্যক্তি মরবার আগে মৃত্যুকে স্বীকার করে নেয়, যে নিজের মরণটাকে

চোখের সামনে দেখতে পায়, অকস্মাৎ মৃত্যুদূতের পরোয়ানা এসে তাকে বিচলিত করতে পারে না। যে মৃত্যুকে নিশ্চিত জেনে তাকে আপন করে নেয়, তার মৃত্যু দূরে সরে যায়। আর যে মরণের ভয়ে অস্থির হয়ে সন্ত্রস্ত হৃদয়ে দিন যাপন করে তার মরণ তো একেবারে বুকের কাছে এসে দাঁড়ায়। অন্ধ যখন পথের ধারের খুটাতে ধাক্কা খায় তখনই সে খুটার কথা জানতে পারে। আর চক্ষুষ্মান যে, সে তো আগে থেকেই খুটা দেখতে পায়, তাই সে কখনও সেই খুটাতে ধাক্কা খায় না।

দায়িত্বপালনে বিমুখ হব না

প্রাণধারণের জন্যে যেসব কর্তব্য পালন করতে হয়, সেসবের মধ্যে ভয় পাওয়ার কিছু নেই, বরং সেসব আনন্দে ওতপ্রোত হয়ে যায়, যদি ঈশ্বরের রচিত সরল জীবনাদর্শকে সামনে রেখে আমরা বাসনাগুলি সংযত করে জীবনপথে অগ্রসর হই। এই সকল কর্তব্য যেমন আনন্দে পূর্ণ তেমনি শিক্ষাতেও ভরপূর। এই কথা ভাল করে বোঝা চাই যে, যে-ব্যক্তি জীবনের দায়িত্বপালন থেকে বঞ্চিত হয়েছে, সে শিক্ষাকে সম্পূর্ণরূপে হারিয়ে বসেছে। অনেকের এই ধারণা রয়েছে যে, যদি বাল্যকাল থেকে মানুষ জীবনের জিম্মেদারী (দায়িত্ব) সম্বন্ধে সচেতন হয়, তাহলে শৈশবেই জীবনটা ম্লান হয়ে যাবে। একথা অমূলক। কারণ যে-জীবন নিজেকে

সচল রাখবার প্রয়াসে ম্লান হয়ে পড়ে, সে-জীবন তো বেঁচে থাকারই অযোগ্য।

প্রকৃত মনুষ্যত্ব

কিন্তু এই রকমের মতবাদ আজ বহু শিক্ষাবিজ্ঞানীর মধ্যে দেখতে পাওয়া যায়। এর প্রধান কারণ জীবন সম্বন্ধে ভুল ধারণা। জীবন মানেই কলহ—একথা এঁরা মেনে নিয়েছেন। এঁরা 'ঈশপ-নীতি'র অর্থ ঠিক বুঝতে পারেননি। এই নীতির মর্ম যিনি গ্রহণ করেছেন তিনি ঈশপের বর্ণিত মুর্গীর মতো মুক্তার চাইতে জোয়ার-দানাকেই বেশী মূল্য দিয়ে থাকেন আর তাঁর কাছে জীবনের অন্তর্নিহিত স্বার্থ-নীতি মুছে গিয়ে পারস্পরিক সহায়তার রূপ ফুটে ওঠে। 'বানরের গলায় মুক্তার মালা'—এই বাক্যের রচয়িতা মানুষের মনুষ্যত্বকে উপেক্ষা করে 'মানুষের পূর্বপুরুষ বানর' ডারুইনের এই সিদ্ধান্তটিকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। কিন্তু যিনি 'হনুমানের হাতে মুক্তার মালা'—এই বাক্যের রচয়িতা তিনি মনুষ্যত্বের প্রতি শ্রদ্ধাবান ছিলেন।

জীবন যদি ভয়ানকই হয়, কলহপূর্ণই হয় তাহলে অল্পবয়স্কদের জীবনক্ষেত্রে প্রবেশ করতে দিও না, নিজেও জীবনধারণ করো না। আর যদি জীবনধারণ করা উপযুক্ত বস্তু বলে মনে করা হয়, তবে তাতে অল্পবয়স্কদেরও অবশ্যই প্রবেশাধিকার দিতে হবে। কারণ এছাড়া এদের পক্ষে

শিক্ষালাভ করা অসম্ভব। ভগবদ্গীতা যেমন কুরুক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে বলা হয়েছিল, শিক্ষাও তেমনি জীবন-ক্ষেত্রেই দিতে হবে। শিক্ষা জীবন-ক্ষেত্রেই দেওয়া যায়। 'দেওয়া যায়'—এ ভাষাও ঠিক নয়, জীবন-ক্ষেত্রেই শিক্ষা পাওয়া যেতে পারে।

জীবন্তভাবে বাঁচবার শিক্ষা

প্রত্যক্ষ কর্তব্য পালন করতে গিয়ে অর্জুনের মনে যে-প্রশ্নের উদয় হয়েছিল তার জবাবেই ভগবদ্গীতা কথিত হয়েছিল। এর নামই শিক্ষা। ছেলেদের ক্ষেতে কাজ করতে দাও। সেখানে তারা যেসব প্রশ্নের সম্মুখীন হবে, তার সমাধান করবার জন্যে তাদের প্রজনন-বিজ্ঞান কিংবা পদার্থ-বিজ্ঞান কিংবা অন্যান্য যেসকল জ্ঞানের প্রয়োজন সেসব শিক্ষা দান কর। এতেই প্রকৃত শিক্ষা হবে। তাদের রান্না করতে দাও আর সেই সঙ্গে প্রয়োজনানুযায়ী রসায়নশাস্ত্র শিখাও। আসল কথা হচ্ছে তাদের জীবনের মধ্যেই জীবন ধারণ করতে দাও ('জীবন জীনে দো')। কাজের মধ্য দিয়ে ব্যবহারিক জীবনে যেমন বহু লোকের শিক্ষালাভ হয়ে থাকে তেমনভাবেই ছেলেমেয়েদেরও শিক্ষা পাওয়া চাই। তফাৎ এই হবে যে, তাদের পন্থানির্দেশের জন্যে উপযুক্ত ব্যক্তিরা কাছে থাকবেন। এই সকল ব্যক্তিরাও 'শিক্ষক' বলে 'নিযুক্ত' হবেন না। যেভাবে সাধারণ লোকেরা কাজ করে' জীবন যাপন করে, তেমনি জীবনধর্মী লোক এঁরাও হবেন। কেবল

এইটুকুই বিশেষত্ব থাকবে যে, 'শিক্ষক' নামধারী ব্যক্তিদের জীবনযাত্রার কার্যকারণ সম্বন্ধটি এঁদের কাছে খুবই স্পষ্ট থাকবে। এঁরা বিচারশীল হবেন এবং বুদ্ধি-বিবেচনা করে প্রত্যেকটি কাজের অন্তর্নিহিত নিয়মাদি বুঝিয়ে দেওয়ার যোগ্যতা এঁদের থাকবে।

পেশাদারী শিক্ষকতা অপ্রয়োজনীয়

শিক্ষকতার নামে কোন স্বতন্ত্র পেশার দরকার নেই এবং মনুষ্যসমাজ থেকে আলাদা 'বিদ্যার্থী' নামক কোনও স্বতন্ত্র জীবেরও প্রয়োজন নেই। আর, 'কি কাজ করছ' জিজ্ঞেস করলে 'পড়ছি' কিম্বা 'পড়াচ্ছি'—এই ধরণের উত্তর যাতে না দিতে হয় সেই রকম ব্যবস্থাও হওয়া দরকার। 'চাষের কাজ করছি' অথবা 'বুনাইয়ের কাজ করছি'—উত্তরে এই প্রকার জীবনযাত্রা সম্পর্কিত কোন কাজেরই প্রকাশ পাওয়া চাই।

আদর্শ গুরু ও শিষ্য

এ সম্বন্ধে রাম-লক্ষ্মণের মতো শিষ্য এবং বিশ্বামিত্রের মতো গুরুর উদাহরণ নেওয়া যেতে পারে। বিশ্বামিত্র যজ্ঞরক্ষার্থে দশরথের কাছে তাঁর দুই পুত্রের সহায়তা চেয়েছিলেন। আর দশরথও ঐ কাজের জন্যেই ছেলেদের পাঠিয়েছিলেন। ছেলেদের মনেও এই চিন্তাই ছিল যে, তারা যজ্ঞরক্ষার দায়িত্ব নিয়েই সেখানে যাচ্ছে। কিন্তু তা থেকেই তাদের

অপূর্ব শিক্ষা লাভ হয়েছিল। অথচ যদি জিজ্ঞাসা করা হয়—রাম-লক্ষ্মণ কি করেছিলেন, তাহলে বলা হবে, 'তাঁরা যজ্ঞ রক্ষা করেছিলেন।' 'তাঁরা শিক্ষালাভ করেছিলেন'—এ কথা বলা হবে না। কিন্তু সেখানে শিক্ষা যা পাওয়ার ছিল তা তো তাঁরা পেয়েই ছিলেন।

শিক্ষা আনুষঙ্গিক ফল

শিক্ষা কর্তব্যকর্মের আনুষঙ্গিক ফল। যিনিই কর্তব্য কাজ করেন, তিনিই জ্ঞাত কি অজ্ঞাতসারে শিক্ষালাভ করে থাকেন। ছেলেপিলেদেরও এইভাবেই শিক্ষা পাওয়া চাই। অন্যদের শিক্ষালাভ হয় অনেক বাধা-বিপত্তির আঘাত সহ্য করে। কিন্তু ছোট-ছোট ছেলেদের তো এত শক্তি নেই, তাই তাদের পরিবেশ এমন করা চাই যাতে বহু বাধা-বিঘ্নের সম্মুখীন হতে না হয়। আর তারা যাতে ধীরে-ধীরে স্বাবলম্বী হয়ে ওঠে সেইরকম সুযোগ ও পরিকল্পনাই হওয়া প্রয়োজন। শিক্ষাও তো একটা ফলই, কাজেই যে-নীতির দ্বারা কর্মের সীমা নির্দেশ করা হয়েছে সেই 'মা ফলেষু কদাচন'-নীতি শিক্ষাক্ষেত্রেও কার্যকরী হওয়া স্বাভাবিক।

শিক্ষা-মোহ থেকে মুক্তি

কেবল শিক্ষালাভের জন্যে কোন কাজ করাও সকাম কর্ম হয়ে পড়ে। সেইজন্যে এইরূপ কর্মের মধ্যে 'ইদমদ্য ময়া

লব্ধম্'—আজ আমি এই পেয়েছি, 'ইদং প্রাপ্স্যে'—কাল এই পাব প্রভৃতি বাসনার উদয় হয়ই। এইজন্যে এই শিক্ষা-মোহ থেকে মুক্ত হতে হবে। যিনি এই শিক্ষা-মোহ থেকে মুক্ত হয়েছেন, সর্বোত্তম শিক্ষা তাঁরই লাভ হয়েছে—একথা বোঝা দরকার। 'অসুস্থ মাতার সেবা দ্বারা আমার অনেক শিক্ষা-লাভ হবে'—এই কথা মনে করে শিক্ষালাভের লোভে মায়ের সেবা করা উচিত নয়। 'মায়ের সেবা তো আমার পবিত্র কর্তব্য'—এই মনোভাব থেকেই মায়ের সেবা করা উচিত। পক্ষান্তরে মায়ের সেবার জন্যে তথাকথিত শিক্ষার বিঘ্ন হবে এবং এতে 'আমার শিক্ষার' ক্ষতি হবে—এই ভয়ে মায়ের সেবা থেকে বিরত হওয়াও উচিত নয়।

পরিশ্রমের স্থান

শিক্ষাক্ষেত্রে মৌলিক গুরুত্বপূর্ণ ও জীবনযাত্রা নির্বাহের জন্যে উপযোগী এমন শ্রমের প্রয়োজন রয়েছে বলে কোনো-কোনো শিক্ষাবিজ্ঞানী স্বীকার করে থাকেন। তাঁরা বলেন যে, এইরূপ শ্রমকে 'পেট ভরাবার' জন্যে নয়, শিক্ষার অঙ্গরূপেই গ্রহণ করতে হবে। 'পেট ভরানো'—এই কথার যে বিকৃত ব্যাখ্যা আজকাল প্রচলিত হয়েছে তাতে অসন্তুষ্ট হয়েই এইরূপ বলা হয়ে থাকে এবং সেই হিসাবে এ কথা বলাই ঠিক। কিন্তু ভগবান যে মানুষকে পেট দিয়েছেন এতে নিশ্চয়ই তাঁর কোন অভিপ্রায় রয়েছে। ধর্মের পথে ক্ষুধা

মেটাবার সাধনায় যদি মানুষ সিদ্ধ হয় তাহলে সমাজের বহু দুঃখ ও পাপের অবসান ঘটবে। এইজন্যেই মনু 'যোঽর্থে শুচিঃ স হি শুচিঃ', যে-বস্তু আর্থিক ভাবে পবিত্র সে-বস্তুই পবিত্র—এইপ্রকার সত্য ব্যক্ত করেছেন। 'সর্বেষাম্ অবিরোধেন' কি করে বাঁচা যায়—সমগ্র শিক্ষার এটাই মূল কথা। কোনও বিরুদ্ধাচরণ না করে শরীর-যাত্রা নির্বাহ করাই মানুষের প্রধান কর্তব্য। এইপ্রকার কর্তব্যসাধন দ্বারাই মানুষের আধ্যাত্মিক উন্নতি হয়। আর এইরূপ শরীর-যাত্রা নির্বাহের জন্যে উপযুক্ত পরিশ্রমকেই শাস্ত্রকারেরা 'যজ্ঞ' নাম দিয়েছেন। 'উদর-ভরণ নোহে, জাণিজে যজ্ঞ-কর্ম'—'উদর-ভরণ বা শরীর প্রতিপালন নয়, একে যজ্ঞকর্মরূপে জানো' বামন পণ্ডিতের এই বচন প্রসিদ্ধ। সুতরাং 'আমি শরীর-যাত্রার জন্যে পরিশ্রম করছি'—এই ভাবনা অনুচিত নয়। শরীর-যাত্রার অর্থ নিজের সাড়ে তিন হাত শরীরের যাত্রা না বুঝে সমগ্র সমাজ-শরীরের যাত্রা—এই উদার অর্থ মনের মধ্যে গ্রহণ করতে হবে। নিজের শরীর-যাত্রা অর্থাৎ সমাজের সেবা এবং এইজন্যেই তা ঈশ্বরের পূজা—এই সমীকরণ স্পষ্টভাবে বুঝে নিতে হবে। আর এই ঈশ্বর-পূজাতেই নিজের শরীরকে নিযুক্ত করা প্রত্যেকের কর্তব্য এবং এই কর্তব্য পালন করার সঙ্কল্প সকলকেই গ্রহণ করতে হবে। এইরূপ ভাবনা বাল্যকাল থেকেই হওয়া চাই। এইজন্যে শক্তি অনুযায়ী জীবন-ক্ষেত্রে অংশ গ্রহণ করার সুযোগ

বাল্যকালেই দিতে হবে এবং জীবন-ক্ষেত্রকে অবলম্বন করে আবশ্যকতানুযায়ী সমগ্র শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে।

এতে জীবন খণ্ডিত হবে না। জীবনের নানা কর্তব্য হুড়মুড় করে হঠাৎ একসঙ্গে এসে পড়াতে যে-বিপত্তির সৃষ্টি হয় তাও হবে না। অজ্ঞাতসারে শিক্ষালাভ হবে, কিন্তু শিক্ষা-মোহে জড়িয়ে পড়তে হবে না এবং নিষ্কাম কর্মসাধনে প্রবৃত্তি আসবে।—(মধুকর থেকে)

পূর্ণ থেকেই পূর্ণ

শ্রুতি বলেছেন—'পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে',—পূর্ণ থেকে পূর্ণের উদ্ভব হয়। এ প্রাকৃতিক বিকাশের নিয়ম। প্রশ্ন উঠবে এর অর্থ কি? আদিতেও পূর্ণ অন্তেও পূর্ণ—তাহলে 'বিকাশ' কিসের হবে? অপূর্ণ যখন পূর্ণ হয়, তখন সেটা যে 'বিকাশ' সে-সম্বন্ধে সন্দেহ থাকে না। কিন্তু 'পূর্ণ থেকে পূর্ণ'—এ কথাটাই যেন অর্থশূন্য বলে প্রতীয়মান হয়।

ছোট পূর্ণ থেকে বড় পূর্ণ

যদিও বাহ্যত এই কথা অর্থশূন্য বলে মনে হয়, তথাপি এতে গভীর অর্থ নিহিত রয়েছে। পূর্ণ থেকে পূর্ণ অর্থাৎ ছোট পূর্ণ থেকে বড় পূর্ণ। আদিতে ছোট পূর্ণ আর অন্তে বড় পূর্ণ। বাল্যকালে একটি চোখ, আধখানা নাক আর যুবক বয়সে তা বিকশিত হয়ে দুইটি চোখ আর একটি নাক হয়ে যায়, এমন নয়। ছোটকালেও দুই চোখ আর এক নাক থাকে বড়কালেও তাই। দুটোই পূর্ণ, একটি ছোট পূর্ণ আর একটি বড় পূর্ণ এই হল তফাৎ। দুই ইঞ্চি লম্বা সরল রেখাও পূর্ণ, চার ইঞ্চি লম্বা সরল রেখাও পূর্ণ। প্রথমটি ছোট আর দ্বিতীয়টি বড়। দুই ইঞ্চি ব্যাসের বৃত্তও পূর্ণ বৃত্ত আর চার ইঞ্চি ব্যাসের বৃত্তও পূর্ণ বৃত্ত। প্রথমটি ছোট

আর দ্বিতীয়টি বড়। আকাশের আমলকীসদৃশ বিন্দু দূরবীণে কুমড়ার মতো বড় বৃত্তরূপে প্রতীয়মান হয়। এখানে দূরবীণের কাজ কি? দূরবীণের দ্বারা কী রকম বিকাশ হয়েছে? দূরবীণ কি অপূর্ণ বিন্দুকে পূর্ণ বিন্দুতে পরিণত করেছে? না, ছোট পূর্ণ বিন্দুকে বড় পূর্ণ বিন্দু করে দিয়েছে? দূরবীণ কি এমন কিছু করেছে যে, আমলকীর সমান যার মূল্য ছিল তার মূল্য কুমড়ার সমান করে দিল?

ছোট শূন্য থেকে বড় শূন্য

বস্তুত শিক্ষা-বিজ্ঞান এর থেকে বেশী কিছু করতে পারে না। শিক্ষাশাস্ত্রের যদি ব্যাখ্যাই করতে হয়, তবে খুশী মনে এপর্যন্ত বলা যায়—যা আমলকীর সমান শূন্যকে কুমড়ার সমান শূন্যে পরিণত করতে পারে। শিক্ষার দ্বারা আমলকী থেকে কুমড়া হয় না। সমর্থ রামদাস স্বামীর ভাষায় বলতে গেলে বলতে হয়—'মূর্খ' থেকে 'পঠিত মূর্খ' অথবা বড়জোর আধ-কাঁচা সেয়ানা থেকে 'দীড শাহাণা' অর্থাৎ দেড় সেয়ানা (মূর্খ) হতে পারে। ঠাট্টা ছেড়ে দিয়ে রামদাস স্বামীর কথার ভাবার্থ গ্রহণ করলে নৈসর্গিক বিকাশের অভিনব সূত্র 'কি করে পূর্ণ থেকে পূর্ণ হল'—এ কথার অর্থ হৃদয়ঙ্গম করা যাবে।

অস্পষ্ট থেকে স্পষ্ট

ভোর পাঁচটায় সম্মুখের গাছটি আবছা-আবছা দেখা যায়। দেখা তো যায় পুরা গাছটিই, কিন্তু তা অস্পষ্ট

দেখা যায়। আধঘণ্টা পরে তা স্পষ্ট হয়। এবারও প্রথম বারের মতোই সম্পূর্ণ গাছটিই দেখা যায়, কিন্তু তা স্পষ্ট। সূর্যোদয়ের পরেও সেই সম্পূর্ণ গাছটিই দেখা যায়, কিন্তু এবার একেবারেই স্পষ্ট দেখা যায়। এমন কিন্তু কখনও হয় না যে, পাঁচটার সময় গাছের চার ভাগের এক ভাগ দেখা যায়, সাড়ে পাঁচটায় অর্ধেক দেখা যায় আর সূর্যোদয়ের পর সম্পূর্ণ দেখা যায়। যা হয়, তা হচ্ছে প্রথমবার অস্পষ্ট সম্পূর্ণ, দ্বিতীয়বার স্পষ্ট সম্পূর্ণ আর তৃতীয়বার অতি স্পষ্ট সম্পূর্ণ। সূর্যের আলো অস্পষ্ট থেকে স্পষ্ট আর স্পষ্ট থেকে অতি স্পষ্ট এই বিকাশটি ঘটিয়ে তোলে। কিন্তু তিন বারই সম্পূর্ণেরই এইরূপ বিকাশ হয়। এ থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, ছোট পূর্ণ থেকে বড় পূর্ণ, অস্পষ্ট পূর্ণ থেকে স্পষ্ট পূর্ণ—প্রাকৃতিক বিকাশ এমন করেই হয়।

অপূর্ণ থেকে পূর্ণ আর পূর্ণ থেকে পূর্ণ

অপূর্ণ থেকে পূর্ণ হওয়াই বা কি আর পূর্ণ থেকে পূর্ণ হওয়াই বা কি—একথা বুঝবার জন্যে একটি দৃষ্টান্ত নেওয়া যাক। মনে করুন, আমরা সমুদ্রের তীরে দাঁড়িয়ে আছি আর জাহাজ প্রভৃতি কোন কিছুই আমাদের দৃষ্টিপথে নেই। অল্পক্ষণ পরে একটি জাহাজ দেখা গেল, অর্থাৎ জাহাজের কেবল উপরিভাগ দৃষ্টিপথে এলো। আর কিছুক্ষণ পরে মধ্যভাগও দেখা গেল, তারপর সম্পূর্ণ জাহাজটিই দেখা

গেল। সম্পূর্ণ দেখা গেলেও অনেক দূরে থাকাতে জাহাজটি অস্পষ্ট দেখা যেতে লাগল। পরে জাহাজটি যতই কাছে আসতে থাকল ততই স্পষ্ট হতে লাগল। জাহাজটি সর্বপ্রথম দৃষ্টিপথে পতিত হওয়ার পর থেকে সম্পূর্ণ জাহাজটি দেখা পর্যন্ত যে-ঘটনা ঘটল, তাকে 'অপূর্ণ থেকে পূর্ণ' হওয়ার দৃষ্টান্তস্বরূপ নেওয়া যেতে পারে। তারপর সম্পূর্ণ জাহাজটি যেভাবে স্পষ্ট সম্পূর্ণরূপে দেখা দিতে থাকল তাকে 'পূর্ণ থেকে পূর্ণ' হওয়ার দৃষ্টান্ত বলা যেতে পারে।

ভূগোল শিক্ষার দৃষ্টান্ত

জনৈক শিক্ষক ছাত্রদের ভারতবর্ষের ভূগোল পড়াচ্ছিলেন। তিনি প্রথমেই ভারতবর্ষের সম্পূর্ণ মানচিত্র দেখালেন, পরে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে প্রদেশের মানচিত্র দেখালেন। তারপর প্রত্যেক প্রদেশের নদীগুলি দেখালেন; মানচিত্রে সমস্ত প্রদেশের ঐতিহাসিক, ধর্মসম্পর্কিত ও ব্যবসাসংক্রান্ত স্থানগুলি দেখালেন এবং আরও ছোটখাট অনেক স্থান সম্বন্ধে বর্ণনা দিলেন। এই শিক্ষক ছাত্রদের জ্ঞানকে 'পূর্ণ থেকে পূর্ণে'র দিকে নিয়ে যাচ্ছিলেন।

দ্বিতীয় প্রকারের প্রয়োগ

আর এক শিক্ষক ভারতবর্ষের ভূগোল শেখাতে আরম্ভ করে' প্রথমে একটি জেলা সম্বন্ধে বিশদ জ্ঞান দিয়ে দ্বিতীয়

জেলা সম্বন্ধে অনুরূপ শিক্ষা দিলেন। এমনি করে অবশেষে প্রদেশের সমস্ত জেলাগুলি সম্বন্ধেই বিশদভাবে বললেন। এতে দেখা গেল ছাত্রদের একটি প্রদেশ সম্বন্ধে বিশেষভাবে জানা হলেও অন্য প্রদেশগুলি সম্বন্ধে তাদের জ্ঞান শূন্যই থেকে গেল। শিক্ষক আবার প্রত্যেক প্রদেশ সম্বন্ধে ছাত্রদের নানা শিক্ষা দিয়ে দিয়ে সমগ্র ভারতবর্ষের ভূগোলশিক্ষাই সম্পূর্ণ করলেন। এভাবে যে-শিক্ষক ভারতবর্ষের ভূগোল শিক্ষা দিলেন, তিনি ছাত্রদের জ্ঞানকে 'অপূর্ণের থেকে পূর্ণে'র দিকে নিয়ে গেলেন—এই কথা বলা যেতে পারে। আত্ম-বিকাশের সনাতন নিয়ম—পূর্ণ থেকে পূর্ণের দিকে চলা। যে-কোন আত্মবান বস্তুর বিকাশ এই সূত্রানুসারেই হয়ে থাকে।

শিল্পকলার দৃষ্টান্ত

'ক্লে মডেলিং' (মাটি দিয়ে মূর্তি নির্মাণের কলা) সম্বন্ধে এক বইয়ে অপূর্ণ মূর্তি থেকে পূর্ণ মূর্তি গড়বার পদ্ধতি অবলম্বন করতে স্পষ্ট নিষেধ করা হয়েছে। গ্রন্থকার নিজ অভিজ্ঞতা বর্ণনাচ্ছলে বলেছেন, 'প্রথমে মাটি দিয়ে যে-কোনো আকৃতি গড়ে পরে অভীষ্ট মূর্তিতে পরিণত করাই ঠিক'—এরকম ভেবে কোন কাজ যেন না করা হয়। মূর্তি গড়বার আরম্ভ থেকে শেষ পর্যন্ত যে কেউ দেখে যাতে সম্পূর্ণ মূর্তিটি অনুমান করতে পারে এমনভাবেই কাজ শুরু করা উচিত। এরকম হলেই মূর্তিতে শিল্পের বিকাশ ঘটে। অনেক

ক্ষেত্রে শিল্পীরা এভাবে কাজ আরম্ভ করেন না, তাঁরা বলেন, 'এখন কি দেখছেন? আগে শেষ হোক, তখন আমার পরিকল্পনার মূর্তি ফুটে উঠবে।' তাঁরা প্রথমে কিম্ভূত-কিমাকার কিছু গড়ে পরে সেটাকে শোধরাতে বসেন। এই-রূপ স্বেচ্ছাচারিতায় শিল্পসাধনা সম্ভব নয়। শিল্প অমর। অমর আত্মা থেকেই শিল্প উৎসারিত হয়। সুতরাং 'পূর্ণ থেকে পূর্ণ'—আত্মবিকাশের এই নিয়ম শিল্প-বিকাশেও প্রয়োগ সম্ভব; রাষ্ট্র-নির্মাণ কার্যকুশলী শিল্পীর পক্ষেই সম্ভব।

কারণ, রাষ্ট্র-নির্মাণকার্য একটি বিরাট শিল্পকার্য। অতএব 'পূর্ণ থেকে পূর্ণ'—এই নিয়ম অনুসারেই যদি রাষ্ট্র-নির্মাণের কাজ করা হয়, তবেই তা সার্থক হতে পারে।

—('মধুকর' থেকে)—

আজকালকার অনর্থকরী শিক্ষা

কলেজীয় শিক্ষা সম্বন্ধে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র

বাংলাদেশের কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান অধ্যাপকদের এক সম্মেলনে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় তাঁর সভাপতির অভিভাষণে আজকালকার উচ্চ শিক্ষার জন্যে কি ভাবে জাতীয় সম্পত্তির অপব্যয় হচ্ছে, তা সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন যে, বাংলাদেশের নয়শত বিদ্যালয় থেকে অন্যূন পনের হাজার ছাত্র-ছাত্রী প্রতি বছর প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়। এই ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে নয় হাজার কলেজে ভর্তি হয় এবং তাদের মধ্য থেকে ন্যূনাধিক পাঁচশতজন এম. এ. পাশ করে বেরোয়। এই পাঁচশ থেকে ৫০-জন অধ্যাপকের কাজে নিযুক্ত হন আর বাকী ৪৫০-জন কেরাণী প্রভৃতির কাজ করে মাসিক গড়ে ৫০৲ টাকা রোজগার করেন। এ ছাড়া উপরোক্ত ৯-হাজারের মধ্যে কিছু লোক উকিল, ডাক্তার, ইঞ্জিনীয়ার প্রভৃতির পেশা গ্রহণ করেন। আজকাল এইসব ব্যবসাতেও এত বেশী ভীড় হয়েছে যে, অনেকেরই এসব ব্যবসা করে সংসার চালানো কঠিন হয়ে পড়েছে। এই কারণে, আচার্য রায়ের মতে ৯-হাজারের জায়গায় ৯-শত ছাত্রের কলেজে ভর্তি হওয়া উচিত। এই ৯-শত জনই অধ্যাপনা ও ওকালতি প্রভৃতি উচ্চ ব্যবসার জন্যে যথেষ্ট। বাকী ৮-হাজার

১০০-জন ছাত্র কলেজে ভর্তি হয়ে প্রতি বছর প্রায় ৩০ লক্ষ টাকার অপব্যয় করছে। আচার্য রায়ের এই হিসাব অনুসারে প্রতি ছাত্রের পেছনে দৈনিক গড়ে ১৲ টাকা খরচ হয়ে থাকে। উপরোক্ত হিসাব অনুসারে এই সিদ্ধান্তে তিনি উপনীত হয়েছেন যে, প্রতি বছর প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্ররা ইচ্ছা করলে ৩৬০৲ পুঁজিতে লাভজনক ব্যবসাবাণিজ্য করে জীবনযাত্রা নির্বাহ করতে পারে। অবশ্য তারা যদি শ্রমের মর্যাদা দিতে প্রস্তুত থাকে।

প্রচলিত শিক্ষায় কি ক্ষতি হয়েছে?

আজ আমরা এক বিকট সমস্যার সম্মুখীন হয়েছি। যে ছাত্র প্রবেশিকা পর্যন্ত পড়েছে, প্রচলিত শিক্ষার প্রভাবে সে শ্রমমর্যাদা তো দূরের কথা আত্মমর্যাদা হারিয়ে বসেছে। তৎসত্ত্বেও বহু লোক বলেন যে, এই শিক্ষাব্যবস্থা থেকেই যথাসম্ভব অভীষ্ট লাভ করতে হবে। যে-শিক্ষাব্যবস্থায় গুরু-শিষ্যসম্বন্ধ অত্যন্ত শিথিল, যেখানে ত্যাগ বা সেবার ভাব বিন্দুমাত্র নেই, যেখানে কোন নৈতিক পরিবেশ নেই, ধর্মসাধনার চেষ্টা নেই, মাতৃভাষার প্রতি সম্মান নেই, শ্রমের মর্যাদা নেই এবং স্বাধীন মনোবৃত্তির কোন মূল্য পর্যন্ত নেই সেখানে আমাদের কোন্ অভীষ্ট সিদ্ধ হতে পারে? আর সেখানে টাকা-আনা-পাইয়ের হিসাবে কত অর্থ নষ্ট হল তার হিসাবও বা কি করে করা যায়? তবে যেহেতু পরাধীন

লোকেরা পয়সাকে ঈশ্বর মনে করে, সেজন্যে টাকাপয়সার হিসাবেই কতটা অনিষ্ট হচ্ছে তা তারা সহজে বুঝতে পারে। একথা মনে করেই আচার্য রায় এ হিসাব দাখিল করেছেন। অন্তত আর্থিক ক্ষতি অনুভব করেও যদি আমাদের চোখ খোলে!

বল্লভভাইয়ের মত

নাসিক কংগ্রেসের পর এই অঞ্চলে সর্দার বল্লভভাই প্যটেল তাঁর সবগুলি ভাষণেই প্রচলিত শিক্ষাপদ্ধতির তীব্র সমালোচনা করেছেন। আধুনিক কালের স্কুল ও কলেজের শিক্ষা যে সম্পূর্ণরূপে অকেজো, এই অভিমতই তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে ব্যক্ত করেন।

সরকার জালে জড়িয়ে পড়েছে

কোনো বেসরকারী লোকের মুখে এইজাতীয় কথা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ শোনায় না। কিন্তু রাষ্ট্রনীতি ও শাসননীতি যাঁর অধিকারে রয়েছে এমন কোন রাষ্ট্রনায়কের মুখে একথা শুনে যে-কোনো লোকই প্রশ্ন করতে পারে, 'আপনাদের মতে প্রচলিত শিক্ষাপদ্ধতি যদি এতই খারাপ হয়ে থাকে তাহলে আপনারা এ পদ্ধতি বদলে দিচ্ছেন না কেন?' সর্দার পটেল তাঁর আহমদাবাদের বক্তৃতায় এই প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, 'আমরা সবাই এমন জালে জড়িয়ে পড়েছি যে, এই জাল কেটে বাইরে আসা খুব মুশ্‌কিল হয়ে পড়েছে।'

পরিকল্পনা রচনা করা পর্যন্ত ছুটি থাকুক

উপরোক্ত ভাষণে নিঃসন্দেহে একথা স্পষ্ট হয়েছে যে, যত শীঘ্র এজাল থেকে মুক্ত হওয়া যায় ততই মঙ্গল। আমি

অনেকবার বলেছি যে, গান্ধীজীর পরিকল্পিত 'নঈ তালীম' শিক্ষাপদ্ধতি সন্তোষজনক মনে না হলে অন্য কোন সন্তোষ-জনক পদ্ধতি নির্ণয়ের জন্যে দেশের সকল শিক্ষাবিশেষজ্ঞ এক জায়গায় সম্মিলিত হয়ে আলোচনাদি করতে পারেন। এই কাজে কিছু সময় লাগবে সন্দেহ নেই, সে পর্যন্ত দেশের যাবতীয় স্কুলকলেজের ছুটি থাকতে পারে। এই ছুটিতে দেশের বিশেষ ক্ষতি হবে না বরং প্রচলিত শিক্ষাপদ্ধতি অনুযায়ী শিক্ষা চলতে থাকলে তাতেই অনেক বেশী ক্ষতি হবে।

পুরানো পতাকা নয়

একদিন আলোচনা প্রসঙ্গে এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'আচ্ছা, রাষ্ট্রবিপ্লবের ফলে যদি কোন দেশে পুরানো সরকারের পরিবর্তে নূতন সরকার আসে, তাহলে কি নূতন রাজ্যে পুরানো রাজ্যের পতাকা থাকতে পারে?' উত্তরে তিনি বললেন, 'না, তা থাকতে পারে না।' আমি বললাম, শিক্ষা সম্পর্কেও ঠিক এইরকম হওয়া চাই। যেমন নূতন রাজ্যে নূতন পতাকা, তেমনি নূতন রাষ্ট্রে নূতন শিক্ষা-ব্যবস্থা হওয়া চাই। স্বাধীনতার পর নূতন রাজ্যব্যবস্থায় যদি পুরানো শিক্ষাপদ্ধতিই চালু থাকে তো বুঝতে হবে সেই রাজ্যপরিবর্তন বাইরের লোকদেখানো ব্যাপারমাত্র, ভিতরে ভিতরে পুরানো ব্যবস্থারই পুনরাবৃত্তি চলছে।

—('সেবক', জানুয়ারী, ১৯৫১)—

প্রকৃত শিক্ষা বিদ্যালয়ের বাইরে

চাণ্ডিল সম্মেলনে জয়প্রকাশজী ছাত্রদের স্কুলকলেজ ছেড়ে দুই-এক বছরের জন্যে ভূদানযজ্ঞের কাজে আত্মনিয়োগ করতে বলেছিলেন। এসম্পর্কে আমার মত জিজ্ঞেস করাতে বলেছিলাম, 'ভূদানযজ্ঞের কাজ না করলেও ছাত্রদের কলেজ ছাড়া দরকার।' একথা শুনে ছাত্রেরা খুব আমোদ পেয়েছিল।

কলেজের বাইরে জ্ঞানভাণ্ডার

সাঁইত্রিশ বছর আগের কথা। জ্ঞানান্বেষণে কলেজ ছেড়ে বাইরে এসেছিলাম। কলেজে বহু জিনিসই দেখতে পেয়েছিলাম, কিন্তু জ্ঞানের দেখা পাইনি। বাস্তবিকই কলেজের দরজা বন্ধ হওয়ার পর জ্ঞানের অনন্ত দরজা আমার সামনে খুলে গেল। আমার জ্ঞানের উপাসনা আজ পর্যন্ত চলছে। জ্ঞানই সর্বাপেক্ষা পবিত্র বস্তু—একথাই আমি মেনে এসেছি। এইজন্যেই কলেজে যে-কালক্ষেপ হচ্ছিল, তা আমার সহ্য হল না। আজ পর্যন্ত ছাত্রদের সঙ্গে প্রায়ই আমার আলাপ-পরিচয় হয়ে এসেছে। তারা বিদ্যালয়ে কি শেখে, সে সম্বন্ধেও অনেক বিচার-বিবেচনা করেছি। আমি দেখেছি যে, শিক্ষার ব্যাপারে সাঁইত্রিশ বছর আগেও যে-জাতীয় খাদ্য পরিবেষিত হত আজও সেই নমুনার খাদ্যই

দেওয়া হচ্ছে। তফাৎ এই—সে-সময় দেশ ছিল পরাধীন, আজ দেশ স্বাধীন। একদিকে কোটি-কোটি লোক অন্ধের মতো কাজ করে চলেছে, অন্যদিকে লক্ষ-লক্ষ ছাত্রকে কর্ম-নিঃসম্পর্কিত মূঢ় শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে। একদিকে আদেশ-পালনকারী আর অন্যদিকে আদেশদাতা—সমগ্র সমাজ এই-ভাবে দ্বিধা বিভক্ত হয়ে গেছে। মানসিক দৈন্য, আর্থিক দারিদ্র্য ও দুঃখ সমাজকে আজ আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। প্রচলিত শিক্ষাপদ্ধতির যতদিন না পরিবর্তন ঘটছে, ততদিন এসব দুঃখদারিদ্র্য ঘুচবার নয়।

—('সেবক', জুন, ১৯৫৩)—

বিদ্যার পরিহাস

যাত্রাপথে অনেক স্থানে আমাদের থাকবার ব্যবস্থা বিদ্যালয়গৃহে হয়ে থাকে। আর ছোট-ছোট গ্রামে পাঠশালার বাড়ীই অপেক্ষাকৃত ভাল থাকে। এইসকল বাড়ীতে আমাদের থাকারও সুবিধা হয়, বালকদেরও এতে খুব আনন্দ হয়। কারণ, আমাদের জন্যে ওদের স্কুল ছুটি হয়ে যায়।

ছুটির দানছত্র

এমন এক স্কুলে যে-কামরায় আমাদের থাকবার জায়গা হয়েছিল, সেখানে পাঠশালার জন্যে চলতি বছরের ছুটির তালিকা টাঙ্গানো ছিল। তাতে সর্বসমেত ছোটবড় চল্লিশটি পর্বদিনের জন্যে পঞ্চান্ন দিন ছুটি দেওয়া হয়েছে দেখলাম। এর সঙ্গে আরও একদিন আমাদের আসার জন্যে ছুটি দেওয়া হয়েছে। এদেশে বহুধর্ম প্রচলিত আছে, প্রত্যেক ধর্মেই অনেক মহাপুরুষ হয়েছেন আর প্রত্যেক মহাপুরুষের বহু শিষ্যও রয়েছে। কাজেই এইসব মিলে ছুটির দানছত্র বসে যায়। ফলে, ছেলেদের ছুটির পাল্লা সহজেই সর্ব-ধর্ম-সমভাবের ভারে ভারী হয়ে ওঠে।

জন্ম-মৃত্যু

আর জন্ম-মৃত্যু তো সমানভাবে চলছেই। মনে আছে, আমাদের ছোটবেলায় রাজার মৃত্যুতে একদিন ছুটি হত,

রাজার জন্মদিনের ছুটি তো ছিলই। হিন্দুসমাজেও একই ব্যাপার রয়েছে—শ্রাদ্ধেও খাওয়াদাওয়া, জন্মোৎসবেও খাওয়াদাওয়া। কেউ মরুক কি বাঁচুক, মিষ্টি সব সময়ই জুটবে।

জয়ন্তী

যাই হোক ঐ ছুটির ব্যবস্থা উত্তরপ্রদেশের শিক্ষাবিভাগ থেকে করা হয়েছিল। মজার কথা এই-যে তাতে উত্তর প্রদেশের সর্বজনপ্রিয় সন্ত তুলসীদাস, সুরদাস ও কবীরদাসের স্মৃতির জন্যে কোন ছুটি দেওয়া হয়নি। নইলে বিদ্যালয়ের অর্থাৎ 'বিদ্যার লয়ের' মাত্রা আরও বেড়ে যেত। তবে হাঁ, গুরু নানক এবং গুরু গোবিন্দসিংহের স্মৃতিতে অবশ্যই ছুটি দেওয়া হয়েছে। বুদ্ধ, মহাবীর, মহম্মদ এঁদের নামে তো ছুটি দিতেই হবে। কারণ, যাঁদের নাম নিয়ে বিবাদের সৃষ্টি হতে পারে, কিম্বা যখন দেখা যাচ্ছে কারুর নামে সম্প্রদায় বা ভেদবুদ্ধির সৃষ্টি হয়েছে, তখন তাঁদের নামে ছুটি দিয়ে দাও—ব্যস্, ঝগড়া সমাপ্ত!

গ্রহণের জন্যেও ছুটি

সূর্য ও চন্দ্রগ্রহণের জন্যে দেখা গেল তিন দিন ছুটি রয়েছে। গ্রহণ হোক আর না-ই হোক, চন্দ্র-সূর্যের গতিতে কোন বাধা পড়ে না। কিন্তু ভক্ত লোকেরা খুঁজে বের করেছেন যে, গ্রহণের সময় নাকি চন্দ্র-সূর্যের গতি কিছুক্ষণের

জন্যে সামান্য মন্থর হয়ে পড়ে। এই গতিবেগ কমে আসার জন্যে সুবিধা পেয়ে থাকেন ছাত্র ও শিক্ষকরা। একদিন তো এক ভদ্রলোক আমাকে বললেনই, 'মশায়, খেয়ে-দেয়ে দুপুরে একটু ঘুমিয়ে নেওয়া খুবই দরকার। সূর্যদেবতা পর্যন্ত দুপুরে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে নেন।'

রবিবারের ছুটি

পরমেশ্বর ছয় দিন সৃষ্টিকার্য সমাধা করতে করতে শ্রান্তি অপনোদনের জন্যে সপ্তম দিন সম্পূর্ণ বিশ্রাম করে কাটালেন। এই বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে কোন সম্প্রদায় শুক্রবার, কেউ বা শনিবার, আর এখন তো প্রায় সকলেই সর্বত্র রবিবারকে 'হকের' ছুটি বলে স্বীকার করে নিয়েছে। কাজ থেকে ছুটি তো অনেকই রয়েছে, কিন্তু খাওয়া থেকে ছুটি কখনও নেওয়া হয় না। খাওয়াতে শ্রান্তি নেই। কেউ কেউ বলেন, 'রবিবার দিন আকণ্ঠ পুরে খাওয়া যায়, সেদিন তো আর আফিসে যাওয়ার তাড়া নেই। আর খাওয়ার পর ঘুমোবার জন্যে প্রচুর অবসর মিলে। অন্য দিন আফিসে যাওয়ার আগে পেটে কিছু পড়ল তো ভাল, নয়তো অনেক সময় কিছু না খেয়েই দৌড়তে হয়।' রবিবার ঈশ্বরের ভোজন সম্বন্ধে কোনো উল্লেখ নেই। কারণ, তাঁর বিশ্রামের গরজ ছিল, খাওয়ার জন্যে কোন গরজ ছিল না। আমাদের গরজ তো দুইটির জন্যেই। সেদিক থেকে আমরা ভগবানের চাইতেও এক পা এগিয়ে গেছি।

নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে ছুটি হলে সবারই খুব আনন্দ হয়, তেমনি খাওয়াতেও আনন্দ হয়। এর কারণ ব্যক্ত করার কোনো প্রয়োজন নেই। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে ছুটি নেওয়ার পর খাওয়া জোটে কি করে? এই গুরুতর সমস্যার সমাধান বিচারপূর্বক করতে হবে। যেখানে কাজ করলেও পেট ভরে খাওয়া জোটে না, সেখানে কাজ ছেড়ে কি করে জুটবে?

গরমের ছুটি

পর্বদিন ও রবিবারের ছুটি ছাড়া ইংরেজরা এদেশে গ্রীষ্মের জন্যেও ছুটির রেওয়াজ করে গিয়েছেন। 'বিদ্যা ও অবিদ্যার মিলনে আধ্যাত্মিক সাধনার পূর্ণতা হয়'—উপনিষদের এই সূত্রের সঙ্গে বিদ্যাশিক্ষার এবং গ্রীষ্মের ছুটির বেশ মিল আছে। গ্রীষ্মের ছুটির এই তিন মাসে অবিদ্যাচর্চার পরম সুযোগ উপস্থিত হয়, অর্থাৎ ছেলেপিলেরা সে সময় কাঁধ থেকে বৃথা বিদ্যার ভার ছুড়ে ফেলে দেওয়ার সুযোগ পায়। বিদ্যাদেবীর কাছে একশতে একশ না পেলে পাশ করা যায় না, কিন্তু বিদ্যা আর অবিদ্যা মিলে যাওয়াতে শতকরা তেত্রিশ পেলেই পাশ!

শিক্ষকদের কাজের সময়

নাগপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের জনৈক প্রধান অধ্যাপক এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, সপ্তাহে কুড়ি ঘণ্টার (period) বেশী পড়ানো তাঁদের পক্ষে সম্ভব নয়। প্রাদেশিক সরকার অবশ্য তাঁদের

অনুরোধ করেছেন, 'আজ দেশে আগের চেয়ে বেশী শ্রম করার প্রয়োজন হয়েছে, অধ্যাপকরাও সপ্তাহে চব্বিশ ঘণ্টা করে কাজ করলে ভাল হয়।' এই মতদ্বৈধের পরিণাম কি হল জানিনে, তবে দুই পক্ষই যদি আঠার ঘণ্টা কবুল করে নেন তাহলে ঝগড়া মিটে যায়। সপ্তাহের ছয় দিনে প্রতিদিন তিনঘণ্টা করে হলে তিন-ছয় আঠার ঘণ্টা হয়—এতে হিসাব বেশ মিলে যায়। অবশ্য কলেজের ঘণ্টা পুরা ষাট মিনিট না করার ইচ্ছা থাকাই ভাল। কারণ, আজ পর্যন্ত দেখা গেছে যে, ঐ পরিবেশে কোন এক বিষয়ে ষাট মিনিট একাগ্র হয়ে থাকার মতো ধৈর্য ছেলেপিলেদের থাকে না। ধার্মিকদের মতে নূতন বিষয় নূতন মুহূর্তে আরম্ভ করতে হয়। দুই দণ্ড বা আটচল্লিশ মিনিটে এক মুহূর্ত—এই মতানুসারেই হয়তো চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ মিনিটের মধ্যে সর্বত্র ক্লাসের ঘণ্টা হয়ে থাকে!

শিক্ষক এবং শরীরশ্রম

একথা আমিও মানি যে, সপ্তাহে ২০ ঘণ্টার (period) বেশী পড়ানো সম্ভব নয়। কারণ, পড়ানোর সময় মস্তিষ্ক, ফুস্‌ফুস্ আর গলার কত-যে পরিশ্রম হয় এসম্বন্ধে আমার অভিজ্ঞতা আছে। আজকাল আমি এক ঘণ্টার বেশী পড়ানোর কাজ করতে পারিনে। তবে ফাঁকি না দিয়ে আন্তরিকতার সঙ্গে পড়ানো চাই। দিনে তিন ঘণ্টা পড়ানোর কাজ করা হোক এবং তিন ঘণ্টা কোন উৎপাদক শ্রম করা হোক—সঙ্গে সঙ্গে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণে কোন আপত্তি

হওয়া উচিত নয়। কিন্তু যেহেতু এযাবৎ শরীরশ্রমকে শিক্ষকদের কর্তব্য কর্ম বলে স্বীকার করা হয়নি, সেজন্যে স্বধর্মে প্রতিষ্ঠিত শিক্ষকেরা সহজে এগিয়ে আসবেন না। এই প্রবন্ধ পরিহাসছলে লিখেছি বটে, কিন্তু মজুরদের হৃদয়বেদনা লুকাতে পারিনি। আমার এই অক্ষমতা আমি মাথা পেতে স্বীকার করে নিচ্ছি।

—('সেবক', জুলাই, ১৯৫২)

সংস্কৃত-শিক্ষার বাহনও ইংরেজী

ঘানির বলদ

সেদিন বৎসলা আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল। সে কলেজে পড়ছে। কি কি বিষয় পড়া হয় এ আলোচনাপ্রসঙ্গে জানলাম যে, বোম্বাই প্রদেশে সমস্ত স্কুলকলেজেই শিক্ষার বাহন ইংরেজী। বৎসলা বলছিল, সম্ভবত আরও দশ বছর ইংরেজীই শিক্ষার মাধ্যম থাকবে। একথা কতদূর সত্য, তা আমি জানিনে। তবে এখন পর্যন্ত যে এরকম চলছে, তা অনেকটা বুঝতে পারলেও সংস্কৃতও যে ইংরেজীতে শিখানো হয়—একথা শুনবার জন্যে প্রস্তুত ছিলাম না। অবশ্য মাতৃভাষা এখনো ইংরেজীতে পড়ানো হয় না, এ আমাদের সৌভাগ্য বলতে হবে। ভারতে ইংরেজীতে সংস্কৃত পড়ানো যে এক অদ্ভুত ব্যাপার—একথা সকলেই হৃদয়ঙ্গম করতে পারে। অনেকদিন ধরেই তা চলে আসছিল বটে, কিন্তু জানতাম

না যে আজও সেসব বন্ধ হয়ে' যায়নি। সংস্কৃতের সঙ্গে যে আমাদের মাতৃভাষার অতি নিকট সম্বন্ধ রয়েছে শিক্ষকদের কি সে কথা জানা নেই ? মাতৃভাষার মাধ্যমে সংস্কৃত পড়ালে কত সহজে আর কত সরস করেই না তা পড়ানো যায়। সংস্কৃতের মাধ্যমে শিখালে অবশ্য তা সরসতর হয়। মাতৃভাষা বা সংস্কৃতের পরিবর্তে কেন যে ইংরেজীর মাধ্যমে সংস্কৃত পড়ানো হয় তা আমার বুদ্ধির অগম্য। দেখা যাচ্ছে, মানুষ গতানুগতিকতার পথ ছাড়তে চায় না। উপমাটি খুব উৎকৃষ্ট না হলেও বলতে হচ্ছে যে, আমরা ঘানির বলদের মতোই গতানুগতিকতার দাস হয়ে পড়েছি।

সংস্কৃত-শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা

বৎসলার কাছে আরও শুনলাম পাঠ্যতালিকার অন্তর্ভুক্ত সংস্কৃত সাহিত্যগুলি এত আদিরসপূর্ণ যে, ক্লাসে সেসব পড়া এবং আলোচনা করা প্রায় অসম্ভব। ছত্রিশ বছর আগে আমি যখন বরোদা কলেজে পড়তাম তখন সেখানে ঋতুসংহার, মেঘদূত প্রভৃতি কাব্য পড়ানো হত। ভগবানের দয়ায় আমি কলেজে সংস্কৃতের বদলে ফরাসী ভাষা নিয়েছিলাম, তাই উপরোক্ত সকল প্রকার কষ্টের হাত থেকে মুক্তি পেয়েছিলাম। ভেবে দেখতে হবে—সংস্কৃত-শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্যটি কি ? বিবেকানন্দ বলেছেন, 'যদি বেদান্তের প্রচার চাও, তো লোকদের সংস্কৃত শেখাও, তাতেই তোমার কাজ হয়ে যাবে।' বিবেকানন্দের কাছে সংস্কৃতের অর্থই বেদান্ত। গীতা, উপনিষদ, রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি সংস্কৃতের জীবন্ত সাহিত্য।

কিন্তু কলেজে মৃতপ্রথার অনুসরণকারীদের কাছে এই সমস্ত জীবন্ত সাহিত্য ভাল লাগে না। তবু চক্ষুলজ্জার খাতিরে বি.এ.-র পাঠ্য-তালিকায় এসব সাহিত্যের কিছু অংশ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে

আজকাল যেসব বই সংস্কৃতের নামে কলেজে পড়ানো হয়, কেবল সেইজাতীয় বই-ই যদি সংস্কৃতে থাকত, তাহলে আমি সংস্কৃতই শিখতাম না। যদিও সংস্কৃতে নাটক, উপন্যাস প্রভৃতি রয়েছে, কিন্তু সংস্কৃত সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য ওসবে পাওয়া যায় না। আধুনিক ভাষাসমূহে নাটক-উপন্যাস জাতীয় সাহিত্য প্রচুর রয়েছে। কাজেই এসব পড়ার জন্যে সংস্কৃত শেখার দরকার কি? আধ্যাত্মিক শাস্ত্রাদি পড়বার জন্যে সংস্কৃত শিখবার ইচ্ছা হতে পারে অথবা কেবল ভাষা শিখবার জন্যে। কিন্তু আমরা সর্বসাধারণের মঙ্গলের কথা বিবেচনাই করি না আর সেজন্যেই সংস্কৃত শিক্ষাতে প্রকৃত কল্যাণ কি হবে তা বুঝতে পারি না। —('সেবক', ডিসেম্বর, ১৯৪৯)

ছুটির ব্যবস্থা

ভারতবর্ষে হাজার হাজার বছর ধরে অধ্যয়ন-অধ্যাপনার রীতি চলে আসছে, কিন্তু বিদ্যালয়গুলিতে লম্বা ছুটি দেওয়ার কল্পনা কখনও কারুর মাথায় আসেনি। ইংরেজী-শিক্ষার গোড়াতেই

বিদ্যায়তনে ছুটি দেওয়ার রেওয়াজ শুরু হয়েছে। প্রথম দিকে সপ্তাহে একদিন অনভ্যাস আরম্ভ হয়। আর তাছাড়া যদি কোন বড়লোক বিদ্যালয় দেখতে আসতেন, কিম্বা অন্য কোন বিশেষ উপলক্ষ দেখা দিত তাহলে ছুটি দেওয়া হত। আজকাল তো বছরে বড়জোর ছয়-সাত মাসের বেশী পাঠশালাই বসে না। কারণ আজকালকার পাঠশালা জেলখানায় পরিণত হয়েছে, কাজেই ছুটির প্রয়োজনীয়তাও অনুভব করতে হচ্ছে। অর্থাৎ ছুটির বিরুদ্ধে নালিশ করার কোন কারণই আজ নেই।

বর্ষাকালে ছুটি হোক

তবে যদি ছুটি দিতেই হয়, তা কখন দেওয়া উচিত—সে সম্বন্ধে পুনর্বিবেচনা করা দরকার। আজকাল গ্রীষ্মকালে লম্বা ছুটি দেওয়ার এক নিয়ম চালু হয়েছে। এদেশের গ্রীষ্ম ইংরেজরা সহ্য করতে পারতেন না, সেজন্যেই গ্রীষ্মকালে লম্বা ছুটি দেওয়া হত। কারণ সে সময়টা ইংরেজরা সকলে কোন ঠাণ্ডা জায়গায় একত্র হতেন। কিন্তু আজকাল তো সেই প্রশ্নই ওঠে না। সাহেবরা এখন ভারতবর্ষ ছেড়ে চিরকালের জন্যে ইংলণ্ডে চলে গেছেন। সুতরাং গরমে লম্বা ছুটির বদলে বর্ষায় লম্বা ছুটি করে দিলেই ভাল হয়। বর্ষাকালে ছুটি থাকলে ছাত্ররা চাষীদের সঙ্গে চাষের কাজ করতে পারবে, কারণ সে সময় ক্ষেতে লাঙ্গল দেওয়া হয়ে থাকে। একসঙ্গে দেড় মাসের ছুটি না দিয়ে লাঙ্গল দেওয়ার সময় দেখে দেখে কয়েকবারে ১৫ দিন করে ছুটিও দেওয়া যেতে পারে। গরমের সময় দিন বড় হয়ে যায়,

ক্ষেতে কোন কাজ থাকে না। এই সময় ছুটি হলে ছেলেরা হয় রোদের মধ্যে এদিক ওদিক ঘোরাফেরা করে, নয়তো বাড়ী ফিরে দীর্ঘ কাল আলস্যে কাটায়, এছাড়া তাদের আর কিছুই করার থাকে না। এই কারণে অন্তত ছুটির সময় পরিবর্তন করা নিতান্ত প্রয়োজন। একথা আজ আমাদের মনে রাখতে হবে যে, ইংরেজ-রাজত্বের অবসান ঘটেছে এবং কৃষকের অর্থাৎ জনগণের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। —(সিংহাবলোকন)

পারিবারিক পাঠশালা

জীবনক্রিয়ার সঙ্গে বিযুক্ত চিন্তাই নির্জীব চিন্তা। প্রত্যক্ষের সঙ্গে যোগ না রেখে যে-ব্যক্তি চিন্তা করে সে ক্রমেই বিচারশক্তি হারিয়ে ফেলে। জীবনধারণের সকল কার্য গৃহে আবদ্ধ আর মননক্রিয়া বিদ্যালয়ে সীমাবদ্ধ—এই অবস্থায় জীবনক্রিয়ার সঙ্গে মননক্রিয়ার যোগ স্থাপন সম্ভব হয় না। একদিকে গৃহের মধ্যে বিদ্যালয়কে আহ্বান করা ও অন্যদিকে বিদ্যালয়ের অভ্যন্তরে গৃহের পরিবেশ রচনা করার মধ্যেই এ অস্বাভাবিক অবস্থার প্রতিকার রয়েছে। আমাদের পরিবারের শিক্ষা এমন হোক যাতে গৃহে গৃহে কার্যদক্ষ বুদ্ধিমান প্রেমিক মানুষ গড়ে উঠতে পারে। আর শিক্ষা-ব্যবস্থাও এমন হোক যাতে বিদ্যালয়গুলি পারিবারিক পাঠশালাতে পরিণত হতে পারে। বুদ্ধিমান ও হৃদয়বান ব্যক্তি সম্বন্ধে আলোচনা

করা এ প্রবন্ধের বিষয় নয়, পারিবারিক বিদ্যালয় সম্বন্ধে কথঞ্চিৎ পথনির্দেশ করাই আমার উদ্দেশ্য। ছাত্রাবাস বা গুরুগৃহের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত শিক্ষাসৌধকেই আমি কৌটুম্বিক বা পারিবারিক পাঠশালা আখ্যা দিয়েছি। এই প্রকার পারিবারিক বিদ্যালয়ে জীবনের কার্যক্রম (পাঠ্যক্রমকে আলাদা রেখে) কিরূপ হওয়া উচিত সেই সম্বন্ধে এখানে কিছু আভাস দিতে চাই ঃ—

(১) ঈশ্বর-বিশ্বাস এ সংসারে একমাত্র সার বস্তু। এইজন্যেই প্রতিদিনের কর্মসূচীতে দুইবার উপাসনার বা প্রার্থনার ব্যবস্থা রাখতে হবে। সন্তবাণী উচ্চারণ করে ঈশ্বরস্মরণ দ্বারা প্রার্থনা হওয়া উচিত। উপাসনার মধ্যে কিছুক্ষণ নির্দিষ্ট শাস্ত্রবাক্য বা সন্তবাণী পাঠ করতে হবে। 'সর্বেষামবিরোধেন'—সকল ধর্মের পাঠ অবিরোধীভাবে করতে হবে। প্রার্থনার সময় হওয়া উচিত রাত্রে ঘুমোবার আগে আর প্রত্যূষে ঘুম থেকে উঠে।

(২) আহারশুদ্ধির সঙ্গে চিত্তশুদ্ধির নিকট সম্বন্ধ রয়েছে। কাজেই আহার সাত্ত্বিক হওয়া বাঞ্ছনীয়। গরম মসলা, লঙ্কা, ভাজা খাবার, চিনি প্রভৃতি অসাত্ত্বিক খাদ্যবস্তু ছাড়তে হবে। দুধ ও দুধের তৈরী খাবার পরিমিত খেতে হবে।

(৩) ব্রাহ্মণ কিম্বা অন্য পাচক দিয়ে রান্নার কাজ করানো ঠিক নয়। রান্নার কাজও শিক্ষার অঙ্গ। যাঁরা সার্বজনিক কাজ করবেন তাঁদের পক্ষে রান্নার কাজ শেখা বিশেষ প্রয়োজন। শান্তিরক্ষক (পুলিস), ব্রহ্মচারী ও প্রবাসী সকলেরই রান্নার কাজ জানা দরকার। স্বাবলম্বী হওয়ার এটি একটি উপায়।

(৪) পারিবারিক বিদ্যালয়গুলিতে নিজেদের শৌচাগার পরিষ্কার করার কাজ নিজেদের হাতে নিতে হবে। কেবলমাত্র স্পৃশ্যাস্পৃশ্য ভেদ না করলেই অস্পৃশ্যতা নিবারণের কাজ সম্পূর্ণ হয় না, সমাজের প্রয়োজনীয় কোন কাজকেই ঘৃণা না করা চাই। শৌচাগার পরিষ্কার করার কাজটি নীচজাতীয় লোকের কাজ—এই ভাব দূর করতে হবে। এছাড়া এ কাজের মধ্যে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা শিক্ষার যথার্থ ব্যবস্থা রয়েছে এবং কি করে সামূহিক ভাবে পরিচ্ছন্নতা রক্ষা করতে হবে সে-শিক্ষাও এতে রয়েছে।

(৫) তথাকথিত অস্পৃশ্যদের সঙ্গে বসে লেখাপড়া তো করতেই হবে, খাওয়ার সময়ও তাদের সঙ্গে এক পংক্তিতে বসে খেতে হবে। সেই সময় কেবল আহারশুদ্ধির নিয়ম পালন করলেই যথেষ্ট।

(৬) স্নানাদি প্রাতঃকৃত্য সকালের দিকে সমাধা করতে হবে। অসুস্থদের জন্যে অবশ্য এই নিয়ম শিথিল করা যেতে পারে। সাধারণত ঠাণ্ডা জলে স্নান করা উচিত।

(৭) প্রাতঃকৃত্যের মতো ঘুমোবার আগে সায়ংকৃত্যও সমাপন করা উচিত। ঘুমোবার আগে দেহশুদ্ধির প্রয়োজন আছে, তাছাড়া সায়ংকৃত্যের দ্বারা নিদ্রা গাঢ় হয় এবং ব্রহ্মচর্যরক্ষার সহায়তা হয়। আর খোলা হাওয়ায় পৃথকভাবে ঘুমোবার ব্যবস্থা করতে হবে।

(৮) পুঁথিগত বিদ্যাকে প্রকৃত শিক্ষায় পরিণত করবার জন্যে হাতের কাজের উপর বিশেষ জোর দিতে হবে। দৈনিক অন্তত তিন ঘণ্টা হাতের কাজের জন্যে দিতে হবে। এ না হলে অধ্যয়ন থেকে

তেজ ও শক্তিলাভ হয় না। 'কর্মাতিশেষেণ' অর্থাৎ কাজ করার পর উদ্বৃত্ত সময় 'বেদাধ্যয়ন' করাই শ্রুতির বিধান।

(৯) তিনঘণ্টা হাতের কাজ করলে এবং গৃহের কাজ ও ব্যক্তিগত কৃত্য নিজ হাতে সম্পাদন করলে যে-শারীরিক পরিশ্রম হয় তারপর দৈনিক দুইবার ব্যায়াম করার আর কোন প্রয়োজন থাকে না। তথাপি স্বীয়-স্বীয় প্রয়োজনানুযায়ী খোলা হাওয়ায় খেলা করা, বেড়ানো বা অন্য কোনো ব্যায়াম করা যেতে পারে।

(১০) সূতা কাটাকে সামাজিক কর্তব্য এবং প্রার্থনার মতোই নিত্যকর্মরূপে গণ্য করতে হবে। হাতের কাজে তিনঘণ্টা ছাড়াও অন্তত আরও আধ ঘণ্টা সূতাকাটার জন্যে রাখতে হবে। এই আধ ঘণ্টা তকলীতে সূতা কাটলেও নিজের প্রয়োজন মিটাবার মতো যথেষ্ট সূতা হবে। তাছাড়া ভ্রমণকালে কিম্বা প্রবাসে সূতাকাটার অভ্যাস অব্যাহত রাখতে হলে তকলী ব্যবহার করাই সুবিধাজনক। এইজন্যেই তকলীতে সূতাকাটাও শেখা চাই।

(১১) একমাত্র খাদিই পরিধান করতে হবে। অন্যান্য দ্রব্য-সামগ্রীও যথাসম্ভব স্বদেশী ব্যবহার করা দরকার।

(১২) রোগীর সেবা ব্যতীত আর কোন কাজেই রাতজাগা ঠিক নয়। অসুস্থ ব্যক্তির সেবাকাজের কথা স্বতন্ত্র; কিন্তু আমোদ-আহ্লাদের জন্যে এমনকি লেখাপড়ার জন্যেও রাতজাগা নিষিদ্ধ। নিদ্রার জন্যে আড়াই প্রহর রাখতে হবে।

(১৩) রাত্রিকালে ভোজন করা উচিত নয়। স্বাস্থ্য, কাজকর্মের সুবিধা এবং অহিংসার জন্যে এই নিয়মরক্ষার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

(১৪) বিদ্যালয়ের কর্তব্যকর্মে সদাজাগ্রত দৃষ্টি রেখে পরিবেশকে উত্তেজনাহীন রাখতে হবে।

প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অনুসারে পারিবারিক বিদ্যালয়ের জীবনক্রম সম্বন্ধে এই ১৪টি করণীয়ের তালিকা দেওয়া হল। এই প্রবন্ধে পুঁথিগত শিক্ষা ও কর্মমাধ্যমে শিক্ষার পাঠ্যতালিকা সম্বন্ধে বিশদ বিবরণ দেওয়া হয়নি। সেই সম্বন্ধে স্বতন্ত্রভাবে লেখাই ভাল।

-- ('মধুকর' থেকে)

পদ্ধতি-পঞ্চক

ঘড়া ও মাটি একই বস্তু, না দুইটি ভিন্ন বস্তু? যদি বলা যায় দুইটি ভিন্ন বস্তু, তাহলে বলব, 'আমার মাটি আমাকে দিন আর আপনার ঘড়া আপনি নিন।' পক্ষান্তরে ভিন্ন না বলে ঘড়া আর মাটি একই বস্তু বললে কথা ওঠে যে, মাটি তো বিস্তর পড়ে আছে, কিন্তু তাতে তো জল ভরা যায় না। মাটি আর ঘড়ার এই সম্বন্ধকে 'সমবায়' সম্বন্ধ বলা হয়। ওয়ার্ধা শিক্ষা-পদ্ধতির নাম আমি সমবায়-পদ্ধতি দিয়েছি, কারণ এই পদ্ধতিতে উপরোক্তভাবে উদ্যোগ (হাতের কাজ) ও লেখাপড়ার সমন্বয় করা হয়েছে।

ছোটদের সমগ্র শিক্ষাব্যবস্থা যে-কোনো একটি প্রয়োজনীয় হস্তশিল্পকে (মূল উদ্যোগ) কেন্দ্র করে করা যেতে পারে। কারণ এই পদ্ধতিতে শিক্ষা শিল্পদ্বারা প্রাণবান ও বেগবান হয় এবং শিল্প-

প্রণালী শিক্ষাদ্বারা উন্নত হয়। এরকম শিক্ষার নামই 'সমবায়পদ্ধতি' দেওয়া হয়েছে।

শিল্পশিক্ষার পদ্ধতি (ঔদ্যোগিক শিক্ষা) একটি ভিন্ন বস্তু। এতে শুধু শিল্পশিক্ষাই হয়। ঘড়া আর মাটির তুলনায় ঔদ্যোগিক শিক্ষা মাটির স্তূপ মাত্র। পক্ষান্তরে কেতাবী শিক্ষাও সমবায়-পদ্ধতি থেকে ভিন্ন। কেতাবী শিক্ষাদ্বারা শুধু বিষয়জ্ঞান হয়। ঔদ্যোগিক শিক্ষা যদি মাটির স্তূপ হয়, তবে কেতাবী শিক্ষা ঘড়ার ছবি মাত্র। ছবি দেখা যায় কিন্তু তাতে জল ভরা যায় না।

কেবল-পদ্ধতি

প্রচলিত শিক্ষা-পদ্ধতিতে মানুষের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, বৃত্তি প্রভৃতির মধ্যে শুধু বুদ্ধিবৃত্তির দিকে দৃষ্টি দেওয়া হয়েছে। তাতেও এই শিক্ষা বুদ্ধির বিকাশ সাধন না করে মানুষের মনোবিনোদনেরই (বুদ্ধি-বিলাস) চেষ্টা করে। যেহেতু এই পদ্ধতিতে কেবল বুদ্ধি-বিলাসের দিকেই মনোযোগ দেওয়া হয়েছে, অথবা খুব ভাল করে বললেও কেবল লেখাপড়ার দিকে দৃষ্টি দেওয়া হয়েছে, সেইজন্যে এই শিক্ষার নাম 'কেবল-পদ্ধতি' দিয়েছি। এর সমস্ত দোষ ছেড়ে দিয়ে শুধু শিক্ষাবিজ্ঞানের দিক থেকে বিবেচনা করলেও দেখা যাবে যে, এতে বাহ্যবস্তুর সঙ্গে যোগ না রেখেই বাহ্যবস্তুর জ্ঞান শিক্ষা দেওয়া হয়ে থাকে ; এই পদ্ধতির এই এক মহৎ দোষ। এইজন্যেই এই জ্ঞান ঠুকে-ঠুকে মাথায় ঢুকিয়ে দিতে হয়। ফলে তা ভাল করে মনে থাকে না এবং এই সব জ্ঞান জীবনের সঙ্গে যোগ হারিয়ে

ফেলে (সমরস হতে পারে না)'। তাছাড়া এই শিক্ষার দরুন বেকার সমস্যাও বেড়ে চলেছে।

পরিশেষ-পদ্ধতি

দ্বিতীয় পদ্ধতির নাম 'পরিশেষ-পদ্ধতি'। গ্রন্থের পরিশিষ্টের মতো শিক্ষার পরিশিষ্ট হিসাবে এই পদ্ধতিতে পরিশিষ্টরূপে কিছু শিল্পশিক্ষা জুড়ে দেওয়া হয়। তাতে লেখাপড়া শিক্ষার সঙ্গে শিল্পশিক্ষা যুক্ত হলেও শেষোক্ত শিক্ষার গুরুত্ব শরীরে লেজ জুড়ে দেওয়ার মতোই। এছাড়া এই পদ্ধতিতে ছেলেরা শিল্পকে মজার জিনিস, খেলা বা বাহুল্য মনে করে আয়ত্ত করে। লেখাপড়া শিক্ষার শ্রান্তি অপনোদনের জন্যে একে ব্যবহার করা হয়।

সমুচ্চয়-পদ্ধতি

তৃতীয় পদ্ধতির নাম 'সমুচ্চয় পদ্ধতি'। এই পদ্ধতিতে শিল্পশিক্ষা ও লেখাপড়া শিক্ষার উপরে সমান গুরুত্ব আরোপ করার চেষ্টা করা হয়। অর্থাৎ লেখাপড়া শিখবার জন্যে যত সময় দেওয়া হয়, শিল্পশিক্ষার জন্যেও ততটা সময়ই দেওয়া হয়ে থাকে। মাটির সঙ্গে জল মেশালেই ঘড়া তৈরী হয়ে যায় না, কুম্ভকার যখন দুটিকে মিলিয়ে সেই নরম মাটির তালের উপর আপন কলার প্রয়োগ করে তখনই ঘড়া তৈরী হয়। সমুচ্চয়-পদ্ধতিতে শিক্ষার্থী সন্তুষ্ট হতে পারে না। সে মনে করে, 'আমার লেখাপড়ার সময় বৃথাই শিল্পকার্যে ব্যয়িত হচ্ছে।' এই অবস্থায় শিক্ষার্থী কখনও নাচার হয়ে,

কখনও স্বার্থবশে আর কখনও বা শিক্ষা মনে করে শিল্পকার্যে রত হয়। যেহেতু এই পদ্ধতিতে শিল্পকার্যকে শিক্ষার অঙ্গরূপে গ্রহণ করা হয় না, এজন্যে শিল্পশিক্ষাকে উপজীবিকার উপায়রূপে মনে করা হয়। এইভাবে দেখলে শিল্পশিক্ষার গুরুত্ব লেখাপড়া থেকে কমই হয়ে যায়। তবু শিক্ষার্থী হাতের কাজ করে বটে, কিন্তু তৃপ্তি পায় না। তাছাড়া এ পদ্ধতিতে শিক্ষা ও শিল্পের যোগসাধন করা হয় না। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে—পড়ানো হচ্ছে হয়ত পক্ষী সম্বন্ধীয় ভূগোল বা আফ্রিকার ভূগোল আর হাতের কাজের বেলায় শিখছে কাঠের কাজ, যাতে কাঠ সম্বন্ধীয় ভূগোল জানা প্রয়োজন। এইজন্যেই দেখা যায় এই পদ্ধতিতে লেখা-পড়া আর হাতের কাজের অনুশীলন পরস্পরের পরিপূরক হয়ে ওঠে না।

সংযোজন-পদ্ধতি

উপরোক্ত তিনটি পদ্ধতি ছাড়া শিক্ষাবিজ্ঞানীরা আরেকটি পদ্ধতির কথা বলেন, সেই পদ্ধতির নাম 'সংযোজন-পদ্ধতি'। 'কর্মের মাধ্যমেই জ্ঞান লাভ হয়'—সমবায়-পদ্ধতির এই সূত্র সংযোজন-পদ্ধতিতে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে। কিন্তু এতে কর্মের স্থান গৌণ। এই পদ্ধতিতে কর্মের স্থান দেওয়া হয় শুধুমাত্র জ্ঞানলাভের সহায়ক ব্যবস্থারূপে কোনও বিষয়ের জ্ঞান দিতে হবে তো উপযুক্ত কোনো কাজ বেছে নেওয়া যাক, সেই কাজের সহায়তায় জ্ঞান দেওয়া যাক! ফলে এতে কৃত্রিমতা এসে পড়ে।

সমবায়-পদ্ধতি

সমবায়-পদ্ধতিতে এমন একটি প্রধান হাতের কাজকে শিক্ষার মাধ্যমরূপে গ্রহণ করা হয়, যে-কাজের প্রয়োগ সারা জীবনই চলে এবং যে-কাজে নানাদিকে দক্ষতা লাভ করতে হয়। এই পদ্ধতি শিক্ষার উপায়মাত্র নয়, পরন্তু একে শিক্ষার অবিচ্ছিন্ন অঙ্গরূপেই মনে করতে হবে। উপরোক্ত উদ্যোগের (শ্রমশিল্প) দ্বারা নিম্নলিখিত তিনটি উদ্দেশ্য পূর্ণ হয়ে থাকে ঃ—(১) শিক্ষার্থীর বিবিধশক্তির বিকাশ সাধন, (২) শিক্ষার্থীকে জীবনের জন্যে প্রয়োজনীয় বিবিধ জ্ঞানদান এবং (৩) শিক্ষার্থীকে জীবিকা অর্জনের উপযোগী এক সার্থক উপায়ে অভ্যস্ত করা। এই তিনটি উদ্দেশ্যই যে পূর্ণ হয়, তার একটি ছোট কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণ রয়েছে। তা হচ্ছে এই যে, প্রত্যেক শিক্ষার্থী হাতের কাজ থেকে নিজ শিক্ষার ব্যয় কিছুটা মিটিয়ে নিতে পারে। দেখা যাচ্ছে, সমবায়-পদ্ধতি অন্যান্য সমস্ত পদ্ধতি থেকে ভিন্ন এবং শিক্ষাসম্বন্ধীয় নানা অভিজ্ঞতার ফলে অবশেষে এই পদ্ধতি উদ্ভূত হয়েছে।

এই পদ্ধতি অবলম্বনে শিক্ষা দেওয়ার সময় যে প্রধান উদ্যোগ বেছে নেওয়া হবে, সেই উদ্যোগের ব্যাপক প্রয়োজনীয়তার ও বিবিধ অঙ্গ যুক্ত হওয়ার কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। দেশের বর্তমান অবস্থায় শতকরা ৮০টি বিদ্যালয়ে যে প্রধান উদ্যোগ গ্রহণ করা সম্ভব, আমার মতে, সেটি সূতাকাটা ছাড়া আর কিছু হতে পারে না। সাত বৎসর বয়স্ক শিক্ষার্থীর কথা মনে করেই আমি এই কথা বলছি।

—('মূল উদ্যোগ কাতাই' থেকে কিছু পরিবর্তিত)

আমাদের সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য

বুনিয়াদী বিদ্যালয়গুলিতে মুর্গীপালন (পোলট্রি) এবং মৎস্য-উৎপাদনই (ফিশারী) প্রধান উদ্যোগরূপে নির্বাচন করা যায় কি-না—এই প্রশ্ন আজ করা হচ্ছে। এইরূপ প্রশ্ন একমাত্র ভারতবর্ষেই ওঠা সম্ভব, পৃথিবীর আর কোন দেশে এজাতীয় প্রশ্ন ওঠে না। এতে ভারতবর্ষের দুর্ভাগ্য সূচিত হয় না বরং এর মধ্যে ভারতীয় সংস্কৃতির পরিচয় পাওয়া যায়।

যাঁরা অহিংসায় বিশ্বাসী, তাঁরা দুইভাবে এর বিচার করতে পারেন। অর্থাৎ, অহিংসায় বিশ্বাসীদের মধ্যে দুই জাতীয় মনোভাব হতে পারে ; তাঁরা ভিন্ন-ভিন্ন ভাবে এ সম্বন্ধে নিজেদের সিদ্ধান্ত ব্যক্ত করতে পারেন। একটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। কাকা সাহেবের (কাকা কালেলকার) ও আমার অহিংসার উপর সমান শ্রদ্ধা আছে এবং আমিষাহার যে নিষিদ্ধ ভোজন এ বিষয়েও আমরা সম্পূর্ণ একমত। কাকাসাহেব 'ফিশারী' সম্বন্ধে এক প্রবন্ধ লিখেছেন। এই প্রবন্ধে তিনি মন্তব্য করেছেন—'ফিশারীর কাজে শিক্ষাদানের আবশ্যক উপাদান যথেষ্ট রয়েছে, আর বেসিক ক্রাফট হিসাবে এ ভাল করেই চালানো যেতে পারে।' আমি একথা মানি যে, 'বেসিক ক্রাফট-এর জন্যে যে-দক্ষতার প্রয়োজন হয় সেই সবই এই কাজের মাধ্যমে অনুশীলন করা যায়। তাছাড়া অন্যান্য শ্রমশিল্পের মাধ্যমে যেমন তৎসম্পর্কিত নানাপ্রকার শিক্ষা দেওয়া যায়, তেমনি ফিশারীকেও মূল উদ্যোগ হিসাবে গ্রহণ করলে অনুরূপ শিক্ষাই দেওয়া যেতে

পারে। কেউ কেউ বলবেন, এখন যদিও মাছধরার কাজে নির্দয় না হলে চলে না, কিন্তু বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে মাছধরার কাজ চালালে যথাসম্ভব কম কষ্ট দিয়ে মাছ ধরা যেতে পারে। সুতরাং মাছধরার কাজ যদি ঠিকভাবে শেখানো হয়, তাহলে ক্ষতি কি ?

মাছ মারা কি মূল উদ্যোগ ?

মাছ ধরা সম্বন্ধে সব কথা যখন চিন্তা করি তখন এইকাজের মাধ্যমে ছোটদের বিদ্যাদানের জন্যে প্রস্তুত হতে মন সরে না। কেননা এই কাজ শেখাতে হলে প্রথম শেখাতে হবে কি করে বড়শী তৈরী করতে হয়, তারপর যে কোনো জাতীয় আমিষখাদ্য বড়শীতে লাগাতে শেখাতে হবে, যাতে মাছ খাদ্যে আকৃষ্ট হয়ে বড়শীর কাছে আসে। অর্থাৎ মাছকে কী করে ঠকানো যায়, সেকথা ছোটদের শেখাতে হবে। কারণ বড়শীতে খাবার লাগিয়ে জলে ফেলার অর্থ হচ্ছে, মাছকে বলা—আমি তোমাকে কিছু খাওয়াতে চাই। বেচারা খাওয়ার জন্যে যেই বড়শী গিলে ফেলবে, অমনি তাকে টান মেরে উপরে তুলে ফেলতে হবে। সমস্ত ব্যাপারটিতেই এত অসত্য ও হিংসা রয়েছে যে, আমার পক্ষে এইকাজ শেখানো সম্ভব নয়। আমি ছোটদের কি করে শেখাব যে, এইভাবে ফুসলানো ও ঠকানো মানবীয় সত্যের পরিপন্থী নয়। অর্থাৎ মানবীয় সত্য থেকে চিরন্তন সত্য পৃথক—এতে এরকম কথা আমাকে স্বীকার করে নিতে হবে। হিংসাকে কোনরকমে একবারের জন্যে মেনে নিতে পারলেও অসত্যকে স্বীকার করে নেওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব। একথা শুনে

কেউ হয়ত এমন পথ বাতলে দেবেন যাতে মাছকে ঠকাবার দরকার হবে না আর তাকে বেশী কষ্ট না দিয়েই হস্তগত করা যাবে। তা হলেও ছোটদের শিক্ষার ব্যাপারে এইজাতীয় ব্যবস্থা রাখা আমি উচিত বলে মনে করি না। এইসব প্রাণীদের মধ্যে চিত্তবৃত্তির অস্তিত্ব স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। মাছের জন্যে কোন খাদ্য জলে ফেলে দিলে ওরা তৎক্ষণাৎ নির্ভয়ে আমার কাছে ছুটে আসে আর সেই সময় যদি ভয় দেখানো হয় তো অমনি পালিয়ে যায়। এ থেকে বোঝা যায়, ওরা আমাদের প্রেমভাবও বুঝতে পারে, ক্রোধের ভাবও বুঝতে পারে। সুতরাং যাদের মধ্যে এইরকমের প্রেমাদি বৃত্তির স্পষ্ট অস্তিত্ব দেখতে পাচ্ছি, তাদের হত্যা করার কথা কি করে ছোটদের শেখানো যায় তা আমি বুঝতে পারি না।

এ তো গেল মাছধরার কথা। মুর্গীপালনের কাজে আমার তত আপত্তি নেই। কারণ মুর্গী না মেরেও মুর্গীপালনের কাজ লাভজনক করা যেতে পারে। সে-সম্বন্ধে এখানে বিশদ আলোচনার দরকার নেই। ফিশারী সম্বন্ধে যা মনে হয়েছে পোলট্রি সম্বন্ধে তেমন মনে হয়নি। অর্থাৎ উদ্যোগ নির্বাচন ব্যাপারে ফিশারীর সঙ্গে পোলট্রির পার্থক্য রয়েছে—এ কথাই আমার বক্তব্য।

অহিংসাধিষ্ঠিত মূল উদ্যোগ

'সমবায়' ব্যাপারটি কি—এ সম্বন্ধে একজন আমাকে প্রশ্ন করেছিলেন। আমি বলেছিলাম, 'সমবায়ের সহজ অর্থ তো জ্ঞান আর কর্মের সম্মিলন।' একথা শুনে তিনি বললেন, 'যদি তাই হয়,

তাহলে শিক্ষার্থীদের আণবিক বোমার কারখানার কাজেও লাগিয়ে দেওয়া যেতে পারে, সেখানে কাজও আছে আর কাজের মাধ্যমেই শিক্ষা দেওয়া যাবে। জ্ঞান আর কর্ম এই উভয়ের মধ্যে যোগের অভাব মিটিয়ে দিতে পারলেই তো সমবায়-পদ্ধতি এসে যাবে।' আমি বললাম, 'আপনার কথা স্বীকার করা যায় না। জ্ঞান আর কর্মের ঐক্যসাধনই সমবায়ের উদ্দেশ্য সন্দেহ নেই। কিন্তু আপনার কারখানা (কর্মক্ষেত্র) আণবিক বোমার কারখানা। আমি সেখানে ছোট ছেলেকে নিযুক্ত করতে পারি না, কারণ এদ্বারা সর্বোদয়ের উদ্দেশ্য ক্ষুণ্ণ হবে। এইজাতীয় উদ্যোগ নঈ তালীমে অচল।' একথা শুনে তিনি বললেন, 'তাহলে সমবায়ের সংজ্ঞা পরিবর্তন করুন। বলুন—সমবায়ে জ্ঞান ও কর্মের মধ্যে যে-অনৈক্য রয়েছে তা মিটে যাবে এবং উপায় ও উদ্দেশ্য দুইটিই শুদ্ধ হতে হবে।' আমি তখনই খুসী মনে তাঁর কথা মেনে নিলাম। জ্ঞান ও কর্মের সমন্বয়সাধনে উপায় ও উদ্দেশ্যের বিশুদ্ধতা সম্বন্ধে সদাজাগ্রত মনোভাব বজায় রাখতে হবে।

অনেকে প্রশ্ন করেন, 'তোমরা তো ছোট-ছোট হাতিয়ার ব্যবহার কর। এতে কত আর উৎপাদন হবে ?' আমি তাঁদের বলি, 'ভারতবর্ষের অবস্থা তো বিবেচনা করবে। এদেশের দারিদ্র্যের কথা ভুলো না। তারপরও যদি প্রশ্ন করতে চাও, করো। বর্তমানের সকল প্রচেষ্টা গরীবদের জন্যে। নিদারুণ দারিদ্র্য রয়েছে বলেই গ্রামবাসীরা লেখাপড়া শেখাবার জন্যে ছেলেদের আমাদের কাছে পাঠাতে পারে না। ছেলে যদি বাড়ীতে থাকে তাহলে বাড়ীর

কাজকর্মে সাহায্য করতে পারে। স্কুলে তো কিছু রোজগারের ব্যবস্থা নেই। এই অবস্থায় আমাদের এমন পদ্ধতি গ্রহণ করতে হবে, যাতে ছেলেরা বাড়ীর কাজকর্মে সাহায্য করার পরও স্কুলে পড়তে পারে।'

আমরা যদি মনে রাখি যে, আমাদের বিদ্যালয়গুলি গরীবদের সহায়তা দেবে, তাহলে স্কুলে ৫ ঘণ্টা না ৬ ঘণ্টা পড়ানো হবে, কিম্বা একবার পড়ানো হবে কি দুবার পড়ানো হবে—এই সব প্রশ্নের উত্তর আপনা থেকেই পাওয়া যাবে। যে-পদ্ধতিতে গরীবকে সহায়তা দেওয়া সম্ভব হবে, নঈ তালীমের পাঠশালাগুলিতে শুধু সেই পদ্ধতিই গ্রহণ করা হবে।

আর এই পদ্ধতির পাঠশালায় সফলতা হলে তবেই নঈ তালীমের পাঠশালা সর্বত্র প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হবে।

শিক্ষার ত্রিসূচী কার্যক্রম

অস্থায়ী আবাস—ধামার

২৮-৯-৫৫

(পত্রাংশ)

……নঈ তালীমের কার্যক্রমে কোন্ শিক্ষা দেওয়া হবে আর কোন্ শিক্ষা দেওয়া হবে না, এরকম কোন সুনির্দিষ্ট ভাগ নেই। এমনিতে সবরকম শিক্ষাই এর অন্তর্ভুক্ত হতে পারে, তবে তাদের

প্রত্যেকের মধ্যে একটি বিশেষ লক্ষণ থাকা চাই। আমরা দশ দিনের ক্ষুধা একদিনে মিটাই না, আজকের ক্ষুধা মিটাবার জন্যেই আহার গ্রহণ করে থাকি। জ্ঞান অর্জনের নিয়মও তাই। আজকে শিক্ষার্থী যে-জ্ঞানের প্রয়োজন অনুভব করছে সেইজ্ঞানই তাকে দিতে হবে। তা না হলে অনাবশ্যক জ্ঞান আহরিত হবে এবং শিক্ষার্থীর কাছে তা বোঝাস্বরূপ হয়ে পড়বে। এই অবস্থায় দুই রকম পরিণাম হতে পারে—এক, সে কাঁধ থেকে বোঝা ফেলে দিতে পারে ; দুই, কাঁধে বোঝা রাখার দরুন বুদ্ধিশক্তির উপর অতিরিক্ত চাপ পড়ে তার জীবনের বিকাশই কুণ্ঠিত হয়ে যেতে পারে।

নঈ তালীমের দৃষ্টিভঙ্গী

এই তালীমের নাম 'নঈ' দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এতে নূতন কিছু নেই। যাঁর উত্তম আত্মবিকাশ হয়েছে, তিনি জ্ঞান ও অজ্ঞান—এই উভয়ের প্রয়োজন জেনে, তাদের যথার্থভাবে স্বীয় জীবনে গ্রহণ করতে পেরেছেন এবং এইভাবেই তাঁর আত্মদর্শন হয়েছে। এই হল 'নঈ' তালীমের দৃষ্টিভঙ্গী।

শতকরা একশ ভাগ জ্ঞান

বর্তমানের নিয়ম অনুসারে পরীক্ষায় শতকরা ত্রিশ পেলেই পাশ করা যায়। এইনিয়ম কেন করা হয়েছে ? কারণ তো স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে। এই নিয়ম যাঁরা প্রণয়ন করেছেন তাঁরা জানেন যে, ছোট ছেলেদের উপর আবশ্যকের অতিরিক্ত জ্ঞানের ভার চাপিয়ে

দেওয়া হচ্ছে। এই অবস্থায় শতকরা একশ নম্বর তাদের কাছে আশা করা যায় না। কিন্তু 'নঈ তালীমে' প্রত্যেক শিক্ষার্থীই একশয় একশ নম্বর পাবে—এই আশা করা হয়।

শিক্ষার উপযুক্ত বিভাগ

ভূগোল, ইতিহাস, গণিত, জ্যামিতি প্রভৃতি বিষয় অনুসারে জ্ঞানের বিষয় ভাগ করলে অসংখ্য বিষয় নিতে হবে। এইভাবে শিক্ষণীয় বিষয়ের ভাগ কেন করা হয় বুঝতে পারি না। কেননা, ভাষার অনুশীলন, দেহের অনুশীলন, বুদ্ধির অনুশীলন, ইন্দ্রিয়সমূহের অনুশীলন—জ্ঞানানুশীলনের এইরকম বিভাগ হতে পারে।

প্রাচীনকালে শিক্ষার্থী পঞ্চভূতকে স্বীকার করতেন। আজ যে মৌলিক পদার্থের তত্ত্ব আমরা জেনেছি তাতে প্রাচীনকালের পঞ্চভূতের তত্ত্ব মিথ্যা হয়ে যায় নাই। দৃশ্য জগতের বিশ্লেষণ দ্বারা পঞ্চভূতের অস্তিত্ব প্রমাণিত হয় নাই, পরন্তু দর্শনের (উপলব্ধির) পার্থক্য থেকে এদের সৃষ্টি হয়েছে। যতদিন আমাদের পঞ্চেন্দ্রিয় আছে, ততদিন আমাদের উপলব্ধি (দর্শন) পঞ্চবিধই হবে। এই পঞ্চবিধ দর্শন থেকে সৃষ্টিতে চিরকাল পঞ্চভূতের অস্তিত্ব বর্তমান থাকবে। এথেকে আমাদের বুঝতে হবে যে, শিক্ষাদানের জন্যে নানা বিষয় বা নানাগ্রন্থ সাজিয়ে-গুছিয়ে নেওয়ার চেয়ে শিক্ষার্থীকে অর্থাৎ তার মন, বুদ্ধি প্রভৃতিকে সাজানো (শৃঙ্খলাযুক্ত করা) দরকার।

খাদ্য ও পানীয় গ্রহণ নিত্যপ্রয়োজনীয় ব্যাপার এবং শরীর অনেক সময় পীড়িতও হয়। তাই অল্পবয়স্ক শিক্ষার্থীদের জন্যে

খাদ্যপানীয় সম্পর্কিত এবং রোগ ও চিকিৎসা সম্পর্কিত জ্ঞানের যে প্রয়োজন আছে, সে-সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই।

নঈ তালীমের স্বাভাবিক বিষয়

নঈ তালীমের অঙ্গীভূত বিষয়গুলি স্বাভাবিকভাবে নির্বাচিত হয়। শিক্ষার্থী গো-সেবা করে, দুধ পান করে। অতএব গো-পালন বিদ্যা শিক্ষার ইচ্ছা ও প্রয়োজন—দুই-ই তার আছে। উত্তমরূপে ভাষা শিক্ষা তো করাই উচিত আর ব্যবহারিক গণিতের প্রয়োজনীয়তাও কেউ অস্বীকার করতে পারবে না। তাছাড়া একে অন্যের প্রতি কিরূপ আচরণ করবে, সে-শিক্ষা না হলে তো মানুষ পশুর সমান হয়ে থাকে। সুতরাং নীতি ও ধর্ম শিক্ষাকেও উপেক্ষা করা চলবে না। ইতিহাসের মধ্য দিয়ে তোমাদের ছাত্রদের কিশোর-লাল ভাইয়ের জীবনী জানতে হবে, সীজার বা কাইজারের জীবনী না জানলেও তাদের চলবে। গোপুরীর চামড়ার প্রতিষ্ঠান কি করে প্রতিষ্ঠিত হল, বাল্লুঞ্জকরজী কি পদ্ধতিতে মৃতপশুর চামড়া ছাড়াতে শেখান, ভাউ কি করে সাপ ধরবার কৌশল আয়ত্ত করলেন, কুষ্ঠরোগীদের সেবা করার ইচ্ছা মনোহরজীর মনে কি করে উদয় হল—এর প্রত্যেকটি সম্বন্ধে ওখানকার ছেলেদের জানতে হবে। অন্যকাল বা অন্যস্থান সম্বন্ধে নঈ তালীমের কোন সম্পর্ক নেই—উপরোক্ত উক্তি থেকে কেউ যেন একথা না বোঝেন। সবই নঈ তালীমের শিক্ষার অঙ্গীভূত হতে পারে, তবে আলোচ্য বিষয়ের সঙ্গে যখন শিক্ষার্থীর সম্বন্ধ হবে এবং যখন বিষয়টি শিক্ষার্থীর

প্রয়োজন হবে, কেবল তখনই তা 'নঈ তালীমের' বিষয় হতে পারবে।

নঈ তালিমের ত্রিবিধ জ্ঞান

দোলনা থেকে আরম্ভ করে শ্মশান পর্যন্ত সমস্তকিছু সম্বন্ধে শিক্ষা দিতে হবে—শিক্ষা এভাবে দেওয়া ঠিক নয়। বর্তমানের প্রয়োজন অনুযায়ী শিক্ষা দেওয়া, ভবিষ্যতে যেসব জ্ঞানের প্রয়োজন হবে সে-সমস্ত আয়ত্ত করবার মতো সামর্থ্য সঞ্চয় করা এবং অন্তর্নিহিত সহজাত জ্ঞানের স্ফুরণ করা—এই ত্রিবিধ কার্যক্রমই 'নঈ তালীমের' কার্যক্রম। (১) প্রকৃতজ্ঞান, (২) জ্ঞানশক্তি সম্পাদন এবং (৩) আত্মজ্ঞান—ত্রিবিধ কার্যক্রমের এইরূপ নামকরণ করা যেতে পারে। এই সমগ্র দৃষ্টিভঙ্গীটি সম্পূর্ণ নূতন। আজকের নীরস পদ্ধতির সঙ্গে এর মিল কী করে হবে? —('সেবক', জানুয়ারী ১৯৫৩)

তুলনা অসম্ভব

(এক পত্র থেকে)

এমন হতে হবে যে, ১৬-বছরের শিক্ষার্থীর সঙ্গে, অর্থাৎ নঈ তালীমের পাঠ্যক্রমানুযায়ী শিক্ষিত বালকের সঙ্গে সরকারী স্কুলে শিক্ষিত বালকের তুলনা করার আবশ্যকতাই থাকবে না। কারণ, ওদের শিক্ষা-যে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরণের মানুষ গড়ে তুলছে। যেখানে

আমার ছেলে অধ্যাত্মবিদ্যাসম্পন্ন হবে সেখানে স্কুলে-পড়া বালক তার নাম পর্যন্ত জানবে না। পূর্বোক্ত বালক কোন একটি শ্রমশিল্পে বা ব্যবসায়ে কুশল হবে আর শেষোক্ত বালক হবে সর্বতোভাবে নিরুদ্যোগী বা শ্রমবিমুখ। প্রথম বালক সর্বপ্রকার দক্ষতা লাভ করবে আর দ্বিতীয় বালক হবে সম্পূর্ণভাবে কর্মদক্ষতাশূন্য। প্রথম জনের সামনে উদ্যমপূর্ণ জীবনক্ষেত্র উন্মুক্ত থাকবে আর দ্বিতীয় জনের সামনে সব অন্ধকারপূর্ণ বলে মনে হবে। প্রথম জন সংশোধন করবে আর দ্বিতীয় জনকে সংশোধন করতে হবে।

পথনির্দেশ

(পত্র থেকে উদ্ধৃত)

গোসাইগঞ্জ
২৯-৪-৫২

খুব ছোট ছেলেদের একটিমাত্র বিষয় শিক্ষা দিলে কাজ হবে না, আবার তাদের কাঁধে অনেকগুলি বিষয়ের বোঝা চাপানোও নিরর্থক। ছোটদের শিক্ষার একটিমাত্র বিষয়—তা হচ্ছে জীবনকে বিকশিত করে তোলার শিক্ষা। জীবনের ত্রিবিধ বিকাশ হতে পারে—ভাষাজ্ঞানের বিকাশ, শারীরিক বিকাশ ও মানসিক বিকাশ।

১। ভাষা শিক্ষার জন্যে উত্তম ভজন, কবিতা প্রভৃতি মধুর স্বরে এবং শুদ্ধ উচ্চারণ করে পড়তে হবে এবং তার অর্থ হৃদয়ঙ্গম

করতে হবে। পাঠাভ্যাস, বাক্য-প্রকাশের অভ্যাস এবং প্রিয়, সংযত ও সত্যকথা বলবার অভ্যাস করতে হবে।

২। শরীরের উন্নতির জন্যে উন্মুক্ত স্থানে কোন একটি শ্রমসাধ্য কাজের দ্বারা জীবিকার্জন করতে হবে। তাছাড়া সব সময়ই কোন না কোন একটা কাজ করা দরকার। খেলাধূলা, পরিমিত আহার, সুপাচ্য খাদ্য, দিনচর্যা, ঋতুচর্যা, প্রাকৃতিক চিকিৎসা প্রভৃতি সম্বন্ধে জ্ঞান ও তদনুযায়ী আচরণ শরীর বিকাশের জন্যে প্রয়োজন।

৩। মানসিক বিকাশের জন্যে প্রয়োজন :—সকলের প্রতি কিরূপ আচরণ করতে হবে, সকলের প্রিয়পাত্র কি করে হওয়া যায়, ইন্দ্রিয় সংযম কি করে করা যায় এবং আত্মানাত্মবিবেক কি করে লাভ করা যায়—এসব জানা। মানসিক বিকাশের জন্যে এ সমস্তই জানতে হবে। তাছাড়া পারিপার্শ্বিক সমাজ ও জগত সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞানও প্রয়োজন।

সংক্ষেপে এই শিক্ষার স্বরূপ বর্ণনা করা হল। শিক্ষার্থী ও শিক্ষা যেন মিলিতভাবে জীবন যাপন করে, অর্থাৎ শিক্ষার্থী শিক্ষাহীন জীবন না কাটায়, আবার শিক্ষাও পুঁথিগত হয়ে না থাকে।

তিনটি প্রধান কথা

যেকোন একটি ভাষা ভাল করে শিখতে হবে, কাজ চালানোর মত অঙ্ক নির্ভুলভাবে জানতে হবে আর যেকোন একটি হাতের কাজে নিপুণ হতে হবে—এই তিনটি প্রধান শিক্ষা নিতান্ত প্রয়োজন।

সমবায় শিক্ষাপদ্ধতির জন্যে ব্যস্ত হওয়া নিষ্প্রয়োজন

উদ্যোগমূলক শিক্ষার অর্থ—হাতের কাজের সঙ্গে পড়াশুনার মিলন ঘটানো। এসম্বন্ধে চিন্তা করতে করতে অনেকে অস্থির হয়ে পড়েছেন। কিন্তু এসম্বন্ধে চিন্তা করা নিষ্প্রয়োজন। বুনাইয়ের সঙ্গে "জ্ঞানেশ্বরী" পুস্তকের কি সম্পর্ক—এজাতীয় বিতর্কে প্রবৃত্ত হওয়া ঠিক নয়। বহু পুস্তকের প্রয়োজন অবশ্য নেই, কিন্তু যে-পুস্তক সমস্ত সমাজের নির্ভরস্থল তার সঙ্গে উদ্যোগের (শ্রমশিল্প) কি সম্পর্ক থাকতে পারে—এপ্রশ্ন 'মায়ের সঙ্গে সন্তানের কি সম্পর্ক' এই প্রশ্নের মতই নিষ্প্রয়োজন।

জ্ঞান অপক্ক না থাকে সেদিকে দৃষ্টি দিতে হবে। মনে রাখতে হবে কর্মমূলক বা আচরণযুক্ত জ্ঞান অপক্ক থাকতেই পারে না।

শিক্ষকের আশ্রম

শিক্ষকের আশ্রম মানে বানপ্রস্থাশ্রম। যত শীঘ্র নানাস্থানে এরূপ গুরুগৃহাশ্রমকেন্দ্রিক বিদ্যালয় স্থাপিত হবে, অল্পবয়স্কদের শিক্ষা ততই যথার্থ ভিত্তির উপর সুপ্রতিষ্ঠিত হবে।

গুণবিকাশের নানা উপায়

১। অকারণে ভীত হবে না। ভয় পেলে ভগবানকে ডাকবে; তাঁর নামের সামনে কোন ভয়ই টিকে থাকতে পারে না।

২। প্রতিদিনের অন্যায় আচরণ আপন প্রয়াসে সেইদিনই শুধরে নেওয়া দরকার। সব সময় মনে রাখতে হবে, যেন গত কালের দোষ আজ আবার না হয় আর আগামী কাল যেন আজকের দোষের পুনরাবৃত্তি না হয়।

৩। কর্তব্যাকর্তব্যের সম্যক বিচার করতে হবে এবং এবিষয়ের সম্যক উপলব্ধির প্রয়োজন। কিন্তু কেবল কি কর্তব্য, কি অকর্তব্য বুঝলেই হবে না। যা করা উচিত বুঝব তাকে কাজে পরিণত করতে না পারা পর্যন্ত নিরস্ত হব না। এসম্বন্ধে দৃঢ়সংকল্পবদ্ধ হওয়া চাই।

৪। সর্বদা প্রয়োজন হলেই যথাশক্তি অপরের সহায়তা করবে। একথা কখনও ভুলবে না যে, আমরা প্রত্যেকেই এইরূপ বহু সহায়তা লাভ করেছি।

৫। সব কাজে সর্দারী করে এগিয়ে যেও না। নিজেই নিজেকে সংযত করে রাখবে।

৬। যেকোন একটি উৎপাদকশ্রম না করে খাদ্যগ্রহণ করবে না।

৭। প্রতিদিন কিছুসময় নিয়মিতভাবে অধ্যয়ন করবে।

৮। স্বহস্তে গুরুজনের সেবা করবে।

৯। সোজা হয়ে বসবে, অকপটভাবে কথা বলবে এবং চিন্তাতেও কোন অসরলতা রাখবে না।

১০। কারও সঙ্গে মারামারি করবে না। কারও মনে দুঃখ দেবে না।

১১। সত্য আচরণ করবে। সদা সত্য বলবে।

১২। কখনও ক্রোধান্বিত হবে না। ক্রোধান্বিত হওয়া দুর্বলতার লক্ষণ।

১৩। কোন ব্যাপারেই নিজের লাভের জন্যে ব্যস্ত হবে না। মনে রাখতে হবে যে, পারিপার্শ্বিক জগৎ আমার বাসনা পূর্ণ করবার উপকরণ নয় বরং জগতের সেবা করাই আমার জীবনের লক্ষ্য।

১৪। অব্যবস্থিতচিত্ত, স্বেচ্ছাচারী ও অস্থিরচিত্ত হবে না।

১৫। অন্যের দোষ না দেখে শুধু গুণগুলি গ্রহণ করবে।

১৬। অন্যের দুঃখে দুঃখী হবে এবং তার দুঃখ দূর করবার জন্যে ব্যাকুল হবে।

১৭। কোনপ্রকার সুস্বাদু খাদ্যে আসক্ত হবে না, ঔদরিকতা পরিহার করবে এবং স্বল্পে তৃপ্ত হবে।

১৮। উদ্ধত হবে না, পরস্পরের সঙ্গে সদ্ভাব রেখে বসবাস করবে। মৃদুভাষী হবে।

১৯। অসদাচরণে লজ্জিত হবে। ভব্যতার সীমা লঙ্ঘন করবে না।

২০। হস্ত, পদ, চক্ষু প্রভৃতি অবয়বগুলিকে বৃথা চালনা করবে না।

২১। কোনো ব্যক্তি বলপূর্বক দমন করার চেষ্টা করলে নতি স্বীকার করবে না।

২২। দুর্বল ব্যক্তির দোষত্রুটি ক্ষমা করবে।

২৩। শারীরিক কষ্টে ব্যাকুলতা প্রকাশ করবে না। ধৈর্যের সঙ্গে সহ্য করবে।

২৪। পরিষ্কারপরিচ্ছন্নতার প্রতি দৃষ্টি রাখবে।

২৫। কারও প্রতি ঈর্ষান্বিত হবে না। নিজের উন্নতির জন্যে অন্যের অনিষ্ট করবে না (নীচে নামিয়ে দেবে না)।

২৬। আমি বড়—একথা মনে করবে না। নিজেকে বড় না মনে করাই মহত্ত্বের লক্ষণ।

এসব দৈবী সম্পত্তির লক্ষণ। ছোটদের শিক্ষার জন্যে গীতা থেকে অতি সাধারণ এবং প্রাথমিকভাবে এখানে দেওয়া হল। এর ব্যাপক অর্থ 'জ্ঞানেশ্বরী'তে পাওয়া যাবে।

শিক্ষা ও শ্রমশিল্প

বিদ্যালয়ে গণিত, ইতিহাস, ভূগোল প্রভৃতির শিক্ষা বর্তমানে যেভাবে দেওয়া হয়, সেভাবে না দিয়ে, শ্রমশিল্পসমূহের শিক্ষার সঙ্গে যাতে ঐসকল বিষয়ের শিক্ষা যুক্ত করা যেতে পারে সেইভাবে শিক্ষাপদ্ধতি পরিবর্তনের প্রস্তাব আমরা করেছি। জীবনক্ষেত্রে গণিত প্রভৃতির যে প্রয়োজন আছে এ সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই। আর শ্রমশিল্পের প্রয়োজনীয়তা তো স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে। কিন্তু কেবল আবশ্যকতা অনুধাবন করলেই আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে না। আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে শিক্ষাদ্বারা বিবিধ গুণের বিকাশ সাধন করা। এরজন্যে বিবিধ বিষয়ের শিক্ষার সঙ্গে শ্রমশিল্পশিক্ষাকেও যুক্ত করতে হবে।

গুণবিকাশ

বিদ্যালয়ের বিভিন্ন শ্রেণীতে যে সময়-পত্রক (টাইম-টেবল)

অনুসারে অধ্যাপনা করা হয় সেটা হয় বিভিন্ন বিষয়ের শিক্ষাদানের ভিত্তিতে। কিন্তু এভাবে সময়-পত্রক রচনা করা ভুল। কারণ শ্রমশিল্প ব্যতীত গুণসমূহের বিকাশসাধন সম্ভব নয় আর গুণগুলি কতটা বিকশিত হল সেকথা বোঝাও সম্ভব নয়। এইজন্মে শ্রমশিল্পের শিক্ষাদান আবশ্যক। এদ্বারা শিক্ষার্থীর স্বাবলম্বনের গুণ বিকশিত হবে। তাছাড়া যদি কোনো সত্যগ্রহণ সম্বন্ধে যথাযথ যুক্তি উপস্থিত করতে না পারি তাহলে সে সত্যপালন করাও সম্ভব হয়ে ওঠে না। এই কারণে ভাষাশিক্ষাও গুণবিকাশের অন্তর্গত হয়ে পড়ছে। অবশ্য শিক্ষা এক অখণ্ড বস্তু, সেজন্মে তা পৃথকভাবে বিচার করা চলে না।

—('সেবক', আগস্ট ১৯৫৩)

শিক্ষকাশ্রম

(বুদ্ধগয়াতে কর্মীদের কাছে এই ভাষণ দেওয়া হয়েছিল)

বুনিয়াদী শিক্ষা শ্রমশিল্পের (উদ্যোগের) মাধ্যমে দেওয়া উচিত—এই জাতীয় আলোচনা অনেক হচ্ছে, জোরের সঙ্গেই হচ্ছে। কিন্তু চতুর্বিধ আশ্রমের মধ্যে শিক্ষকতার অবস্থায় কোন আশ্রমের অন্তর্গত হয়ে শিক্ষকেরা থাকবেন, এসম্বন্ধে কেউ চিন্তা করেছেন কিম্বা চিন্তা করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছেন, এমন কথা আজ পর্যন্ত শুনি নাই।

শিক্ষক ও গৃহস্থ

এখন তো কোন ম্যাট্রিক ফেল করা ছেলেকে বুনিয়াদী শিক্ষায় শিক্ষিত করে নেওয়া হয়, তারপর সে বুনিয়াদী শিক্ষক হয়ে কাজ আরম্ভ করে দেয়। সঙ্গে-সঙ্গে সে গার্হস্থ্যজীবনেও প্রবেশ করে এবং গৃহস্থের জীবন যাপন করতে থাকে। এই দুটি কর্তব্য অত্যন্ত দায়িত্বপূর্ণ, ব্যাপক এবং একইধরণের। এখন আমাদের ভেবে দেখতে হবে যে, কর্তব্য দুটি একধরণের বলেই কি তা একসঙ্গে সম্পন্ন করা সম্ভব, না একসঙ্গে পালন করতে হলে প্রত্যেকটিকেই কিছু-কিছু খর্ব করা দরকার। সে যাহোক, এই বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ—এসম্বন্ধে আমাদের ভেবে দেখতে হবে।

বানপ্রস্থাবলম্বীই শিক্ষক

আমি বহু বৎসরের চিন্তার ফলে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে, শিক্ষকাশ্রম বানপ্রস্থাশ্রম ব্যতীত আর কিছু নয়। যিনি সন্ন্যাসাশ্রমে প্রবেশ করেছেন তাঁর পক্ষে শিক্ষক হওয়া সম্ভব নয়, কেননা সমস্ত জগতের জন্যে তিনি আত্মোৎসর্গ করেছেন, তাঁর সর্বত্র অবাধ গতি। সুতরাং কেবলমাত্র শিক্ষার্থীদের কাজে তাঁর কর্তব্য সীমাবদ্ধ হতে পারে না। আর শিক্ষার্থীরা নিজেরাই ব্রহ্মচর্যাশ্রমের অন্তর্ভুক্ত, সুতরাং উক্ত আশ্রমকেও শিক্ষকদের আশ্রম বলা যায় না। বাকী থাকে দুটি আশ্রম, গার্হস্থ্য ও বানপ্রস্থ। আমরা যদি মনে করি শিক্ষকেরা এই দুটি আশ্রমেরই অন্তর্গত, তাহলে বুঝতে হবে এসম্বন্ধে আমাদের ধারণা স্পষ্ট হয় নাই।

গৃহস্থাশ্রম অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের আশ্রয়। বানপ্রস্থে প্রবেশ করতে হলে গৃহস্থাশ্রম ত্যাগ করতে হয়। কিন্তু যে-বয়সে শরীর, মন, বুদ্ধি ও বাক্য জীর্ণতাপ্রাপ্ত হয় সেই বয়সে বানপ্রস্থে প্রবেশ করা ঠিক নয়। যখন স্পষ্ট হবে যে, জীবনের অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের কাল অতীত হয়েছে, অভিজ্ঞতার্জন সম্পূর্ণ হয়েছে এবং সেই অভিজ্ঞতা অন্যকে দেবার যোগ্য হয়েছে বরং তখনই বানপ্রস্থাশ্রমে প্রবেশ করা উচিত। বিষয়-বাসনা যাঁর সংযত হয়েছে এবং শরীর, মন, বুদ্ধি প্রভৃতি যাঁর কার্যক্ষম আছে, এমন-যে বানপ্রস্থাবলম্বী পুরুষ তিনিই শিক্ষক হওয়ার যোগ্য। আর তিনি প্রচারকও হতে পারেন।

আমরা যদি স্বীকারও করি যে, গৃহস্থব্যক্তি গৃহধর্ম পালনের সঙ্গে-সঙ্গে শিক্ষকতার কাজও কিছু-কিছু করতে পারেন, তাহলে বলব যে, গৃহস্থ নিশ্চয়ই শিক্ষা দিতে পারেন, কিন্তু সে-শিক্ষা গৃহেই দেওয়া উচিত এবং প্রত্যেক মাতাপিতা তা কিছু সন্তানদের দিয়েও থাকেন। প্রচলিত সমাজব্যবস্থায় যদি গৃহ-শিক্ষার উন্নতি করতে হয়, তাহলে এমন একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে, যাতে প্রত্যেক মায়ের কাছে আপন-আপন সন্তানদের রেখে শিক্ষা দেওয়ার বদলে ৪০।৫০ জন মাতার শিশুসন্তানদের কোন একজন মায়ের কাছে রেখে বাকী মায়েরা অন্য কাজে যেতে পারেন। কিন্তু এইরূপ শিক্ষাব্যবস্থা দিয়ে সমাজের রূপ বদলানো যাবে না। এতে প্রচলিত সমাজব্যবস্থাকে উপরোক্ত শিক্ষাব্যবস্থাদ্বারা কিঞ্চিৎ উন্নত করা যাবে মাত্র। আমি এ শিক্ষাব্যবস্থাকে 'নঈ তালীম' বলব না। এ-যে সেই পুরাতন শিক্ষাব্যবস্থাই—এসম্বন্ধে সন্দেহ নেই।

নঈ-তালীমের অর্থ

আমি অনুভব করি যে, 'নঈ-তালীম' নব-সমাজ রচনা করবে। আর একথাও বুঝতে হবে যে, নব-সমাজ রচনা নিত্য নব-নব বিকাশের পথে অগ্রসর হবে। নতুন সমাজ রচনার পর সমাজে আর নতুন কিছু হতে বাকী থাকবে না—এমন নয়। যে-সমাজ একবার গঠিত হয়ে যায়, তা তো তখন পুরানো হয়ে যায়। সুতরাং আবার নতুন সমাজ রচনার কাজ অবশিষ্ট থাকে। নঈ-তালীম হচ্ছে সেই শিক্ষা ব্যবস্থা, যা নিত্যনতুন সমাজ রচনা করতে থাকবে। এই শিক্ষাদানকার্য এমন অভিজ্ঞ লোকের হাতে থাকা চাই, যাঁর ব্যক্তিগত জীবন শুদ্ধ হয়ে গেছে এবং যিনি অন্যকে অভিজ্ঞতাদান করতে সক্ষম। আর তিনিই বিপ্লবের পতাকা বহন করবার যোগ্য।

বানপ্রস্থাবলম্বনকারী ব্যক্তি

নেপোলিয়নের মতো যিনি বীরপুরুষ, তিনি সকলের কাছে আপন বীরত্বকাহিনী বর্ণনাচ্ছলে স্বীয় অভিজ্ঞতাই ব্যক্ত করবেন। যাঁর যুদ্ধ সম্পর্কে কোন অভিজ্ঞতা নেই, তিনি কি করে অন্যকে পরাক্রমশালী করে গড়ে তুলবেন? যে-ব্যবসায়ী সততার সঙ্গে কোটি-কোটি টাকার ব্যবসা করেছেন, তিনি যদি শিক্ষক হন তাহলে ছাত্রেরা তাঁর কাছ থেকে ব্যবসা সম্বন্ধে অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানলাভ করতে পারে। যিনি নিজে কখনও হাতে-কলমে ব্যবসা করেন নি, শুধু কমার্সিয়াল কলেজে পড়ে পাশ করেছেন, তিনি কি আর ব্যবসা শেখাতে পারবেন? বিভিন্ন কার্যক্ষেত্রে যাঁরা অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন, তাঁরা স্বীয়-স্বীয় বিভাগে ছাত্রদের শিক্ষা দেবার অধিকারও লাভ করেছেন।

এইজন্যেই আমি বলেছি যে, শিক্ষকতার কাজ বানপ্রস্থাবলম্বনকারীদের হাতে থাকা উচিত। সুতরাং আমাদের ইচ্ছানুরূপ 'নঈ-তালীম' তখনই প্রতিষ্ঠিত হবে, যখন বানপ্রস্থাশ্রম স্থাপন করার সাহস ও বুদ্ধি আমাদের হবে। অন্যথায় নঈ-তালীম স্থাপনের আশা আমি করি না।

নঈ-তালীমের উদ্দেশ্য

প্রধান প্রশ্ন হচ্ছে—ছাত্রদের জ্ঞান কোনদিকে প্রয়োগ করতে হবে? বর্তমান সমাজব্যবস্থা বজায় রেখে কি একে সুখী সমাজে পরিণত করতে হবে? না, নতুন সমাজ গড়ে তুলতে হবে? বর্তমান সমাজকে সন্তোষে প্রতিষ্ঠিত করতে যদি চাই, তাহলে বানপ্রস্থাশ্রমের যে নিতান্ত প্রয়োজনীয়তার কথা আমি উল্লেখ করেছি, ততটা প্রয়োজনীয়তা কেউ অনুভব করবেন না। কিন্তু নব-সমাজ নির্মাণ করতে হলে এমন শিক্ষকদের হাতে শিক্ষার ভার রাখতে হবে যাঁরা ভিন্ন-ভিন্ন ক্ষেত্রে শক্তির পরিচয় দিয়েছেন, যাঁরা অভিজ্ঞতার দ্বারা যোগ্যতা অর্জন করেছেন, যাঁদের বিষয়বাসনা পরিশুদ্ধ হয়েছে ও সংকীর্ণতার গণ্ডী মুক্ত হয়েছে এবং যাঁদের মন, বুদ্ধি ও শরীরের শক্তি ক্ষীণ হয় নি বরং অধিক প্রখর ও প্রবল হয়েছে। এইসব শিক্ষকদের আশ্রমই বানপ্রস্থাশ্রম নামের যোগ্য।

প্রত্যেক ব্যক্তিই শিক্ষক হউন

'নঈ-তালীমে'র আলোচনা প্রসঙ্গে রাজাজী বলেছিলেন, "এই নঈ-তালীম এমন এক বিশেষ শিক্ষার ব্যবস্থা, যার জন্যে হাতে-

কলমে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন এরকম একদল শিক্ষকের প্রয়োজন হবে।” মাদ্রাজে ‘নঈ-তালীম’ স্থাপনা কেন হচ্ছে না জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বলেছিলেন, “আমি রাজ্যচালনার দায়িত্ব থেকে যদি মুক্ত হতে পারি, তাহলে নঈ-তালীমের শিক্ষক হব।”

রাজাজী ঠিকই বলেছেন। প্রত্যেক মানুষের জীবনে শিক্ষক হওয়ার সময় আসা চাই। জওহরলাল নেহরুর জীবনে এমন সময় আসা উচিত যখন তিনি ‘নঈ-তালীমে’র শিক্ষক হতে পারবেন। ডাঃ রাধাকৃষ্ণনের জীবনে, ঘনশ্যাম দাস বিড়লার জীবনেও এমন সময় আসা উচিত যখন তাঁরা নঈ-তালীমের শিক্ষকতা করবার যোগ্য হবেন। আপনারা যদি এইরূপ ব্যবস্থা ক্রমান্বয়ে করতে থাকেন, তাহলে সেই আয়োজন নবজীবনদায়ী হবে।

গুণবিকাশই শিক্ষা

নতুন ও পুরানো শিক্ষাপদ্ধতি

বলা হয়ে থাকে যে, পুরানো শিক্ষাপদ্ধতি হল জ্ঞানপ্রধান আর আমাদের নঈ-তালীম হল কর্মপ্রধান। কিন্তু এরকম শ্রেণীবিভাগ করা ভুল। নতুন শিক্ষাপদ্ধতিকে কর্মপ্রধান বলাও ভুল। আবার কেউ-কেউ বলবেন যে, পুরানো শিক্ষাপদ্ধতি পুস্তকপ্রধান আর নঈ-তালীম শ্রমশিল্পপ্রধান। এই ব্যাখ্যাও সম্পূর্ণ নয়। শ্রমমূলক কাজ করবার উপযুক্ত লোক তৈরী করা অথবা শিক্ষিত কারিগর

তৈরী করা—এর কোনটাই আমাদের লক্ষ্য নয়। আমাদের উদ্দেশ্য-মানুষের পূর্ণ বিকাশ। এই প্রচেষ্টায় অংশ গ্রহণকারী শিক্ষক ও ছাত্র উভয়েরই পূর্ণবিকাশ হওয়া চাই। তাঁরা যদি 'কেবল জ্ঞানে'র বা 'কেবল কর্মকুশলতা'র, কিম্বা দুইটিরই অধিকারী হন, তবুও সেই শিক্ষা একপেশে শিক্ষা হবে। কেননা, বিবিধ গুণাবলীর মধ্যে কেবলমাত্র জ্ঞানশক্তি ও কর্মশক্তি—এই দুই শক্তির বিকাশ হলেই পূর্ণ বিকাশের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে না।

অন্তরের বিকাশ

অনেকে বলেন যে, আমরা নঈ-তালীম পদ্ধতিতে ছোট ছেলে-মেয়েদের সূতাকাটা শেখানোর মাধ্যমে জ্ঞানদান করি। কিন্তু আমাদের কাজ এতেই শেষ হয়ে যায় না। আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে যে, এই শিক্ষার ফলে তাদের আন্তরিক বিকাশ হয়েছে কি-না, তাদের আলস্য দূর হয়েছে কি-না, তারা পরীশ্রমী হয়েছে কি-না, তারা সর্বপ্রকারের ভয় বর্জন করতে পেরেছে কি-না। তারা সত্যবাদী, সংযমী আর সেবাপরায়ণ হয়েছে কি-না। এ সমস্তই নঈ-তালীম পদ্ধতির মধ্যে রয়েছে।

বিদ্যালয়ে পরীক্ষার নিয়ম

পুরানো শিক্ষাপদ্ধতিতে পরীক্ষা নেবার যেসব ব্যবস্থা রয়েছে তা অন্যায় আর নোংরামিতে ভরা। পরীক্ষার সময় ছাত্রদের পাহারা দেবার জন্যে নিরীক্ষক (গার্ড) নিযুক্ত করা হয়, যাতে তারা একে

অন্যের কাছ থেকে চুরি করে কিছু নকল না করতে পারে। এ খুবই দুঃখের বিষয় যে, প্রথম থেকেই ধারণা করে নেওয়া হয়, ছাত্রেরা চুরি করবে। যে-ছাত্রের এইরকম নৈতিক অবনতি হয়েছে, সে ত পরীক্ষা দেওয়ার আগেই ফেল করে বসে আছে। পরীক্ষা নিয়ে তার আর যোগ্যতা বিচারের প্রয়োজন কি ?

জাগরণ আবশ্যক

প্রথম থেকে সাবধানতা অবলম্বন না করলে, বিবিধ গুণাবলী বিকাশের দিকে দৃষ্টি না দেওয়ার যে-দোষ পুরানো শিক্ষাপদ্ধতিতে রয়েছে, সেই দোষ নঈ-তালীমেও এসে যাওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেবে। শিক্ষার্থী প্রতিদিন নির্দিষ্ট পরিমাণ সূতা কাটছে কি-না কেবল তা দেখলেই চলবে না, তার আত্মশক্তির বিকাশ হচ্ছে কি-না তা-ও দেখতে হবে।

বিনয়ের দ্বারা বিকাশ

সংস্কৃতে শিক্ষার অপর নাম বিনয়। কারণ বিনয় সকল গুণের বিকাশের সহায়ক। বিনয়ের দরজা দিয়েই অন্যান্য গুণ আমাদের মধ্যে প্রবেশ করে। বিনীত, নম্র, বিনয়শীল ব্যক্তি যেখানেই যে-কোন জ্ঞানের, গুণের, সদ্‌বাক্যের সন্ধান পাবেন, তৎক্ষণাৎ তা আত্মসাৎ করে নেবেন। বিনয়ের মুখ্য লক্ষণই হল গুণগ্রহিতা। তাই আমাদের পূর্বপুরুষেরা বিনীত হবার গুরুত্বের দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

আমার প্রকৃত স্বরূপ

আমি দেহ নই, আমি দেহ থেকে ভিন্ন। আমার আত্মস্বরূপ সুন্দর ও পবিত্র। এ কখনও অশুদ্ধ হয় না। দেহই সকল পাপ কাজ করে। আমার শরীর মলিন হয়, কিন্তু আমি মলিন হই না। দেহ থেকে আত্মা পৃথক—এই বোধের নামই শিক্ষা। যে-শিক্ষা-ব্যবস্থায় এই বোধ জন্মে না, তা শিক্ষাব্যবস্থা নামের যোগ্য নয়। আর যে-সংস্থা ঐ শিক্ষা দেয় সেটিও শিক্ষায়তন নামের অযোগ্য।

ছোট ছেলেরা অপরিচ্ছন্ন হলে তাদের এরকম বলব না, 'তোরা ময়লা হয়েছিস্।' আমি তাদের বলব, 'তোরা তো আত্মস্বরূপ, নির্মল। তবে তোদের শরীরে কিছু ময়লা লেগেছে, তোরা তা পরিষ্কার করে ফেল।'

মনের সংস্কার

মনকে ঘড়ির মতো করে তৈরী করতে হবে, যাতে মাঝে-মাঝে হাতে নিয়ে দেখতে পারি ঠিক চলছে কিনা। আর কখনও যদি দেখি ঠিক চলছে না, তাহলে যাতে সুধরে নেওয়া যায় সেই উপায়ও জেনে নিতে হবে। আমার আত্মা কখনও বিকৃত হয় না, কখনও মলিন হয় না। আমি (আত্মা) এই বিকারশীল এবং মলিন শরীরকে বিকাররহিত ও মালিন্যমুক্ত করতে পারি। আমার-যে এইশক্তি রয়েছে সে-সম্বন্ধে আমি যখন স্থির নিশ্চয় হব, তখনই আমার প্রকৃত জ্ঞানদৃষ্টি লাভ হবে।—('সিংহাবলোকন' থেকে)

জ্ঞানের তাৎপর্য

একটু আগে আশাদেবী বলেছেন, বিনোবা একজন শিক্ষক। তিনি মিথ্যা বলেন নি। তবে আমি যে একজন শিক্ষার্থী, একথা বললে বেশী ভাল হত। আমার কারাগারের সঙ্গীরা আমি-যে একজন বিদ্যার্থী সেই সাক্ষ্য দেবেন। আমার মতে অধ্যয়নে প্রবৃত্ত করাবার জন্যে অন্তরপ্রেরণা ছাড়া অন্যকোন বাইরের প্রেরণার প্রয়োজন নেই। আমি জীবনের অধিকাংশ সময় হাতে-কলমে কাজ করে কাটিয়েছি। সেইজন্যেই অনুভব করি যে, আমার মন, বুদ্ধি নিরন্তর সতেজ রয়েছে।

বুদ্ধিকে সতেজ রাখার উপায়

আমার মতে উন্মুক্ত স্থানে যেকোন শরীরশ্রমমূলক কাজ করাই বুদ্ধিকে সতেজ রাখার মুখ্য উপায়। গ্রীষ্মের প্রচণ্ড তাপে তপ্ত হয়ে যেমন ভূমি বর্ষার জলধারা গ্রহণ করার জন্যে প্রস্তুত হয়, তেমনি আমাদের মন শ্রমের তাপে তপ্ত হয়ে জ্ঞানবারি পান করার জন্যে সদা তৃষিত হয়ে থাকে। শরীরশ্রমের দ্বারা তপ্ত হয়ে আমাদের মন জ্ঞান গ্রহণে উৎসুক হয় এবং জ্ঞানলাভের পর সেই জ্ঞানকে কার্যে পরিণত করতে সক্ষম হয়, জ্ঞানকে ফলবান করে তোলে। ছাত্রদের মনে জ্ঞান প্রবেশ করিয়ে দেওয়া আমাদের কাজ নয়। আমাদের কাজ হচ্ছে তাদের মধ্যে জ্ঞান পিপাসার উদ্রেক করা। অর্থাৎ জ্ঞানলাভ করার শক্তি উৎপন্ন করাই আমাদের কাজ।

ছাত্র নিজেই শেখে। উপনিষদে বর্ণনা আছে যে, গুরু একেকজন শিষ্যকে কয়েকটি গাভীর ভার দিয়ে দিতেন আর ঐ সকল গাভী চরাতে-চরাতে শিষ্যেরা শিক্ষাপ্রাপ্ত হতেন। কখনও ষাঁড়ের কাছে, কখনও পাখীর কাছে, কখনও গাছের কাছে শিষ্যেরা জ্ঞান লাভ করতে থাকতেন। আর ক্রমেই তাঁদের চেহারা সতেজ হয়ে উঠত। এই সতেজ ভাব দেখে গুরু শিষ্যকে বলতেন, 'বৎস, তোমার সতেজ মূর্তি দেখে মনে হচ্ছে তুমি জ্ঞানপ্রাপ্ত হয়েছ।' শিষ্য উত্তর করতেন, 'গুরুদেবের মুখনিঃসৃত উপদেশ ব্যতীত জ্ঞান কি করে লাভ করব?' গুরু তখন বলতেন, 'তুমি যথার্থ জ্ঞানলাভ করেছ, তোমার বিদ্যা নিখাদ হয়েছে। এখন কেবল গুরুর ছাপ (মোহর) লাগা বাকী। তারপরই গুরু গৃহে বাস সমাপ্ত হবে।'

চেহারাতেই শিক্ষার ঔজ্জ্বল্য

গুরু ও শিষ্য পরস্পরের আচরণের দ্বারা শিক্ষা লাভ করেন। দুই জনেই শিক্ষার্থী। যা দেওয়া যায় না, তাকেই শিক্ষা বলে। আর যা দেওয়া যায়, যার হিসাব রাখা যায়, অথবা যার সম্বন্ধে কিছু লেখা যায়, তাকে শিক্ষা বলা যায় না। শিক্ষার বর্ণনা চলে না। জীবনটাই শিক্ষা। কেলরীর (calorie=খাদ্য থেকে অর্জিত কর্মশক্তির পরিমাপ) যথার্থ হিসাব কাগজে কষলে কি লাভ? খাদ্য থেকে কত কেলরী উৎপাদিত হল তাতো চেহারা দেখলে বোঝা যাবে। যে-পরিমাণ শিক্ষা উপলব্ধিতে লব্ধ হয়েছে, আত্মসাৎ করা হয়েছে, জীর্ণ হয়েছে এবং অবশেষে সত্ত্বার সঙ্গে একাকার হয়ে মিশে গেছে, সেই পরিমাণ শিক্ষাই সত্য-সত্য লাভ হয়েছে।

পরীক্ষা না জোলাপ

যে-বিষয়ে পরীক্ষা দিতে হয়, সে-বিষয়ে বিশেষ কিছু জ্ঞান হয় না। যে-বিষয়ে পরীক্ষা দিতে হয় নি, সেই বিষয়ে আমার জ্ঞান ভাল রয়েছে। তাই আমার মতে পরীক্ষার কোন মূল্য নেই। কোষ্ঠ পরিষ্কার করার জন্যে যেমন জোলাপ, পরীক্ষাও ঠিক তেমনি। পরীক্ষা দেওয়া মাত্র সমস্ত জ্ঞান নিঃশেষে বেরিয়ে যায়। কাজেই পুরানো শিক্ষাবিদদের প্রবর্তিত এই কৃত্রিম ও মিথ্যা ব্যবস্থাকে গ্রহণ করার কোন প্রয়োজন নেই।

বিস্মরণের মহিমা

উপনিষদে জ্ঞানের সঙ্গে-সঙ্গে অজ্ঞানের মহিমাও গীত হয়েছে। জ্ঞান ও অজ্ঞান দুইই মানুষের দরকার। কেবল জ্ঞান বা কেবল অজ্ঞান অন্ধকারের মধ্যে নিয়ে যায়। জ্ঞান ও অজ্ঞানেব যথোপযুক্ত মিলনের মধ্যেই অমৃতত্ত্ব নিহিত রয়েছে। সংসারে নানাবিষয়ে এত বিচিত্র জ্ঞান রয়েছে যে, তার শেষ নেই। কিন্তু সমস্ত জ্ঞানই যদি সকলের মাথায় ঠুসে-ঠুসে ঢোকানো হয়, তাহলে মানুষ পাগল হয়ে যাবে। তাই স্মরণের সঙ্গে-সঙ্গে বিস্মরণের এত দরকার। ছাত্রেরা কণ্ঠস্থ করা কথা যথাযথ আবৃত্তি করে শোনালে আমার ভাল লাগে না। আমি তাদের গ্রামোফোনের সঙ্গে তুলনা করি। যথাযথ আবৃত্তি করা তো যন্ত্রের কাজ। তাই এসব ছাত্রদের আমি চেতনাবান বলতে রাজী নই। তারা যদি চৈতন্যসম্পন্ন হত, তাহলে আবৃত্তির সময় কিছু ছেড়ে দিত আর কিছু নতুন জুড়ে দিত। ('ক্রান্তদর্শন' থেকে)

'নঈ-তালীম'

প্রায় ১৪-বছর আগে এদেশে নঈ-তালীমের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। নঈ-তালীমের আদর্শ কোন নতুন বস্তু নয়, কেননা সকল সত্যই চিরন্তন। এমন কোন সত্য নেই যা আজ নতুন জন্মাল। অনাদিকাল থেকেই সত্য বর্তমান রয়েছে। এক-এক যুগে সত্যের এক-একটি বিশেষ প্রকাশ দেখা যায় এবং তখনই আমরা বলি যে, একটি নবসত্য আবির্ভূত হয়েছে। এবং সেই যুগের মানুষের কাছে তা নতুন হয়েই দেখা দেয়। আমরা তাকে সত্য বলে অনুভব করে প্রেরণা পাই। তাইতো একে নতুন বলি। যা পুরানো, তা মানুষকে প্রেরণা দিতে পারে না। বহু তপস্যার ফলে আজ নঈ-তালীমের আদর্শ দেশের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে এবং সকলকেই আহ্বান করছে শিক্ষা-সমস্যার সমাধানের জন্যে। নঈ-তালীম এক অভ্রান্ত সমাধানরূপে আমাদের সামনে উপস্থিত হয়েছে। এর বিশুদ্ধতা, সামর্থ্য এবং অমৃতদায়িনী শক্তি সম্বন্ধে আজ আমরা নিঃসংশয় হয়েছি।

মূর্খতার প্রমাণ

কিন্তু স্বাধীন হওয়ার তিন-বছর পরও নঈ-তালীমের শিক্ষাপদ্ধতি দেশের সর্বত্র গ্রহণ করার সাহস আমাদের হল না। এর চেয়ে আশ্চর্যের ও দুঃখের কথা আর কী থাকতে পারে? পরাধীন ভারতবর্ষে যে-শিক্ষা ভারতবাসীকে পদানত করে রাখবার উদ্দেশ্যে

প্রবর্তিত করা হয়েছিল, আজ স্বাধীনতা পাওয়ার পরেও যদি সেই শিক্ষা-ব্যবস্থাই আগের মতো চলতে থাকে, তাহলে আমাদের মূর্খতার এর চাইতে আর বড় প্রমাণ কী থাকতে পারে?

'নঈ-তালীমের এখনও পরীক্ষা চলছে, এ এখনও কাঁচা রয়েছে এবং খাওয়ার যোগ্য হয় নি, যখন পাকবে তখন খাওয়া যাবে'—এই জাতীয় চিন্তাধারা যুক্তিসহ নয়। কারণ, যতদিন একে খাওয়া চলবে না ততদিন কি আমরা ইঁট, পাথর ইত্যাদি খেয়ে থাকব? আজ আপনি যা খাচ্ছেন, তা-যে মোটেই খাদ্য নয়। একে ফেলে দেওয়া ছাড়া আর কোন গত্যন্তর নেই। আমরা যদি বর্তমান শিক্ষা পদ্ধতি ত্যাগ করে দিয়ে বলতাম, 'স্বাধীন ভারতবর্ষের শিক্ষা-পদ্ধতি এখনও সম্যকরূপে নির্নীত হতে পারেনি, এখনও বোঝা যাচ্ছে না কিরকম শিক্ষাপদ্ধতি হলে ভাল হয়, এ আরো বিচার-বিবেচনা সাপেক্ষ। স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হতে আমাদের কয়েকমাস সময় লাগবে। কাজেই এই কয়েকমাস বিদ্যালয়ের শিক্ষা স্থগিত রেখে দেশের যুবকদের শরীরশ্রমে নিয়োজিত করা যাক আর তাতে দেশের নিতান্ত প্রয়োজনীয় উৎপাদনবৃদ্ধিরও সহায়তা হবে'—তাহলে আমাদের কী ক্ষতি হত? ফলকথা জাতীয় পতাকার জন্যে আমাদের যে-পরিমাণ আগ্রহ জাতীয়শিক্ষার জন্যে ততটা আগ্রহও যে আমাদের নেই—এসম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই। একেই আমি মূর্খতা বলি।

নঈ-তালীম সকলের জন্যে

নঈ-তালীমের নাম দেওয়া হয়েছে বুনিয়াদী-শিক্ষা। কিন্তু

বুনিয়াদী কথাটির তাৎপর্য আমরা হৃদয়ঙ্গম করতে পারিনি। বুনিয়াদী-শিক্ষা কথাটির সোজাসুজি অর্থ হচ্ছে, প্রাথমিক শিক্ষা। তবে, এখানে বুনিয়াদী-শিক্ষা বলতে আরও কিছু বোঝায়। দেশের নিম্ন, মধ্য, উচ্চ প্রভৃতি সমগ্র শিক্ষা-ব্যবস্থাই এই শিক্ষাপদ্ধতির উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে—এই হবে বুনিয়াদ। বুনিয়াদী-শিক্ষার যথার্থ তাৎপর্য উপরোক্ত উক্তির মধ্যে নিহিত রয়েছে। গ্রামবাসী এবং শহরবাসীদের জন্যে ভিন্ন-ভিন্ন শিক্ষাপদ্ধতি চলতে পারে না। এ-ও হতে পারে না যে, প্রথম চার-বছর এই শিক্ষা চলবে আর তারপর নঈ-তালীমের সঙ্গে সম্পর্কহীন অন্য এক শিক্ষা চলতে থাকবে। বাস্তুত্যাগীদের জন্যে পরীক্ষামূলকভাবে নঈ-তালীম গ্রহণ করে সমগ্র দেশে পৃথক শিক্ষাপদ্ধতি গ্রহণ করাও চলতে পারে না। অর্থাৎ নঈ-তালীমকে 'বুনিয়দী-শিক্ষা' তখনই বলা যাবে, যখন সমগ্র দেশের শিক্ষাব্যবস্থা নঈ-তালীমের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে। নঈ-তালীমের শিক্ষাপদ্ধতি অনুসরণ করে যাঁরা শিক্ষাদান করছেন, তাঁদের মধ্যে অনেকেই, আপনারা শহরের জন্যে কি ভাবছেন—এই কথার উত্তরে, আমার জ্ঞাতসারেই বলেছেন, 'ভাই, নঈ-তালীম তো শহরের জন্যে নয়, এ পদ্ধতি গ্রামের লোকদেরই উপযুক্ত।' আমার মতে এর চেয়ে ভ্রান্তধারণা আরকিছু হতে পারেনা। এই শিক্ষাপদ্ধতি তো সকলের জন্যে। এতে শহর ও গ্রামের কোন পার্থক্য নেই।

শোষণ বন্ধ করুন

বর্তমানে শহরে যে-পরিবেশ রয়েছে আমরা যদি তাকে বজায় রাখতে চাই, তাহলে ভারতবর্ষে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হওয়া অসম্ভব।

শহরবাসীদের অস্তিত্ব নির্ভর করছে গ্রামবাসীদের উপর। সুতরাং গ্রামবাসীদের সেবা করা শহরবাসীদের কর্তব্য এবং তা স্মরণে রেখে নিজেদের ছেলেমেয়েদেরও সেইভাবেই শিক্ষা দেওয়া উচিত। গ্রামের ছেলেমেয়েরা দেশসেবার শিক্ষা পাবে আর শহরের ছেলে-মেয়েরা পাবে দেশবাসীকে লুণ্ঠন করার শিক্ষা—এ কখনও হতে পারে না। এরকম বিপরীত ব্যবস্থা এদেশে কখনও টি ঁকতে পারে না। তার কারণ, আজ দেশে নবজাগরণের সাড়া উঠেছে। কোন জাগ্রত দেশ এ জাতীয় বৈষম্য কখনও সহ্য করতে পারে না। বুনিয়াদী-শিক্ষার তাৎপর্য আমার এই কথা থেকেই আশা করি পরিষ্কার হবে।

বাঁধাধরা নিয়ম বর্জনীয়

নতুন শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তনের মধ্যে কিছু বিপদও হতে পারে। সে-সম্বন্ধেও আপনাদের আগে থেকেই সতর্ক করে দিতে চাই। এখানে নঈ-তালীমের কিছু পরীক্ষা আমরা করছি। প্রদর্শনীতেও এই শিক্ষার কিছু পরিচয় আপনারা পাবেন। এখানে সব প্রদেশেরই লোক এসেছেন! আপনারা প্রত্যেকেই নঈ-তালীমসম্বন্ধে একটা মোটামুটি ধারণা এখান থেকে পাবেন এবং সেই ধারণা নিয়ে বাড়ী ফিরবেন। এই অবস্থায় আমি বিপদের সম্ভাবনা দেখছি। এখানে যা কিছু শিখবেন কিম্বা পাবেন সেগুলিকে মৌলিক তত্ত্ব হিসাবেই গ্রহণ করতে হবে, যাতে পথ চিনে নিয়ে আপনারা অভীষ্ট লক্ষ্যের অভিমুখে অগ্রসর হতে পারেন। পক্ষান্তরে আপনারা যদি নঈ-

তালীমকে এইভাবে গ্রহণ করতে না পারেন, তাহলে একদিকে সরকারী শিক্ষাপদ্ধতির বাঁধাধরা নিয়ম, আরেকদিকে তালীমীসংঘের বাঁধাধরা নিয়ম—এই দুই নিয়ম-তন্ত্রের মধ্যে পড়ে সমগ্র শিক্ষা-ব্যবস্থাই নিষ্পিষ্ট হয়ে অকর্মণ্য সাব্যস্ত হবে। আমি নিয়মের অচলায়তনকে বড় ভয় করি। শিক্ষাক্ষেত্রে নিয়মতান্ত্রিকতাকে গুরুত্ব দিলে শিক্ষা সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। বুনিয়াদী-শিক্ষা সম্বন্ধে তলীমীসংঘের ধারণাকে যেভাবে রূপায়িত করা হয়েছে তারই নিদর্শনমাত্র আপনারা এখানে দেখছেন। আমি চাই যে, আপনারা এ বিষয়ে স্বাধীনভাবে চিন্তা করুন এবং স্বাধীনভাবেই তার প্রয়োগ করুন।

নঈ-তালীমের নানাদিক

এক ভাই যেসব জায়গায় নঈ-তালীমের কাজ চলছে সে-সব জায়গায় গিয়ে এর প্রয়োগ দেখতে চাইলেন। আমাকে বললেন, 'বলুন, কোথায়-কোথায় যাব?' আমি তাঁকে সেবাগ্রাম, মহিলা-শ্রম, গোপুরী আর মগনবাড়ীতে গিয়ে সেখানে যা-যা হচ্ছে সবই দেখতে বললাম। তিনি সমস্ত দেখে-শুনে ফিরে এসে আমাকে বললেন, 'আমি তো সব জায়গায় গেলাম। কিন্তু সব জায়গায় তো একরকমের কাজ চলছে না, এক-এক জায়গায় এক-এক রকম জিনিস দেখলাম। সেবাগ্রামে যা দেখলাম, মহিলাশ্রমে তা দেখলাম না। ওদিকে গোপুরীতে দেখলাম, কারখানার পর কারখানা বসে গেছে; সেখানে কেবল কারখানার কাজই চলছে। মহিলাশ্রমে লেখাপড়া শিখবার সঙ্গে-সঙ্গে মেয়েরা রান্না করছে, শৌচাগার

পরিষ্কার করছে আবার কাপড়ও বুনছে। প্রত্যেক জায়গাতেই নঈ-তালীমের ভিন্ন-ভিন্ন রূপ দৃষ্টিগোচর হল।' এ কথা শুনে আমি তাঁকে বললাম, 'আপনি যা দেখেছেন সব নঈ-তালীমের প্রয়োগই দেখেছেন ; নঈ-তালীম তো কতকগুলি নির্দিষ্ট ক্রিয়াকলাপের সমষ্টি নয়। এ তো একটা বিচারধারা, সমস্যাসমাধানের পথ।

আজকাল অনেকেই বুনিয়াদী-শিক্ষাকে একটি বিশেষ শিক্ষা-পদ্ধতি বলে মনে করছেন। এই শিক্ষাপদ্ধতির টেকনিক এবং নিয়মাবলী প্রভৃতি নিয়েই বুনিয়াদী শিক্ষা—একথাই তাঁরা মনে করেন। তাঁদের মতে পূর্বের অন্যান্য শিক্ষাপদ্ধতির মতো এও আরেকটি শিক্ষাপদ্ধতি। কিন্তু এরকম মনে করা ভুল। কারণ প্রাচীনকালে ভারতবর্ষে যেমন ব্রহ্মসাধনার এক ব্যাপক চিন্তাধারা ও দর্শন প্রচারিত হয়েছিল, তেমনি নঈ-তালীমও একটি বিশিষ্ট চিন্তাধারা ছাড়া আর কিছু নয়। এক ব্রহ্মসম্বন্ধীয় চিন্তা থেকেই অদ্বৈত, দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত ও শুদ্ধ অদ্বৈত প্রভৃতি তত্ত্ব উদ্ভূত হয়েছে। এইভাবে এক ব্রহ্মতত্ত্ব থেকে এতগুলি বিভিন্ন সাধনমার্গ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। অনুরূপভাবে নঈ-তালীমকেও এক ব্যাপক শিক্ষাতত্ত্বরূপে গণনা করতে হবে, যা থেকে নানা শিক্ষামার্গ প্রতিষ্ঠিত হবে।

গণ্ডীবদ্ধতার ধারণা ভুল

এক বন্ধুর সঙ্গে আলোচনা প্রসঙ্গে তাঁকে বলছিলাম যে, পাশ্চাত্য শিক্ষাপদ্ধতিতে মহৎ ভাবদ্যোতক শ্লোক বা কবিতার পংক্তি কণ্ঠস্থ করার উপর জোর দেওয়া হয় না। সুনির্বাচিত নানা

শ্লোক ছোট ছেলেমেয়েদের কণ্ঠস্থ করাতে হবে—এটি তাঁদের শিক্ষার অঙ্গ না করলে ভুল হবে। আমি নিজে এরদ্বারা অনেক উপকার পেয়েছি এবং জীবনের নানা অবস্থায় এসব থেকে কতনা বল পেয়েছি—একথাও তাঁকে বলেছিলাম। আমাদের ধর্মশাস্ত্র ও কাব্যাদি থেকে মহৎ ভাবদ্যোতক নানা চিন্তা ও মননের বিষয় যদি আমরা শিশুকালে কণ্ঠস্থ করে আত্মস্থ করতে পারি, তাহলে পরবর্তী জীবনে তা আমাদের প্রভূত উপকারে আসে। এবিষয়ে পাশ্চাত্যশিক্ষা-বিদদের মত ও বিশ্বাসের সঙ্গে আমাদের মত ও বিশ্বাস মেলে না। তাঁদের পদ্ধতি বিশ্লেষণাত্মক পদ্ধতি। তাঁরা বহির্জগতকে নানাভাগে ভাগ করে খণ্ড-খণ্ড ভাবে জগতের জ্ঞান লাভ করতে চান। ভারতবর্ষ সমগ্র বিশ্বকে এক মহা ঐক্যের মধ্যে বিধৃত দেখতে শিখেছে এবং অদ্বৈত স্বরূপকে উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছে। এখানেই প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য পদ্ধতির পার্থক্য। এইকারণেই আমরা শাস্ত্র ও সাহিত্যের সর্বোত্তম ভাবগুলি কণ্ঠস্থ করে থাকি। বুদ্ধিকে যাঁরা প্রধান স্থান দেন, তাঁরা উপলব্ধ সত্যসমূহ কণ্ঠস্থ করার উপর কোন গুরুত্ব দেন না। বুদ্ধির প্রাধান্য অনস্বীকার্য, কিন্তু এতেই ভাব ও ভাবনা অর্থাৎ হৃদয়ের প্রয়োজনীয়তা নিরর্থক হয়ে যায় না। হৃদয়-বৃত্তির পরিপুষ্টির জন্যেই উপরোক্ত সদ্‌ভাবনাসমূহ কণ্ঠস্থ করা নিতান্ত প্রয়োজন। এসকল কথা শুনে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনার কথার যুক্তি-যুক্ততা সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই। শ্রমশিল্পের অনুশীলনের সঙ্গে এর যোগস্থাপন কি করে করা যাবে?' আমি তাঁকে বললাম, 'এর জবাবে আমি আপনাকে একটি প্রশ্ন করব। আমাকে

বলুন তো, আপনার সন্তান রাত্রিতে যে নিদ্রা যায়, তারসঙ্গে শ্রমশিল্পের কি সম্বন্ধ আছে?' তিনি বললেন, 'নিদ্রার পর মানুষ নতুন উদ্যমে কাজ করার উৎসাহ ও শক্তি লাভ করে। আর শ্রমশিল্পের অনুশীলনের জন্যে উদ্যম ও উৎসাহের বিশেষ প্রয়োজন রয়েছে। এই ভাবেই নিদ্রার সঙ্গে উদ্যোগের (শ্রমশিল্পের) সম্বন্ধ নির্ণয় করা যায়।' আমি বললাম, 'ঠিক বলেছেন। অনুরূপভাবে চিন্তা করলেই বুঝতে পারবেন যে, প্রত্যেক মানুষের যে-আত্মা আছে, সেই আত্মার শক্তিতেই তার দেহ শক্তিমান হয়। আত্মাহীন দেহে কোন শক্তি থাকে না। আত্মা যে-দেহ ছেড়ে চলে যায়, সেইদেহকে আমরা দেহ বলি না, 'লাশ' বা মৃতদেহ বলি। মৃতদেহের স্থান তো শ্মশানে।' আত্মার অধিষ্ঠান যে দেহে, সেই দেহেই কর্তৃত্বশক্তি দেখতে পাওয়া যায়। এইকারণেই আত্মার বিকাশের জন্যে উত্তম শ্লোকাদিও পাঠ করা দরকার মনে করি।

এক বিশেষ কারণে শ্লোকাদি কণ্ঠস্থ করার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে আলোচনা করলাম। একে দৃষ্টান্তস্বরূপ উপস্থিত করলাম। আজ অনেকেই নঈ-তালীমকে এক গণ্ডীবদ্ধ-পদ্ধতিতে পরিণত করতে উদ্যত হয়েছেন। এই অবস্থায় কিন্তু কণ্ঠস্থ করার কোন মূল্যই থাকবেনা, এ একেবারে তোতাপাখীর মতো কথা আওড়ানো হবে। গণ্ডীবদ্ধ-পদ্ধতি হলে পদ্ধতির অনুসরণকারীদের বিচার-বিবেচনা করে কোনকিছু নির্ধারণ করবার থাকবে না। তারা তখন শুধু কোন্ হাতের কাজের মাধ্যমে কোন্ জ্ঞান শিক্ষা দেবেন, সে-সব ঠিক করতেই ব্যস্ত থাকবেন। এই গণ্ডীবদ্ধতা থেকে আমাদের মুক্ত হতে

হবে। নঈ-তালীম একটি পরিপূর্ণ জীবনদর্শন। নঈ-তালীমের মধ্যে যে-আদর্শ রয়েছে, সেই আদর্শে উপনীত হওয়ার উদ্দেশ্যে আমাদের স্বাধীনভাবে কাজ করে যেতে হবে।

নৃত্য ও সঙ্গীতের সীমা

কোথাও-কোথাও বিদ্যালয়ে শ্রমের সঙ্গে-সঙ্গে মনোবিনোদনের ব্যবস্থাও রাখা হয়। একে আমি দোষাবহ মনে করি না—কারণ এর দ্বারা শব্দব্রহ্মের উপাসনা হয়। কিন্তু সঙ্গে-সঙ্গে একথাও মনে রাখতে হবে যে, আমাদের দেশে অসংখ্য লোক ক্ষুধায় পীড়িত। ক্ষুধায় পীড়িত ও অনশনে মৃত্যুকবলিত দেশবাসীদের কথা স্মরণ করে নৃত্যগীতে মগ্ন হওয়া কি সম্ভব? ছবি যদি আঁকতে হয় তো ক্ষুৎপিপাসায় কাতর, অনশনে মৃত্যুপথযাত্রী ও উপবাসে প্রাণত্যাগ করেছে-এমন লোকদের ছবি আঁকতে হবে। আর এই ছবি সামনে রেখে আমাদের কাজ করতে হবে। তাহলেই ভারতবর্ষের শিক্ষা-পদ্ধতির স্বরূপ আমাদের কাছে স্পষ্ট হবে। প্রচলিত শিক্ষাপদ্ধতির অনুসরণকারীরা বলেন যে, তাঁরা সাংস্কৃতিক বিকাশের চেষ্টা করছেন। বেশ তো। আমার এতে কোন আপত্তি নেই, আমিও সাংস্কৃতিক বিকাশকে কদর করি এবং মনে করি যে, এর যথেষ্ট মূল্য রয়েছে। মানুষের জীবনে এর-যে প্রয়োজন আছে সে-কথা আমি অস্বীকার করি না। কিন্তু সাংস্কৃতিক বিকাশকেই একান্ত করে তুলে. শিক্ষার মুখ্য উদ্দেশ্যকে হারিয়ে ফেললে তো চলবে না। সংস্কৃতির জন্যে পাগল হয়ে আমাদের মূল সমস্যাকে যেন আমরা ভুলে না-যাই।

শিক্ষা সংযমপ্রধান হবে

ভারতবর্ষে জনসংখ্যা ক্রমশই বেড়ে চলেছে—এই গুরুতর সমস্যার সমাধানের জন্যে গভীরভাবে চিন্তা করা দরকার। শুধু জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেলে আমি বিশেষ ভীত হতাম না। কিন্তু বীর্যহীন অকর্মণ্য মানুষ বেড়ে চলেছে দেখে আমি ভীত হয়ে পড়েছি। আমি বিশ্বাস করি যে, বীর্যবান, কর্মযোগী, কুশল মানুষের দল যতই বাড়ুক না-কেন, বসুন্ধরা তাদের সকলের ভার বহন করতে সমর্থ হবেন। কিন্তু বীর্যহীন নিস্তেজ মানুষের এত বৃদ্ধির কাবণ কি? কারণ, দেশে সংযমের পরিবেশের অভাব। আধুনিক সাহিত্য ও ছায়াচিত্রাদি ভারতবর্ষের সর্বত্র এমন প্রভাব বিস্তার করছে যাতে মানুষ সম্পূর্ণ নির্জীব হয়ে পড়ছে। এই পরিস্থিতির দরুন নঈ-তালীমের দায়িত্ব আরও বেড়ে গেছে। এই শিক্ষার দ্বারা ভবিষ্যৎবংশীয়দের সংযত-চরিত্র, বীর্যবান ও কষ্টসহিষ্ণু করে তোলার দায়িত্ব আজ আমাদের উপর পড়েছে। ভগবান বুদ্ধ বলেছেন—'হস্তসংযতো, পাদসংযতো, বাচাসংযতো' হতে হবে। হাতের কাজে নিপুণতার অর্থ আমরা জানি, কিন্তু আজ হাতকে সংযত রাখার অর্থও আমাদের জানতে হবে। ইন্দ্রিয়াদি ব্যবহারের দক্ষতার সঙ্গে ইন্দ্রিয়সংযমের শক্তিও লাভ করতে হবে। সংযমহীন কার্যদক্ষ মানুষ সংসারের অনিষ্টসাধনই করে থাকে। এই দক্ষতা কল্যাণকর হয় না, মানুষের কোন উপকারে আসে না। কেবলমাত্র শক্তি বা কৌশলে কোন লাভ নেই। এসব যদি কল্যাণকারী হয় তাহলেই লাভ। কিন্তু এদিকে আমরা বিশেষ দৃষ্টি দিই না। বুনিয়াদী-শিক্ষার আলোচনার সময়

শ্রমশিল্পের মাধ্যম্যে কি করে শিক্ষা দিতে হবে কেবলমাত্র তারই আলোচনা হয়, এই মন্ত্রই জপ করা হয়। আর মনে করা হয় যে, এইজাতীয় আলোচনার দ্বারা নঈ-তালীমের শিক্ষাপদ্ধতি সম্বন্ধে সবকথাই বলা হল, বাকী কিছুই রইল না। তাহলে বলতে হয় যে, নঈ-তালীম সম্বন্ধে আমরা এযাবৎ ভুল ধারণাই পোষণ করছি।

নঈ-তালীম শীলপ্রধান হবে

আমাদের শিক্ষাপদ্ধতিতে সংযমের প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে, এতে স্বেচ্ছাচারের স্থান নেই। বাল্যকাল থেকেই শিক্ষার্থীরা যাতে ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধিকে সংযত করতে শেখে সেই বিষয়ে আমাদের বিশেষ দৃষ্টি রাখতে হবে। শিক্ষার্থীরা বাক্যে সত্যনিষ্ঠ হবে। তাদের কথা যুক্তিপূর্ণ হবে। কেবল রুচিপূর্ণ সুন্দর বাক্য বলতে শিখলেই চলবে না। বাক্যের মধ্যে চরিত্রগুণ প্রতিফলিত হওয়া চাই। শীল ও শৈলীর, নম্রতা ও লালিত্যের পার্থক্যের দিকে আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই।

নঈ-তালীম নারীদের পরিচালনায় চলবে

শিক্ষাক্ষেত্রে সংযমের পরিবেশ সৃষ্টির দায়িত্ব নঈ-তালীমকে নিতে হলে এবং যথার্থভাবে এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ করতে হলে যথাসম্ভব এই কর্মভার মেয়েদের উপর দিতে হবে এবং একার্যের জন্যে বহু নারীকে শিক্ষিত করে তুলতে হবে। পরশু মৃদুলাবেন সারাভাই আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন। তিনি মেয়েদের সমস্যাসম্বন্ধে আমাকে

কিছু প্রশ্ন করলেন। আমি তার উত্তরে বললাম, 'তুমি নানা জায়গায় কস্তুরবা-কেন্দ্র খুলছ, গ্রামের মেয়েদের জন্যে সেবা-প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত করছ। এবিষয়ে আমার পরামর্শ হচ্ছে যে, কস্তুরবা ও নঈ-তালীমের কর্মসূচী এক করে ফেলা হোক। ভারতবর্ষের সমস্ত নারী-সংস্থার সঙ্গে যোগাযোগ করে নারীদের দেশসেবার কাজে আহ্বাহন করা হোক এবং তাঁদের হাতেই শিশুশিক্ষার ভার দিয়ে দেওয়া হোক।' উপনিষদে উক্ত হয়েছে—'মাতৃবান, পিতৃবান, আচার্যবান'। প্রথম মতার নিকট, তারপর পিতার নিকট, সর্বশেষে আচার্যের নিকট শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে—শিক্ষার ক্রম এইরকমই হওয়া চাই। —(তালীমী-সংঘ সম্মেলন, সেবাগ্রাম)

ভারতীয় বিদ্যা

শিক্ষা থেকে দুই বস্তু লাভের আশা

শিক্ষা প্রসঙ্গে দুই বিষয়ে মনোযোগ দেওয়া দরকার। প্রথমত একথা হৃদয়ঙ্গম করতে হবে যে, জনসাধারণই শিক্ষার ব্যয়ভার বহন করে। এইজন্যে সাধারণের উপকারার্থে এই শিক্ষা নিয়োজিত হওয়া উচিত। শিক্ষা এমন হওয়া উচিত যাতে শিক্ষিত হওয়ার পর শিক্ষার্থী সমাজসেবার যোগ্যতা অর্জন করে সেবাকার্যে অগ্রসর হতে পারে এবং সমাজ থেকে যা গ্রহণ করেছে তার দশগুণ সমাজকে ফিরিয়ে দিতে পারে। এক সের উপ্ত শস্য যেমন পঁচিশ

সের ফসল দেয়, তেমনি শিক্ষার্থীর চিত্তক্ষেত্রে উপ্ত চিন্তাবীজ দশ-বিশগুণ হয়ে প্রকাশিত হওয়া চাই।

শিক্ষা থেকেই শিক্ষার্থীর সামগ্রিক বিকাশের উপকরণ মিলবে—এই দ্বিতীয় বস্তু শিক্ষা থেকে পাওয়ার আশা থাকে। দ্রষ্টা ঋষিদের কাছে আমরা মনের শক্তির পরিচয় পেয়েছি। তাঁরা বলেছেন—'অনন্তহি মনঃ, অনন্তা বিশ্বেদেবাঃ।' বিশ্বদেব অনন্ত, আর মনও অনন্ত। মনের বিভিন্ন বৃত্তি ও শক্তি বিশ্লেষণ করলে বহু গুণের আভাস পাওয়া যায়। সচ্চিদানন্দ আত্মার সংস্পর্শে মনের মধ্যে গুণরাশি প্রতিবিম্বিত হয়, অর্থাৎ মনের মধ্যে অনন্ত গুণ প্রকাশিত হয়। প্রজ্ঞাবান পুরুষেরা আমাদের শিখিয়েছেন যে, যে-শিক্ষাদ্বারা আমরা মন ও শরীর থেকে আত্মসত্ত্বাকে পৃথক বলে জানতে পারি, সেই শিক্ষাই প্রধান শিক্ষা। এই আত্মজ্ঞানই সর্বশ্রেষ্ঠ গুণ।

বিদ্যা-স্নাতক, ব্রত-স্নাতক

প্রাচীনকালে যে-বিদ্যার্থী গুরুর কাছে কেবল বিদ্যার্জন করতেন, তাঁকে বিদ্যা-স্নাতক বলা হত। তিনি পূর্ণস্নাতক হতে সক্ষম হতেন না। পূর্ণস্নাতক হতে হলে বিদ্যা-স্নাতক হওয়ার সঙ্গে ব্রত-স্নাতকও হতে হত। ব্রত-স্নাতককে নিজের উপর জয়লাভ করতে হত। আত্ম-দমন ও আত্মনিয়ন্ত্রণের কৌশল যিনি আয়ত্ত্ব করতেন, তাঁকেই ব্রত-স্নাতক বলা হত।

এইপ্রকারে তপস্যাদ্বারা অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ যে-বিদ্যার্থী বীরোচিত সাহস ও আত্মবিশ্বাস নিয়ে সংসারে প্রবেশ করেন, তিনি

সংসারে কারও কাছে মাথা নত করেন না, সর্বত্র অমিতবিক্রমে উন্নতশিরেই গমন করেন। তিনি এমন বীরত্বের সঙ্গে সংসারে প্রবেশ করেন যে—'নময়তীব গতির্ ধরিত্রীম্।' মনে হয়, তাঁর পায়ের চাপে ধরণীও যেন অবনমিত হন।

বিদ্যা থেকেই বিনয় উদ্ভূত

উপরোক্ত উক্তির অর্থ এই নয় যে, ব্রত-স্নাতক উদ্ধতভাবে সংসারে প্রবেশ করেন। নম্রতা তো তাঁর থাকবেই। জ্ঞাণীব্যক্তি জানেন যে, জ্ঞান অনন্ত এবং এই অনন্তজ্ঞানের কত অল্প-যে তিনি পেয়েছেন, সে-সম্বন্ধেও তাঁর কোন সংশয় থাকে না। এই কারণে প্রকৃত জ্ঞানীব্যক্তি যে-পরিমাণ বিদ্বান ও বিনয়ী হবেন, বিদ্যা যাঁর লাভ হয় নাই, তিনি কখনও ততটা হতে পারবেন না। কারণ তিনি জ্ঞানের পরিমাপ সম্বন্ধেই অজ্ঞ। জ্ঞানসমুদ্র যাঁর দৃষ্টিগোচর হয়েছে, তিনি সহজেই উপলব্ধি করেন যে, জ্ঞান অপার ও অনন্ত এবং মানবলব্ধ জ্ঞান সেই অনন্ত জ্ঞানের সামান্য অংশ মাত্র। আর এই কারণেই সারাজীবন তাঁকে জ্ঞান অন্বেষণে রত থাকতে হবে। তিনি যতই জ্ঞানলাভ করুন না-কেন, সংসারে যে নিত্যনূতন জ্ঞানের উদ্ভব হতেই থাকবে তার যথার্থ্য সম্বন্ধেও তাঁর পূর্ণজ্ঞান থাকবে। এই কারণে তিনি সর্বদা নম্রতাসহকারে বাস করবেন। এইজন্যে আমাদের পূর্বপুরুষেরা বিদ্বানের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেছেন, বিদ্বান নিজে ত বিনয়ী হবেনই, তিনি প্রজাদেরও বিনয়ী করে গড়বেন।— 'প্রজানাং বিনয়াধানাত্।'

ধৈর্য চাই

বিদ্যার্থী নম্র তো হবেনই, কিন্তু সেইসঙ্গে তাঁর আত্মবিশ্বাস, ধৈর্য, নির্ভয়তা আদি গুণও থাকা চাই। বুদ্ধির সঙ্গে ধৃতিও থাকা চাই। সংসারে প্রবেশকালে বিদ্যার্থী বিজয়ী বীরের মতো সেখানে প্রবেশ করবেন। বেদাধ্যয়ন পরিপূর্ণ হওয়ার সময় বিদ্যার্থী এই মন্ত্র বলেন, 'মহ্যং নমন্তাং প্রদিশশ্ চতস্রঃ'—চতুর্দিক আমার সামনে নত হোক। এইপ্রকার বিদ্যা যিনি লাভ করেন, তিনি সেই বিদ্যাদ্বারা সমগ্র জগতের সেবা করতে সক্ষম হন।

জ্ঞানের উত্তরোত্তর বৃদ্ধি

খাদ্যগ্রহণের দুইদিন পর খাদ্যগ্রহণের তৃপ্তি হয় না। তৃপ্তি ও তুষ্টি তখন-তখনই হয়ে থাকে। জ্ঞানলাভে যে-তৃপ্তি হয়, তাও উপরোক্ত প্রকারেই হয়ে থাকে। যথার্থ জ্ঞানলাভ হলে চেহারাতেই জ্ঞানের দীপ্তি প্রকাশ পায় এবং জ্ঞানতৃপ্ত শিক্ষার্থী অপার আনন্দ উপভোগ করেন—আর এই আনন্দ বারবার পাওয়ার জন্যে তাঁর জ্ঞানপিপাসা উত্তরোত্তর বাড়তেই থাকে। জ্ঞানপ্রাপ্তিতে তাঁর সময় অযথা নষ্ট হচ্ছে—এরকম কখনও তাঁর মনে হয় না।

অধ্যয়নের প্রাচীন পরম্পরা

যিনি একবার অধ্যয়নের স্বাদ পেয়েছেন, তিনি কখনও তা আর ছাড়তে পারেন না। ঋষি বলেছেন, প্রত্যেক কাজ করার সঙ্গে-সঙ্গে 'স্বাধ্যায়-প্রবচনে চ'—ধর্মগ্রন্থ পাঠ ও ব্যাখ্যা কর। 'ঋতং চ স্বাধ্যায়-

প্রবচনে চ', 'সত্যং চ স্বাধ্যায়-প্রবচনে চ',—সত্যকথন, সত্যাচরণ করার সঙ্গে-সঙ্গে স্বাধ্যায় এবং প্রবচনও করতে হবে। 'তপশ্চ স্বাধ্যায়-প্রবচনে চ'—তপস্যার সঙ্গে স্বাধ্যায় এবং প্রবচন করতে হবে। জনসেবার সঙ্গে-সঙ্গে অধ্যয়নের অভ্যাস বজায় রাখতে হবে। গার্হস্থ-আশ্রমের প্রত্যেক কাজ করার সঙ্গে-সঙ্গে গৃহস্থ অধ্যয়নও করবেন—এই আশা করা হয়। বিদ্যাভ্যাসের সময় যিনি অধ্যয়নের রসাস্বাদন করেন, তাঁর সেই রসের আকাঙ্ক্ষা উত্তরোত্তর বেড়ে চলে।

আমাদের বিদ্যার পরম্পরা

কিন্তু আজ দেখছি আমাদের দেশে অধ্যয়নের অভ্যাস বিরল হয়ে পড়েছে। আমাদের এই বহু পুরাতন দেশে প্রাচীনকাল থেকে আজ পর্যন্ত অধ্যয়নের রীতি প্রচলিত রয়েছে, অধ্যয়নের অখণ্ড পরম্পরা অবিচ্ছিন্নধারায় চলেছে। যে-সময়ে পৃথিবীর অন্যান্য দেশ অজ্ঞান অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিল এবং বিদ্যার সঙ্গে যখন ঐসব দেশের পরিচয় ছিল না, তখনও আমাদের দেশে বিদ্যা বর্তমান ছিল। ভারতবাসী তখনও ব্রাহ্মমুহূর্তে গাত্রোত্থান করত। 'অনুব্রুবাণঃ অধ্যেতি ন স্বপন্'—তারা প্রাতঃসময়ে নিদ্রায় মগ্ন থাকত না, অধ্যয়নে রত থাকত।

বর্তমানের দুরবস্থা

কিন্তু আজ অধ্যয়নশীল লোকের নিতান্ত অভাব হয়েছে। এর কারণ বর্তমানকালের শিক্ষাপ্রণালীর মধ্যে নিহিত রয়েছে। শিক্ষা-

রম্ভের পর ১০।১৫ বছরের মধ্যেই শিক্ষার্থীর সমস্ত আনন্দ শুকিয়ে যায়। স্পষ্ট দেখা যায় যে, বিদ্যালয়ে যাওয়ার পর থেকে শিক্ষার্থীর চোখের জ্যোতি, শারীরিক শক্তি ও মানসিক শক্তি সবই আস্তে আস্তে ক্ষীণ হয়ে আসে। বুদ্ধি ও অন্যান্য বৃত্তির বিকাশ হওয়ার সুযোগই হয় না। আর সবচেয়ে বড় সমস্যা এই যে, শিক্ষার্থী এই শিক্ষার ফলে প্রাণশক্তি হারিয়ে ফেলে। আত্মার অস্তিত্ববোধ তার থাকে না। 'আমি দেহ থেকে ভিন্ন'—এসম্বন্ধে কোন ধারণা জন্মায় না এবং আপন ইন্দ্রিয়গুলির উপর তার কোন কর্তৃত্ব থাকে না! তা হলে আর কোন্ বিষয়ে এরা শিক্ষা পেয়ে থাকে ?

উপরোক্ত বর্ণনায় আমার খুব আনন্দ হচ্ছে এমন নয়। বস্তুত আমার একথা ভেবে অত্যন্ত দুঃখ হয় যে, একসময় আমাদের দেশে যে বিদ্যার প্রচলন খুব ব্যাপক ছিল, তার আজ কি দশাই-না হয়েছে! রবীন্দ্রনাথ প্রাচীন ভারতের কি সুন্দর চিত্র এঁকেছেন ঃ

'প্রথম সামরব তব তপোবনে,
প্রথম প্রচারিত তব বন গহনে।
জ্ঞান-কর্ম কত কাব্য কাহিনী,
অয়ি ভূবন-মন-মোহিনী!'

যে মাতৃভূমির গৌরবময় স্মৃতি আমাদের মনকে উদ্বেলিত করে, সেই মাতৃভূমির বর্তমান দশা বর্ণনা করতে গিয়ে আমার হৃদয় দুঃখ ও বেদনায় ভারাক্রান্ত হয়ে উঠছে। আমি চাই আজ আপনারাও সকলে মিলে বলুন—'আমাদের এই ইচ্ছা যে, বর্তমান শিক্ষাপদ্ধতির অবসান হোক।'

—('সেবক' থেকে)

মনু বলেছেন, 'ষোড়শবর্ষপ্রাপ্ত হলে পুত্রের সঙ্গে মিত্রবৎ আচরণ করবে।' আমার মনে হয় মনুর এই বাক্যের তাৎপর্য হচ্ছে, ১৬-বছর বয়সের মধ্যে পুত্র জীবনের দায়িত্ব পালনে আত্মনির্ভরশীল হয়ে উঠবে। বন্ধুদের আমরা পরামর্শ দিই, কখনো-কখনো সহায়তাও দিয়ে থাকি। কিন্তু নিজ-নিজ জীবনের ভার প্রধানত তাঁদের উপরই থাকে।

সমর্থ-শিক্ষার সুবিধা

প্রকৃতপক্ষে জীবনের ভার বলে কোন বস্তু নেই। কারণ জীবন তো একটা পরম লাভের সামগ্রী। তবে একথা বুঝে নিতে হলে আমাদের শিক্ষা সমর্থ-শিক্ষা (আত্মশক্তি উদ্বোধনকারী শিক্ষা) হওয়া দরকার। এইধরণের শিক্ষা ১৬-বছর বয়স পর্যন্ত মা-বাবার কাছ থেকে পাওয়া চাই। এখানে এর অর্থ মা-বাবাই যে শিক্ষার ব্যবস্থা করবেন—তা নয়, সমাজই ব্যবস্থা করবে। আমার বক্তব্য হচ্ছে, ১৬-বছর পর্যন্ত শিক্ষার্থীকে শিক্ষার জন্যে সবরকম সাহায্য দেওয়া চাই। সমাজের কর্তব্য প্রত্যেক বালক-বালিকার জন্যে এইরকম শিক্ষার ব্যবস্থা করে দেওয়া। ১৬-বছরের পর শিক্ষার্থী যে-শিক্ষালাভ করবে, তারজন্যে নিজেকেই রোজগার করে সেই শিক্ষা লাভ করতে হবে। অর্থাৎ ১৬-বছর পর্যন্তই শিক্ষাব্যাপারে পর-নির্ভরশীল থাকা যাবে, তারপর তাঁকে আত্মনির্ভরশীল হতে হবে।

মনুর উক্তি থেকে একথাও বোঝা যায় যে, ১৬-বছরের আগে ছেলেদের উপর জীবনের দায়িত্ব চাপিয়ে দেওয়া ঠিক নয়। ১৬-বছর পর্যন্ত জীবনই হয় না এমন নয়, তবে সেই জীবনের ভার তখন পর্যন্ত শিক্ষার্থীর উপর ন্যাস্ত হয় না। উত্তরকালে এইভার নিজে গ্রহণ করার জন্যে শিশুকাল থেকেই ধীরে-ধীরে প্রস্তুত হওয়া দরকার। আর এই প্রস্তুতিকেই শিক্ষা বলা হয়।

দশরথের যুক্তি

মনুর এই কথাকে ব্যক্তিবিশেষের প্রামাণ্য উক্তিরূপে উপস্থিত করি নাই। কারণ 'মনু'র অর্থ কোন বিশেষ ব্যক্তি নয়। যুগ-যুগ সঞ্চিত সমাজের অভিজ্ঞতাকেই 'মনু' নাম দেওয়া হয়েছে। নানা যুগেই-যে এজাতীয় মনোভাব ব্যক্ত হয়েছে, তার একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক। বিশ্বামিত্র স্বীয় যজ্ঞ রক্ষার্থে রামকে নিয়ে যাওয়ার জন্যে দশরথের অনুমতি ভিক্ষা করলেন। দশরথ বললেন—'ঊনষোড়শবর্ষো মে রামো রাজীবলোচনঃ' —রাম এখনও ষোড়শ বর্ষ প্রাপ্ত হয় নাই, তাকে এত গুরু দায়িত্বভার কি করে দিই ? রামের বয়স ১৬-বছরের উপর হলে দশরথের এই যুক্তি টিকত না। তখন বশিষ্ঠ দশরথকে বুঝিয়ে বললেন, 'দায়িত্ব ত বিশ্বামিত্র গ্রহণ করবেন। তাঁর নির্দেশমতো এই কাজ হবে। এ তো একটি শিক্ষার আয়োজন।' বশিষ্ঠের কথা শুনে দশরথ এই প্রস্তাবের প্রকৃত অর্থ হৃদয়ঙ্গম করলেন।

'নঈ-তালীমে'র শিক্ষাকাল

উপরোক্ত বিষয়ে মনুর উক্তির সঙ্গে দশরথের মতের মিল দেখা যাচ্ছে। আধুনিক শিক্ষাবিদেরাও একে স্বীকার করেছেন। নঈ-তালীমের অনুসরণকারীরা শিক্ষার্থীর ১৪-বছর বয়স পর্যন্ত ৭-বছরের এক শিক্ষা-পরিকল্পনা স্থির করেছেন। প্রগতিশীল দেশসমূহে ১৪-বছরের নীচে কাউকে কারখানায় নিযুক্ত করা আইন করে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। মনু এঁদের থেকে এক বছর এগিয়ে গিয়েছেন। অন্যদেশে ১৫-বছর পূর্ণ না-হলে কারখানায় ঢোকানো যায় না আর ১৬-বছরের পর কলেজে পড়িয়ে সময় নষ্টও করা হয় না।

আদর্শ বিদ্যাপীঠ

প্রশ্ন উঠবে, 'তাহলে কি আপনার ব্যবস্থা অনুসারে কলেজগুলি খালি পড়ে থাকবে? আর তা যদি হয়, তবে দেশের উন্নতি কী করে হবে?' আমার বিবেচনায় কলেজগুলি তো খালি পড়ে থাকবেই না, বরং অল্পসময়ের মধ্যেই এগুলিতে ভর্তি হওয়ার জায়গা থাকবে না। তখন কলেজগুলিতে প্রত্যেক ছাত্র আপন শ্রমদ্বারা জ্ঞানরূপ অন্ন ও অন্নরূপ জ্ঞান অর্জন করতে থাকবে। দেখা যাবে যে, হাতের সাহায্যে পেটের ভরণ-পোষণ চলছে এবং চোখের সহায়তায় বুদ্ধির উৎকর্ষ সাধিত হচ্ছে। এতে জ্ঞান ও কর্মের অসামঞ্জস্য দূর হবে। কলেজে শিক্ষার্থীর ফীস দিতে হবে না, বোর্ডিং-এর খরচ লাগবে না আর অধ্যাপকেরাও বেতনভোগী হবেন না। রাষ্ট্র শ্রমশালা, গ্রন্থাগার ও লেবরেটরী প্রতিষ্ঠা করবে।

বিদ্যালয়ে কোন ছুটির দিন থাকবে না আর তাতে কেউ অসুখীও হবে না। কারণ, বিদ্যালয়-যে একটা বন্ধনস্থান এমন কথা কারও মনে হবে না।

বর্তমান ব্যয়বহুল শিক্ষা

বর্তমানে কলেজে গরীবদের পড়ার কোন সুবিধা নেই। অবশ্যি দুই-চারজন গরীব ছাত্রছাত্রীকে দয়া করে ফীস মাপ করে দেওয়া হয়। কিন্তু নঈ-তালীমের কলেজে সকলের পক্ষেই ভর্তি হওয়া সহজসাধ্য হবে। ধনীর সন্তানেরা যদি বেশী পরিশ্রমে অক্ষম হয়, তাহলে তাদের জন্যে দু-এক ঘণ্টা কম শ্রম করার ব্যবস্থা রাখা যেতে পারে। কিন্তু এতে ধনীর সন্তানেরা সহজে রাজী হবে না, কারণ তাতে তাদের দৈন্যই প্রকাশ পাবে।

হাস্যাস্পদ বিদ্যালয়

আজকাল তো কৃষি-কলেজও শহরেই খোলা হয়। আর ম্যাট্রিক্ পাশ না-করে সেই কলেজে ভর্তিও হওয়া যায় না। অর্থাৎ শিক্ষার্থী তখনই কৃষি-কলেজে ভর্তি হওয়ার উপযুক্ত হবে, যখন ঠাণ্ডা সহ্য করে, রোদে পুড়ে, বৃষ্টিতে ভিজে কাজ করার শক্তি তার একটুও থাকবে না। কারণ বর্তমান পদ্ধতিতে প্রবেশিকা পাশ করার পর ছাত্ররা শীতাতপ সহ্য করার শক্তি হারিয়ে ফেলে। সুতরাং অধ্যাপক ও ছাত্র উভয়েই চেয়ার-বেঞ্চিতে বসে-বসে কৃষিবিদ্যা আয়ত্ব করে ফেলবে! এক্সপেরিমেণ্টের নামে নামমাত্র কৃষি হবে আর

শ্রমিকেরাই শ্রমসাধ্য কাজগুলি করে দেবে! ক্ষেতে হাতেকলমে প্রয়োগের কাজও শ্রমিকেরাই করবে! আর ওদিকে প্রত্যেক ছাত্রের শিক্ষার ব্যয়নির্বাহার্থ তার বাবাকে বার্ষিক ২৫-একর জমির ফসলের যে-মূল্য, তার সমপরিমাণ অর্থ দিতে হবে! এছাড়া বর্তমান কৃষি-কলেজ চলা সম্ভব নয়।

বিদ্যালয়ে স্বাবলম্বন

প্রাথমিক শিক্ষান্তে উচ্চশিক্ষার কার্যক্রম কিরকম হবে সে-সম্বন্ধে আলোচনাপ্রসঙ্গে আমি পরামর্শ দিয়েছিলাম, 'শিক্ষার্থী প্রত্যহ ছয়-ঘণ্টা পরিশ্রম করে জীবিকা অর্জন করুক আর দুই-ঘণ্টা তাকে সংশ্লিষ্ট জ্ঞান-বিজ্ঞানের শিক্ষা দেওয়া হোক।' শিক্ষার্থীর জন্যে ব্যয় বিদ্যালয়ও করবে না, মাতাপিতাও করবেন না। শিক্ষার্থী বড়লোকের ছেলেই হোক আর গরীবের ছেলেই হোক, উভয়ের সম্বন্ধে একই ব্যবস্থা করতে হবে। এভাবে শিক্ষা দিলেই প্রকৃত শিক্ষা হবে আর দেশেরও উন্নতি হবে।

বর্তমান দুর্দশা

মনুর উক্তির দুইটি দিক আলোচনা করা হল। এই দুইদিক থেকেই আজ মনুর উক্তি ব্যর্থ হয়েছে। অসংখ্য দরিদ্র বালক-বালিকাকে অন্নের জন্যে দুঃখসহ্য করতে হয়। দুঃখসহ্য করেও তাদের অন্ন মেলেনা আর শিক্ষা তো তারা একেবারেই পায় না। অন্যদিকে ধনীর সন্তানেরা পঁচিশ বছর পর্যন্ত কাঁধে শিক্ষার বোঝা নিয়ে

শিক্ষিত হওয়ার ব্যর্থ চেষ্টা করে। কাজ না-করে কী করে বহু অর্থ উপার্জন করা যায় ধনীর সন্তানেরা যখন এই চিন্তায় মগ্ন হয়ে থাকে, তখন অসংখ্য মানুষ প্রাণপণ খেটেও পর্যাপ্ত অন্নের সংস্থান করতে সক্ষম হয় না। সুতরাং ১৬-বছর পর্যন্ত পরবর্তী জীবনে কি উপায়ে স্বাবলম্বী হওয়া যায় এই শিক্ষা লাভ করতে হবে এবং ১৬-বছরের পর থেকে স্বাবলম্বী হয়ে বিদ্যা অর্জন করতে হবে।—এই সূত্রানুসারে শিক্ষা-পরিকল্পনা রচনা না করলে উপরোক্ত দ্বিবিধ দুর্গতি থেকে মুক্তি পাওয়ার আর অন্য উপায় নেই। —('ক্রান্ত-দর্শন' থেকে)

গ্রামীন বিশ্ববিদ্যালয়

(তালীমী-সংঘ সম্মেলন, সেবাগ্রাম)

প্রয়োজন অনুযায়ী পন্থা

'গ্রামীন বিশ্ববিদ্যালয়' এই নামের মধ্যেই একটি মহৎ পরিচয় রয়েছে। 'বিশ্ববিদ্যলয়'-কথাটির অর্থ খুব ব্যাপক। তবে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের একটি সহজ ব্যাখ্যা আজ নায়কম্‌জী আপনাদের কাছে উপস্থিত করেছেন। তিনি বলেছেন, 'যে-স্থান জীবনের সর্বাঙ্গীন বিকাশ নিয়ে ফুটে উঠেছে, সে-স্থানই গ্রামের বিশ্ববিদ্যালয়।' এই ব্যাখ্যা ঠিকই হয়েছে। গ্রামীন বিশ্ববিদ্যালয়ের এই ব্যাখ্যা কাল্পনিক নয়। আজ আমাদের সমাজ-জীবনের প্রয়োজন মিটাবার জন্যে

যে শিক্ষা-ব্যবস্থার আবশ্যকতা হয়েছে, সেই শিক্ষা-ব্যবস্থার রূপই আমাদের সামনে ফুটে উঠেছে। আবশ্যকতা পূরণ করবার উপযুক্ত বস্তু আমাদের সামনে উপস্থিত হয়েছে।

এখানে বুনিয়াদী শিক্ষালাভ করে বর্তমানে যাঁরা উত্তর-বুনিয়াদীর শিক্ষাক্রম অনুসরণ করছেন, তাঁদের শিক্ষাকালও প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। এখন প্রশ্ন উঠেছে যে, উত্তর-বুনিয়াদীর পর এইসব শিক্ষার্থী কী করবেন। যে-পর্যন্ত তাঁরা শিক্ষালাভ করেছেন, বুনিয়াদী শিক্ষার কার্যক্রমের সীমা সে-পর্যন্ত নির্ধারিত করে সেখানেই কি তাঁদের শিক্ষা সমাপ্ত করে দেওয়া হবে? তাঁরা যতদূর পড়াশুনা করেছেন তাকে যথেষ্ট মনে করা যেতে পারে। এদ্বারা তাঁরা দেশের কল্যাণ-সাধনে এবং স্বীয় চেষ্টায় জীবনের উন্নতি সাধনেও সক্ষম হবেন সন্দেহ নেই। কিন্তু তাঁরা যদি আরও উচ্চশিক্ষা লাভ করতে ইচ্ছুক হন, আমাদের ভেবে দেখতে হবে বুনিয়াদী শিক্ষায় সেই সুবিধা দেওয়া যেতে পারে কি-না। এই সম্বন্ধে আমি ভেবে দেখেছি। আমার কাছে একথা স্পষ্ট হয়েছে যে, 'পরিপূর্ণতা'র অন্তিম আদর্শ আমাদের জীবনে কখন রূপায়িত হবে জানি না। সেজন্যে ব্যস্ত হয়ে লাভ নেই। কিন্তু আমরা যে ভাবছি, উত্তর বুনিয়াদীর কার্যক্রম অল্পের মধ্যেই পরিপুর্ণ এবং তার মধ্যে আমরা শিক্ষার একটি পরিপূর্ণ পরিকল্পনা দেশের সামনে উপস্থিত করতে পেরেছি—একথা ঠিক নয়। এইজন্যেই আমি মনে করি, এসব উচ্চশিক্ষার্থীদের জন্যে আরও উচ্চতর শিক্ষার ব্যবস্থা করা উচিত। এইভাবেই বিশ্ববিদ্যালয়ের আবশ্যকতার উদ্ভব হয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিকল্পনা

এই প্রসঙ্গে শহরে ও গ্রামে ভিন্ন-ভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সমীচীনতা সম্বন্ধেও আলোচনা হয়েছে। আমি প্রথমেই বলেছি যে, বুনিয়াদী-শিক্ষা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত বুনিয়াদী থাকাই উচিত। বর্তমানের বিশ্ববিদ্যালয়গুলি যদি বুনিয়াদী-শিক্ষার পরিকল্পনা গ্রহণ করতে রাজী হয় তাহলে তাদের পদ্ধতি সেই অনুসারে পরিবর্তন করতে হবে ; কিন্তু দেখা যাচ্ছে আজ তা সম্ভব নয়। তার একটি কারণ বর্তমান বিশ্ববিদ্যালয়গুলির কাঠামোটাই পুরানো। তাই এই কাঠামোর উপর নতুন কিছু গড়া একেবারেই সম্ভব নয়। তাছাড়া আমরাও দেশের কাছে বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন নতুন পরিকল্পনা উপস্থিত করতে সক্ষম হই নাই। সেইজন্যে আমরা বিশ্ববিদ্যালয়গুলির সামগ্রিক পরিবর্তনও দাবী করতে পারছি না। বুনিয়াদী-শিক্ষা যে-পর্যন্ত অগ্রসর হয়েছে, তাতে সরকারকে এই অনুরোধ করা যেতে পারে যে, প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলি নিজেদের পদ্ধতি পরিবর্তন করে বুনিয়াদী-শিক্ষার পরিকল্পনা অবলম্বন করুক। এতে যে তারা লাভবান হবে—আমাদের অভিজ্ঞতা থেকে আমরা দৃঢ়তার সঙ্গে একথা বলতে পারি। কিন্তু অনুরূপভাবে বিশ্ববিদ্যালয় পরিবর্তন করার পরিকল্পনা আমরা উপস্থিত করতে পারছি না। তাই একথা বলতেও পারছি না যে, আজই বিশ্ববিদ্যালয়গুলির কাঠামো বদলানো হোক।

বিদ্যাপীঠ স্বাবলম্বী হোক

বিশ্ববিদ্যালয় সম্বন্ধে আমরা যখন চিন্তা করব, তখন আমাদের

কাছে যাঁরা পড়াশুনা করছেন, তাঁদের প্রয়োজন অনুসারেই পরিকল্পনা রচনা করতে হবে। তা যদি না-হয়, তাহলে গভীরভাবে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ব্যাপকত্ব স্মরণ করে আমরা এমন একটা বিরাট পরি-কল্পনা খাড়া করে ফেলতে পারি যার সঙ্গে বাস্তবতার কোন সম্পর্ক থাকবে না।

অতএব কিশোরলাল ভাইর প্রস্তাবটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করি। তিনি বলেছেন, আমাদের ছেলেরা উত্তর-বুনিয়াদী শিক্ষা লাভ করেছে—একথা যদি স্বীকার করি, তাহলে তারা নিশ্চয়ই স্বাবলম্বী হয়েছে—একথাও মেনে নেওয়া যেতে পারে। তাঁর এই কথা খুবই ঠিক। আমাদের দরিদ্র দেশ শিক্ষার্থী ও শিক্ষকের জন্যে বহু অর্থ ব্যয় করতে অপারগ। সুতরাং আমাদের স্বাবলম্বী হওয়া উচিত—কিশোরলাল ভাইর কথাতে শুধু এই যুক্তিরই যে সমর্থন রয়েছে তা নয়, শিক্ষার্থীকে স্বাবলম্বী করে গড়ে তোলাই যে শিক্ষার মুখ্য উদ্দেশ্য—এতে এই আদর্শেরও স্বীকৃতি রয়েছে। দেশের দারিদ্র্য স্বাবলম্বনের প্রেরণা মাত্র।

গ্রামীন বিশ্ববিদ্যালয়

উপরোক্ত আদর্শ অনুসারে বিচার করলেই আমাদের গ্রামীন বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপ আমাদের কাছে স্পষ্ট হবে। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক ও ছাত্রদের প্রাথমিক সহায়তা হিসাবে ভাল একটি লাইব্রেরী, হাতে-কলমে কাজের জন্যে হাতিয়ার, যন্ত্রপাতি ও প্রয়োজনীয় জমি দেওয়া হবে। কিছু বাড়ীঘরও করে দেওয়া যেতে পারে, বাকী বাড়ীঘর তাঁরা নিজেরা বানিয়ে নেবেন। এসব ব্যবস্থা করে দিয়ে

তাঁদের বলা হবে—এছাড়া আপনারা আর কিছু দান হিসাবে পাবেন না। শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের মিলেমিশে সামূহিকভাবে জীবন-যাত্রা নির্বাহ করতে হবে এবং দেশের সম্মুখে সামূহিক জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শটি রূপায়িত করে তুলতে হবে। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে জ্ঞানচর্চা হবে ও জ্ঞানের প্রয়োগদ্বারা কর্মসাধনা চলবে এবং এই কর্মসাধনার ফল দেশের সামনে উপস্থিত করতে হবে। কিন্তু শিক্ষক ও শিক্ষার্থী সকলেই স্বাবলম্বনের দ্বারা জীবিকা অর্জন করছেন, শরীরশ্রমের দ্বারা অন্নসংস্থান করছেন—দেশের কাছে এই দৃষ্টান্ত দেখানোই গ্রামীন বিশ্ববিদ্যালয়ের সবচেয়ে বড় কাজ হবে। যেমন তেমন করে নয়, উন্নত উপায় অবলম্বন করেই এঁরা স্বাবলম্বী হয়েছেন—এটাই দেখাতে হবে। তাঁদের কর্মপ্রচেষ্টা, তাঁদের শিক্ষাপ্রচেষ্টা, তাঁদের প্রস্তুত যন্ত্রপাতি, তাঁদের নির্মিত গৃহাদি, এসকলের মধ্যেই তাঁদের বিদ্যার পরিচয় ফুটে উঠবে। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্যে আগেই গ্রন্থাদি রচিত হবে না, বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর এখানেই নিজেদের প্রয়োজনীয় গ্রন্থাদি রচিত হবে। বহু গ্রন্থে সঞ্চিত যে-জ্ঞান রয়েছে, তাঁদের অভিজ্ঞতা থেকেই তা পাওয়া যাবে। যদি আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় এইভাবে সত্যিকারের কর্মপ্রচেষ্টাদ্বারা দেশের সামনে এক বাস্তব পরিকল্পনা উপস্থিত করতে ইচ্ছুক হয়ে থাকে, তাহলে নীরবে এই পথে কাজ করে যেতে হবে। এইরূপ প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে যে-বস্তুর উদ্ভব হবে, তা পৃথিবীর সকল দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে বিশেষভাবে কল্যাণকর বলে স্বীকৃত হবে। —('সর্বোদয়' থেকে)

আদর্শ বিদ্যালয়ের স্বরূপ

(তুমসর বিদ্যালয়ে)

ভারতবর্ষের দুরবস্থা

আমার মতে শিক্ষাক্ষেত্রে আজ বিজ্ঞান শিক্ষার প্রয়োজনই সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। ভারতবর্ষ যে কৃষিপ্রধান দেশ, এসম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু কেবলমাত্র কৃষিদ্বারাই এদেশের উন্নতি হবে না। য়ুরোপীয় রাষ্ট্রসমূহ শিল্পপ্রধান। ভারতবর্ষ কৃষিপ্রধান। কিন্তু ভারতে মাথাপিছু গড়ে মাত্র সওয়া একর জমি পড়ে। ফ্রান্সের পরিস্থিতি ভারতবর্ষের বিপরীত, শিল্পপ্রধান দেশ হওয়া সত্ত্বেও সেখানে মাথাপিছু গড়ে সাড়ে তিন একর জমি আছে। এ থেকেই ভারতবর্ষের দুর্দশা যে কত ভীষণ, তা অনুমান করা যায়। এই দুর্দশার কারণ, ভারতবর্ষ কেবলমাত্র কৃষির উপরই নির্ভরশীল। এখানে কৃষিব্যতীত অন্য শিল্পের প্রসার হয় নাই। এই অবস্থার পরিবর্তন করতে হলে এদেশের ছাত্র, শিক্ষক ও জনসাধারণ সকলকেই কোন-না-কোন উৎপাদক-শিল্পে নিপুণ হতে হবে। শিল্পনৈপুণ্য অর্জন করার জন্যে বিজ্ঞান-শিক্ষা নিতান্ত প্রয়োজন।

খাদ্য-বিজ্ঞান

রন্ধনশালাই আমাদের বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগার। রন্ধনকারীদের বিভিন্ন খাদ্যসামগ্রীর কেলরী, ভিটামিন ও স্নেহপদার্থের পরিমাণ সম্বন্ধে জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। কোন্ বয়সের লোকের কোন্ কাজের জন্যে কোন্ প্রকার খাদ্যের প্রয়োজন—এসমস্ত হিসাব করে বলে দেওয়ার মতো জ্ঞান তাঁদের থাকা চাই।

মল-বিজ্ঞান

মলত্যাগের প্রয়োজন সকলেরই আছে। কিন্তু শিক্ষার্থীদের মলসম্বন্ধীয় বিশদ জ্ঞানের প্রয়োজন আছে। মল কি প্রকারে কাজে লাগানো যায়, রৌদ্রে মলের কি পরিবর্তন হয়, মল উন্মুক্ত স্থানে পড়ে থাকলে কি ক্ষতি হয়, এদ্বারা কোন্-কোন্ রোগের প্রাদুর্ভাব হতে পারে, জমিতে মলজাত সার দিলে জমির উর্বরতা কি পরিমাণ বৃদ্ধি পায়—এই সমস্ত ব্যাপারের বিজ্ঞানসম্মত তথ্য মল-বিজ্ঞানের সহায়তায় ছাত্রদের শেখাতে হবে। আমি এ সম্বন্ধে এক সূত্র প্রণয়ন করেছি—'প্রভাতে মলদর্শনম্'। মলসম্বন্ধে আলোচনার দ্বারা আমাদের স্বাস্থ্যসম্বন্ধীয় জ্ঞান বৃদ্ধি পায় এবং দেহ মলাগার—এই কথা উপলব্ধি করে দেহাসক্তিও দূর হয়।

স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান

কোন ছাত্র অসুস্থ হলে তার রোগের কারণ অনুসন্ধান করতে হবে। রোগ বিনা কারণে কমই হয়, হয়তো গাঁটের কড়ি খরচ করেই রোগ আনা হয়ে থাকে। রোগকে অতিথির মতো দেখতে হবে। এ কেন এল, কোথা থেকে এল—এসব খোঁজ করতে হবে। যখন ইনি এসেই গেছেন, তখন যতটা পারা যায় তাঁর সম্বন্ধে জ্ঞান আহরণ করে নিতে হবে। রোগের মধ্যে অনেক কিছু শেখার আছে। জ্ঞানদাতা এলেন আবার চলেও গেলেন, আর আমি যে-তিমিরে সেই তিমিরেই থেকে গেলাম—অপরের পক্ষে সম্ভব হলেও হতে পারে, কিন্তু ছাত্রদের এরকমটি কখনও যেন না হয়।

খাদি-বিদ্যা

তোমরা এখানে সূতা কাট, কাপড়ও বুনে নাও। তোমাদের ধন্যবাদ জানাই। কিন্তু খাদিসম্বন্ধে যদি বৈজ্ঞানিক প্রশ্নের জবাব দিতে না-পার, তাহলে খাদি উৎপাদন-কেন্দ্র আর কারখানায় কী তফাৎ রইল? আমি তো কারখানার কারিগরদের কাছ থেকেও এই জ্ঞান আশা করব।

জ্ঞানদৃষ্টি প্রয়োজন

বিদ্যার্থীদের ভোজনে ও অন্যান্য লোকদের ভোজনের মধ্যে অনেক পার্থক্য থাকা উচিত। তাঁদের ভোজন জ্ঞানময় হওয়া চাই। যখন ছাত্ররা গম প্রভৃতি পিষবেন এবং পেষা হলে আটা ছাঁকবেন, তখন কতটা শস্যে কতটা ভূষি বের হল, তা লিখে রাখবেন। ধরা যাক এক সেরে ৮-তোলা ভূষি বেরিয়েছে। তাহলে এতে শতকরা দশভাগ ভূষি বেরোল। এ অনেক বেশী বেরিয়েছে! পরদিন প্রতিবেশীর ঘরে গিয়ে সেখানে কত গমে কত ভূষি বেরোল, তা দেখবেন। ধরুন দেখা গেল যে, প্রতিবেশীর আটায় সেরে মাত্র আড়াই তোলা ভূষি বেরিয়েছে। শতকরা দশভাগ ভূষি বেরিয়ে গেলে ক্ষতি কি? অতটা ভূষি খেলে ক্ষতি কি?—এসব প্রশ্ন ছাত্রের মনে উদয় হওয়া উচিত এবং এসব প্রশ্নের সঠিক উত্তরও তাঁদের পাওয়া চাই। তাহলেই গীতায় যেমন বলা হয়েছে, তেমন সব কাজই জ্ঞান-সাধন হয়ে উঠবে।

শিল্পে বিজ্ঞান

এই প্রকার সমস্ত কাজ প্রয়োগ-বুদ্ধি ও জ্ঞান-দৃষ্টির সহায়তায়

করলে কিছু খরচ অবশ্যই হবে, কিন্তু তা ঐ কাজের সাহায্যেই রোজগার করে পুষিয়ে নেওয়াও যাবে। বিদ্যালয়ে যে-চরখায় সূতা কাটা হবে, তা উৎকৃষ্ট হতে হবে। যেমন তেমন চরখায় কাজ হবে না। স্কুলে কাজ কিছু কম হলে ক্ষতি নেই। কিন্তু যতটুকু কাজ হবে, তা আদর্শস্থানীয় হওয়া চাই। সূতা কাটার জন্যে প্রথমে তুলা ওজন করে নিতে হবে। বীজ বের করবার পর বীজ ওজন করতে হবে। প্রশ্ন হবে, এত বিভিন্ন জাতের কাপাস বীজের ওজন কম বেশী কেন? সে-প্রশ্নের যথারীতি উত্তর দিতে হবে। বীজের আকার মটরের মতো হওয়া সত্ত্বেও উভয়ের ওজনে এত পার্থক্য কেন? উত্তর—বীজে তেল থাকাতে তা মটরের চেয়ে হাল্‌কা হয়। আবার কাপাস-বীজের মতো হাল্কা শস্যের দানা খুঁজে বের করতে হবে। এসব ওজনের জন্যে যে-দাঁড়িপাল্লা ব্যবহার হবে, তা-ও স্কুলেই তৈরী করতে হবে। এমনি করে প্রত্যেক কাজেই যদি তুলনামূলক বিচার প্রভৃতি অভ্যাস করা হয়, তাহলে বিজ্ঞান-শিক্ষা এতেই শুরু হয়ে যাবে। এমনি করে যদি সব ব্যাপার জীবন্তভাবে চর্চা করা হয়, তাহলে জ্ঞান কত-না আনন্দদায়ক হয়ে ওঠে। তাহলে কে আর অধীত বিষয় ভুলবে? আকবর কোন্ সালে মারা গিয়েছিলেন, সে-কথা মুখস্থ করে লাভ কি? তিনি তো দেহমুক্ত হয়ে এলোক থেকে অপসৃত হয়েছেন। তবে আর আমাদের বুকে চেপে বসে থাকার হেতু কি? মানুষ ইতিহাস মুখস্থ করার জন্যে জন্মায়নি, সে জন্মেছে ইতিহাস সৃষ্টি করার জন্যে।

বিজ্ঞান ও অধ্যাত্ম

দুইটি বিষয়ে শিক্ষা লাভ করা প্রয়োজন ঃ—(১) আমাদের চারিদিকে যে-সব বস্তু রয়েছে, তাদের পরীক্ষা করে দেখার উপায় অর্থাৎ বিজ্ঞান, (২) আত্মজ্ঞান অর্থাৎ আধ্যাত্মিকতা। এরজন্যে ভাবপ্রকাশের বাহন ভাষাশিক্ষারও প্রয়োজন আছে। ভাষাজ্ঞান মোটামুটি হলেই কাজ চলে যায়। ভাষা ডাকপিওনের কাজ করে। চিঠিতে যদি কিছু লেখা না-হয়, তাহলেও পিওন সে চিঠি পৌঁছে দেবে। ভাষা বিদ্যার বাহন। বিজ্ঞান ও অধ্যাত্মই বিদ্যা। এ সম্বন্ধে আমরা আলোচনা করব। চরখা যদি ভেঙ্গে যায়, তবে কি বসে-বসে কাঁদতে হয়? সূত্রধরের কাছে গিয়ে চরখা ঠিক করে নিতে হয়। ঠিক তেমনি বৃশ্চিক দংশনে বসে-বসে কাঁদা নিরর্থক। যাতে ঔষধপ্রয়োগে জ্বালার উপশম হয় তাইতো তখন করা চাই। ভাষাকে কাজে লাগানোই আদর্শ বিদ্যালয়ের লক্ষ্য। বিশদভাবে ভাষা শেখাবার প্রয়োজন নেই, সে-সম্বন্ধে পরীক্ষা নিয়েও লাভ নেই। কথাবার্তা থেকেই শিক্ষার্থীদের ভাষাজ্ঞান আন্দাজ করা যাবে।

বিদ্যালয়গুলি সাজিয়ে তোল

স্কুলের প্রত্যেকটি কাজ জ্ঞানলাভের উপায় হওয়া চাই। এইজন্যে স্কুলের ব্যবস্থাদি উৎকৃষ্ট হতে হবে। ভাল-ভাল যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য উপকরণ যোগাড় করতে হবে। শ্রীরামদাস স্বামী বলেন, 'ঈশ্বরের বৈভব বাড়াও।' জনসাধারণের কেবল নিজেদের বাড়ীঘর সাজানোর দিকে দৃষ্টি না-থেকে স্কুল সাজানোর দিকেও দৃষ্টি থাকা

চাই। অবশ্যি প্রয়োজনীয় উপকরণ ও যন্ত্রপাতি যথাসময়ে স্কুলের পাওয়া চাই।

কথাগুলি আমি আমার স্বীয় অভিজ্ঞতা থেকে বললাম। তোমাদের মণ্ডলী এদ্বারা উপকৃত হবে, এই আমার আশা।

—('জীবন-দৃষ্টি' থেকে)

সেবাগ্রামের পরীক্ষা

আজ সকালে সেবাগ্রামে গিয়েছিলাম। সেখানে 'তালীমী-সংঘে' এক গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষা চলছে। শিক্ষার্থীরা খাদ্যশস্য ও শাকসব্জি নিজেরাই উৎপন্ন করছেন। আর ফলের বাগান করে কিছু ফল উৎপাদনের চেষ্টাও চলছে। সূতাকাটা থেকে আরম্ভ করে বুনাই পর্য্যন্ত সব কাজ নিজের হাতে করে কাপড় তৈরী করা হচ্ছে। নিজেরা গম ভেঙ্গে আটা করে নিচ্ছেন আর রান্নাও নিজেরাই করছেন। নিজেদের ঘানিতে তেল হচ্ছে। এখন আবার মাটির বাসন তৈরী করার আয়োজন হচ্ছে। নিজেদের খরচের হিসাব তাঁরা নিজেরাই রাখেন। আর উপরোক্ত সব কাজ করার জন্যে বহুপরিশ্রম করে তাঁরা শিক্ষাও গ্রহণ করছেন। এঁদের এইসব কাজকর্ম দেখে আমার ইচ্ছা হয়, এঁদের সঙ্গে আমি নিজেও কাজে নেমে পড়ি।

জ্ঞান ও কর্ম

এই শিক্ষাপদ্ধতি অবলম্বন করাতে শিক্ষাপদ্ধতি সম্বন্ধে অনেক

বিরোধ মিটে গিয়েছে। শিক্ষাপদ্ধতি সম্বন্ধে বিচার করতে গিয়ে অনেকে বলেন যে, জ্ঞানের সঙ্গে কর্মের বিরোধ আছে। কেউ-কেউ বলেন যে. বিরোধ নেই, তবে জ্ঞান ও কর্মের মধ্যে পার্থক্য আছে। আবার কেউ-কেউ বলেন যে, পার্থক্য তো আছেই, কিন্তু উভয়ের মিলন ঘটানো দরকার। কিন্তু সেবাগ্রামের পদ্ধতিতে জ্ঞান ও কর্ম এক হয়ে গিয়েছে। এখানে কর্ম থেকে জ্ঞানলাভ হয়, জ্ঞানের দ্বারা কর্ম সম্পন্ন হয় এবং জ্ঞান ও কর্ম সাধনের দ্বারা চিত্ত বিকশিত হয়ে ওঠে। বাইরে কর্ম চলতে থাকে আর অন্তরে জ্ঞান উৎসারিত হয়। জ্ঞান ও কর্মের এই সাধনায় শিক্ষক নিমিত্তমাত্র হয়ে থাকেন।

নূতন পদ্ধতি থেকে কি লাভ হয়

উপরোক্ত আলোচনা থেকে কেউ যেন মনে না করেন যে, সেবা-গ্রামে যা কিছু হচ্ছে, সবই দোষশূন্য। সেখানকার ত্রুটি-বিচ্যুতির কথা আমার অজানা নেই। কিন্তু সেবাগ্রামে যে-পন্থা অনুসৃত হচ্ছে, তা সম্পূর্ণ ত্রুটিহীন। এইজন্যেই সেবাগ্রাম সম্বন্ধে আমি নিশ্চিন্ত। ভারতের সর্বত্র এই শিক্ষাপদ্ধতি গৃহীত হলে উচ্চ-নীচ, ধনী-দরিদ্র প্রভৃতির মধ্যে যে প্রভেদ আছে, তা দূর হয়ে যাবে। শ্রমের মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হবে। এই শিক্ষা থেকে সমাজ লাভবান হবে। যাঁরা এই শিক্ষা পাবেন তাঁরা সমাজের উত্তম সেবক হবেন, উত্তম রক্ষক হবেন। এই শিক্ষার ফলে প্রত্যেক গ্রাম স্বাবলম্বী হবে।

নানাবিষয় সম্বন্ধে জানা ও বিকাশ

কিন্তু আমাদের দেশে জনসাধারণ আজও এ সম্বন্ধে বিশেষ কোন

চিন্তা করছেন না। প্রচলিত শিক্ষাপদ্ধতি অনুসারে যাঁরা শিক্ষা পেয়েছেন, তাঁরা শিক্ষা অর্থে নানাবিষয় সম্বন্ধে কিছু-কিছু জানা ছাড়া আর কিছুই বোঝেন না। তাঁরা ছেলেদের জিজ্ঞাসা করেন, 'অমুক বিষয় সম্বন্ধে কি কি জানলি?' তাঁরা একথা বুঝতে পারেন না যে, জানার সঙ্গে শিক্ষা এবং চিত্তবিকাশের কোন সম্বন্ধ নেই। ছেলেরা যদি এমন যোগ্যতা অর্জন করে, যার দ্বারা দরকার হলে নানাবিষয়ে জানতে পারবে, তা হলেই তো হল। সেই যোগ্যতা দান করাই শিক্ষার কাজ। কিন্তু প্রধান বিষয় হল সত্যনিষ্ঠা, কর্মকুশলতা, সেবা-ভাব প্রভৃতি গুণ। শিক্ষা-বিজ্ঞানে এ সম্বন্ধে বিশেষ অনুসন্ধান হওয়া প্রয়োজন।

পিতা-মাতারা চিন্তা করুন

ঈশ্বর যাঁদের হাতে সন্তানের ভার দিয়েছেন, তাঁরা যদি এই পদ্ধতি উত্তমরূপে অনুধাবন করেন, ছেলেমেয়েদের এই শিক্ষা পদ্ধতিদ্বারা শিক্ষা দিতে প্রস্তুত হন, তাহলে খুব ভাল হয়। অধিকাংশ স্থলে দেখা যায় যে, যিনি পরিকল্পনা রচনা করেন তাঁর ছেলেমেয়েরা পরিকল্পনা অনুযায়ী শিক্ষাপদ্ধতি অনুসরণ করে না। অন্যের ছেলেমেয়েদের জন্যে আমরা পরিকল্পনা রচনা করে থাকি। ফলে, পরিকল্পনাটি মূল্যহীন হয়ে পড়ে। আমরা যদি নিজের-নিজের ছেলেমেয়েদেরও নতুন শিক্ষাপদ্ধতি অনুসারে শিক্ষাদান করি, তাহলে নতুন পদ্ধতি দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হতে পারে এবং সমগ্র ভারতবর্ষে এই পদ্ধতি ছড়িয়ে পড়তে দেরী হয় না। কারণ, শিক্ষা এমনই বস্তু, যারজন্যে বিস্তারের চেয়ে গভীরতারই বেশী

প্রয়োজন। যদি দুই-একটি জায়গায়ও শিক্ষাপদ্ধতির গভীরভাবে প্রয়োগ করা হয়, তাহলে আপনা থেকেই সর্বত্র এর প্রচার হয়ে যাবে। এইজন্যে রাষ্ট্র নতুন শিক্ষাপদ্ধতি প্রচলনের জন্যে কী করছে, সে-চিন্তা ছেড়ে দিয়ে আমরা নিজেরা যদি এ সম্বন্ধে আগ্রহান্বিত হই আর নিজেদের সন্তানদের এই পদ্ধতি অনুসারে শিক্ষা দিই, তাহলে তাতে খুব বড় কাজ হবে। —('সেবক', মার্চ ১৯৪৮)

নিত্য-নতুন শিক্ষা

অল্পবয়স্কদের শিক্ষাদান বড়ই কল্যাণকর কাজ। বহু বছর ধরে সেবাগ্রামে এ কাজ চলছে। এই শিক্ষাকে নঈ-তালীম বলা হয়। আমি একে 'নিত্য-নব শিক্ষা' নাম দিয়েছি। অর্থাৎ গতকাল যে-শিক্ষা ছিল, আজ তা নেই। আর আজ যা আছে, আগামী কাল তা থাকবে না। ঠিক যেন নদীর জলধারা। নদী প্রবাহিত হয়ে চলে, কিন্তু প্রতিক্ষণেই পূর্বের জলস্রোতের জায়গায় নতুন জলস্রোত এসে পড়ে। ঠিক তেমনি প্রতিদিনের নব-নব উপলব্ধির সঙ্গে-সঙ্গে যা বার-বার বদলাচ্ছে, তা-ই নিত্য নব শিক্ষা।

কৃত্রিম কাঠামো অকর্মণ্য

সাধারণত শিক্ষার এক ছাঁচ (ঢাঁচা) তৈরী করে তবে শিক্ষার কাজ আরম্ভ হয়। কাঠামো বা ছাঁচ তৈরী হলে শিক্ষা অস্বাভাবিক হয়ে যায় (বিগড়ে যায়)। এইজন্যে আমি সংকল্প

করেছি যে, আমার জীবনে এরকম কোন পূর্বপরিকল্পিত কাঠামো গড়ে উঠতে দেব না। জীবনে নিত্য নব-নব অভিজ্ঞতার সঞ্চার হচ্ছে। এই অভিজ্ঞতা অনুসারে জীবনকে গড়ে তোলার শক্তি চাই।

পাঠ্যপুস্তক স্থানীয় হবে

আমি বুনিয়াদী-শিক্ষা সম্বন্ধে আলোচনা আরম্ভ করেছিলাম। এবার পূর্ব-বুনিয়াদীতে যাচ্ছি। এতেও গাঁয়ের দিকে দৃষ্টি রেখে কাজ করে যেতে হবে। তাই পুরানো চিন্তাধারা এতে কোন কাজে আসবে না। প্রত্যেক গাঁয়ের অবস্থা আলাদা-আলাদা হয়ে থাকে। এইসব অবস্থার দিকে নজর রেখে শিক্ষার কথা ভাবতে হবে। যে-গ্রাম নদীতীরে অবস্থিত সেই গ্রামে একভাবে শিক্ষা দিতে হবে, আর পার্বত্যপ্রদেশের গ্রামে অন্যভাবে শিক্ষা দিতে হবে। আবার অরণ্য-প্রান্তের গ্রামের শিক্ষা উপরোক্ত দুইটি গ্রামের শিক্ষা থেকে ভিন্ন হবে। প্রত্যেক গ্রামের পরিবেশ অনুসারে ভিন্ন-ভিন্ন রকমের শিক্ষা দেওয়া হবে। একই রকমের শিক্ষার কাঠামো, কিম্বা একই ধরণের বই সব গ্রামের উপযোগী হবে না। আজকাল তো প্রাদেশিক সব স্কুলে একই পাঠ্যপুস্তক নির্বাচিত হয়। এইসব বইয়ে ভিন্ন-ভিন্ন গ্রামের বৈশিষ্ট্যের কোন উল্লেখ থাকে না। এইসব বই সাধারণভাবের হয়ে থাকে, এতে কোন বিশিষ্টতা থাকে না। এইজন্যে ছেলেপিলেরা এইসব বই পড়ে আনন্দ পায় না, আর বইগুলি তাদের গ্রামের বিশেষ কোন প্রয়োজনেও লাগে না।

জীবন্ত ইতিহাস ও ভূগোল

নঈ-তালীমের বিদ্যালয়গুলিতেও পাঠ্যপুস্তকের প্রয়োজন রয়েছে। কিন্তু ভিন্ন-ভিন্ন গ্রামের অবস্থা বিবেচনা করে ভিন্ন-ভিন্ন পাঠ্যপুস্তক রচনা করতে হবে। যে-গ্রামের জন্যে বইটি লেখা হবে, সেই গ্রামের পরিবেশটি বই-এ বেশ ভাল করে ফুটে ওঠা চাই। মনে করুন, সেবাগ্রামের বিদ্যালয়ে ইতিহাস পড়ানো হবে। তাহলে যে-ইতিহাসের বই সেখানে পড়ানো হবে, তাতে সেবাগ্রামের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ইতিহাস থাকবে। সেবাগ্রামের উৎপত্তির ইতিহাস থাকবে। গ্রামের প্রাচীন ব্যক্তিদের নানা কাহিনীও সেই বই-এ সংগৃহীত হবে। এমনি করে এক জীবন্ত ইতিহাস-পুস্তক রচিত হবে। ভূগোল শিক্ষাও সেবাগ্রামের চতুর্দিকের ভূমিবিবরণ থেকে আরম্ভ করতে হবে। যে-গ্রামে আমি আছি, সেই গ্রাম আমার চোখে সমগ্র পৃথিবীর কেন্দ্রবিন্দু। কারণ আমার বাসস্থানের চতুর্দিকেই তো বাইরের জগত বিস্তৃত হয়ে আছে। এই মনে রেখে নঈ-তালীমের ভূগোল রচিত হবে।

নিত্য পরিবর্তনশীলতা

উপরোক্ত সিদ্ধান্তে আজ আমি উপস্থিত হয়েছি। আমি নিত্য নতুন অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করব আর সেই অনুসারে কাজ করে যাব। পুরানো অভিজ্ঞতা অনুসারে একটা জিনিস গড়ে তোলার পর নতুন অভিজ্ঞতার আলোকে পরীক্ষা করে পুরানো জিনিস ভেঙ্গে আবার নতুন করে গড়ে তুলতে হবে। এভাবে গড়া আর ভাঙ্গার কাজ বরাবর চলতে থাকবে।

শিক্ষার তত্ত্ব

আমাকে যদি কেউ জিজ্ঞাসা করেন, অল্পবয়স্কদের শিক্ষার তত্ত্বটি কি? তাহলে অল্পকথায় তাঁকে বলব, 'শিক্ষা যিনি দিচ্ছেন সেই শিক্ষককে ছোট শিশু হতে হবে আর শিক্ষা নিচ্ছে যে-শিশু তাকে বড় হতে হবে। শিক্ষক যদি শিশু হয়ে যেতে না পারেন, তাহলে বুঝতে হবে তিনি শিক্ষা দিচ্ছেন না। আর ছাত্র যদি বড় না হয়, তাহলে বুঝতে হবে তার শিক্ষালাভ হচ্ছে না।'

প্রার্থনা ও মাতৃভাষা

শিশু যেসব কাজ করবে সেসব কাজের সঙ্গে আমাদের দৈনন্দিন জীবনের যোগ থাকা চাই। এইসব কাজের পশ্চাতে যেসব যুক্তি রয়েছে, শিশুদের তা বুঝিয়ে দিতে হবে। যথা, আমাদের প্রতিদিনকার প্রার্থনা শিশুর মাতৃভাষায় হওয়া উচিত। কোরাণ আরবীতে পড়লে পুণ্য হবে আর মারাঠীতে পড়লে নষ্ট হয়ে যাবে—এরকম মনে করা ঠিক নয়। এই কথা বেদের মন্ত্র এবং অন্যান্য প্রার্থনা সম্বন্ধেও প্রযোজ্য। প্রার্থনা যখন শিশুদের মাতৃভাষায় হয়, তখনই তারা প্রার্থনার অর্থ হৃদয়ঙ্গম করতে পারে। প্রার্থনার অর্থ না বুঝলে প্রার্থনার কোন বিশেষত্ব থাকে না।

শিক্ষকদের ট্রেনিং

এখানে বিভিন্ন প্রদেশ থেকে ট্রেনিং নেবার জন্যে যেসব শিক্ষক আসেন, তাঁদের জন্যে কিছু অভ্যাসক্রম থাকে। তাঁরা নঈ-তালীম সম্বন্ধে লেকচার শুনে থাকেন। আমি কিন্তু আজকে আপনাদের কাছে যা বললাম, সেইসব শিক্ষকদের কাছে নঈ-তালীম সম্বন্ধে

বলতে গিয়ে সারাবছরে তার চেয়ে বেশী বলতাম না। আমি তাঁদের একটি ভাষণ দিয়ে বলতাম, 'আপনারা এখন কাজে লেগে যান। আর প্রতিদিন কাজের শেষে, কাজের মধ্যে যেসমস্ত সমস্যার উদ্ভব হবে, সেসব নিয়ে সন্ধ্যাবেলা আপনাদের সঙ্গে আলোচনা করব।' বি. এ., এম এ. প্রভৃতি ক্লাশে আজ পর্যন্ত তাঁরা কেবল লেকচারই শুনেছেন। আর এখানে বসেও যদি তাই শুনতে থাকেন, তাহলে তাঁরা এখানেও যথার্থ শিক্ষালাভে বঞ্চিত হবেন। আমি এসব শিক্ষকদের বলব, 'আপনারা গভর্ণমেণ্ট থেকে যে-বৃত্তি পান, তার সবটাই বাড়ী পাঠিয়ে দিয়ে একমাস নিজেদের গ্রাসাচ্ছাদনের জন্যে প্রয়োজনীয় অর্থ শ্রমের দ্বারা অর্জন করুন।' আমি তাঁদের জিজ্ঞাসা করব, 'আপনারা কি সারাদিনে দশ-বার গজ কাপড় বুনতে পারেন?' তাঁরা যদি এর উত্তরে বলেন, 'আমরা তো নিজের হাতে বুনতে জানিনা, তবে বুনবার থিওরীটা (তত্ত্ব) জানি'—তাহলে আমি তাঁদের বলব, 'আপনারা তো খাওয়ার থিওরী জানেন, তবে রোজ খান কেন?' এর তাৎপর্য হচ্ছে, আমাদের বিদ্যা কেবল শব্দ-বিদ্যা হবে না, বীর্যবতী হবে।

পুরাতন শিক্ষার মোহ

কিন্তু আসল কথা হচ্ছে আমাদের মনের উপর পুরানো শিক্ষার প্রভাব এখনও পুরামাত্রায় বজায় আছে। এখানে শিক্ষার্থীরা রান্না, সূতাকাটা, কাপড় বোনা প্রভৃতি শেখে। তবু পুরানো পদ্ধতিতে যারা শিক্ষা পাচ্ছে সেসব ছেলেদের সঙ্গে তুলনা করে এদের শিক্ষার মান নির্ণয় করা হয়। কিন্তু অন্যান্য স্কুলের ছেলে-

মেয়েদের সঙ্গে কি আমাদের ছেলেমেয়েদের তুলনা করা সম্ভব? আমাদের ছেলেরা শুধু-যে ভাল সাঁতার দিতে পারে তাই নয়, তারা জলমগ্ন লোককে রক্ষা করতেও পারে। বাইরের ছেলেরা কি এরকম সাঁতার দিতে পারবে? ওরা ডুবতে নিশ্চয় পারবে। লেখাপড়ার কোন মূল্য নেই একথা আমি বলছি না। তবে বহুরকমের মধ্যে লেখাপড়া তো মাত্র একরকমের শিক্ষা। একে এত বেশী গুরুত্ব কেন দেওয়া হয়?*
—('সেবক' মার্চ ১৯৫০)

গ্রামের আনন্দক্ষেত্র

কাল প্রার্থনান্তিক ভাষণে বলেছিলাম—আপনারা ভারতবর্ষের নূন খেয়েছেন, আপনারা যদি এদেশের উন্নতিসাধন করতে না পারেন, তাহলে এমন কেউ নেই যাঁর দ্বারা একাজ হতে পারে। যাঁরা গভর্ণমেণ্টের কাজে যোগ দিয়েছেন, তাঁরা অবশ্য আমাদের চেয়ে অনেক ভাল। কিন্তু গভর্ণমেণ্ট তো আর সব কাজ করতে পারেন না। নঈ-তালীম সম্বন্ধেও একথা খাটে। গভর্ণমেণ্ট হয়তো নঈ-তালীম সম্পর্কিত কোন-কোন কাজের ভার নিতে পারবেন, আবার কোন-কোন কাজ করতে পারবেন না।

* সেবাগ্রামে ১৯-২-৫০ তারিখে বুনিয়াদীশালার ভিত্তিস্থাপন উপলক্ষে প্রদত্তভাষণ।

নঈ-তালীম সর্ব সংগ্রাহক

নঈ-তালীম এত ব্যাপক যে, এরমধ্যে দেশসেবামূলক সবরকম কাজই এসে যায়। এখনই এখানে 'সর্ব-সেবা-সংঘ' গঠিত হয়েছে। এই প্রসঙ্গে নায়কম্‌জী (আর্যনায়কম্) বলেছেন, 'নঈ-তালীমই তো সর্ব-সেবা-সংঘ, ভিন্ন সর্ব-সেবা-সংঘ সংগঠনের আর দরকার কি ?' আমি নঈ-তালীম সম্বন্ধে তাঁর এই যুক্তি স্বীকার করি। তবে সর্ব-সেবা-সংঘের পরিকল্পনা অন্যরকম। প্রত্যেক বিভিন্ন সংঘের কর্ম-শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ করবার জন্যে সর্ব-সেবা-সংঘ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

'তালীমী-সংঘ' ও 'নঈ-তালীম'

তালীমী-সংঘ আর নঈ-তালীম এক জিনিস নয়। তালীমী-সংঘ নঈ-তালীমের তুলনায় অনেক ছোট। তালীমী-সংঘ নিশ্চয়ই শিক্ষা-ক্ষেত্রে সার্থকতা অর্জন করবে। কিন্তু শিক্ষার আদর্শ নিজে যতটা রূপায়িত করতে পারবে তালীমী-সংঘ ততটুকুই লোকের কাছে তুলে ধরতে পারবে। আমি প্রথমেই আপনাদের বলে রাখছি, তালীমী-সংঘ প্রদর্শিত পথের উপর আপনারা খুব গুরুত্ব দেবেন না। নিজের-নিজের স্বাধীন বিচারবুদ্ধির উপর আপনাদের নির্ভর করতে হবে।

প্রাচীনপন্থীরা সংকীর্ণ

মনে রাখতে হবে যে, নঈ-তালীমের প্রযোজকেরা সকলেই অনভিজ্ঞ। আমরা তো সকলেই পুরানো শিক্ষাপদ্ধতি অনুসারে শিক্ষা পেয়েছি। একথা সত্য যে, পুরানো শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়া সত্ত্বেও শিক্ষা সম্বন্ধে আমাদের নতুন দৃষ্টিভঙ্গী হয়েছে—কিন্তু তাতে

আমরা দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে সংকটের সম্মুখীন হয়েছি। আমাদের অবস্থার সঙ্গে নরসিংহ অবতারের তুলনা করা যেতে পারে। বরাহ অবতারে অভিব্যক্তির পথে পশুভাবের প্রকাশ দেখতে পাই। নরসিংহ অবতারে মনুষ্যত্ব বিকাশের পূর্বের অবস্থা—অর্ধেক মানুষ অর্ধেক পশু—প্রকাশ পেয়েছে। তারপর বামন অবতার মনুষ্যত্বের আদর্শের প্রতীকরূপে আবির্ভূত হয়েছেন। বরাহ ও বামন অবতারের মাঝখানে নরসিংহ অবতার অসুন্দরের প্রতীক। আমাদের অবস্থাও নরসিংহ অবতারের মতো মাঝামাঝি অবস্থা। সকল অপূর্ণ অবস্থাই অসুন্দর। শিক্ষার অভিব্যক্তির পথে আমাদের মধ্যে নিম্নস্তরের শিক্ষার সঙ্গে উচ্চস্তরের শিক্ষাদানের মিলন হওয়াতে এই অপূর্ণতা তথা অসুন্দরের উৎপত্তি ঘটেছে।

নঈ-তালীম ও অর্থ

আমার মতে যে-শিক্ষাপদ্ধতি আমরা প্রতিষ্ঠিত করতে চেষ্টা করছি, তাতে এক পয়সাও খরচ হওয়া উচিত নয়। ভগবদ্গীতায় বলা হয়েছে ঃ 'ত্যক্ত সর্ব পরিগ্রহঃ। শারীরং কেবলং কর্ম'—সম্পূর্ণরূপে অপরিগ্রহী হয়ে শারীরিক কর্ম কর।

মনে করুন, আপনি এক গ্রামে নঈ-তালীম প্রচার করতে গিয়েছেন। সেখানে আপনি নিশ্চয় স্থানীয় শ্রমিকদের সঙ্গে চাষের কাজ করে নিজের ভরণ-পোষণ নির্বাহ করবেন। নঈ-তালীমের উত্তম শিক্ষক হতে হলে এভাবে শরীর-শ্রমদ্বারাই জীবিকা নির্বাহ করতে হবে। প্রাচীনকালে শ্রেষ্ঠ গুরুরা এইভাবেই শ্রম করতেন। কবীর ছিলেন এমনি এক উত্তম শিক্ষক। ভারতবর্ষ

আজও তাঁর শিক্ষা বিস্মৃত হয় নাই। আরেকজন শ্রেষ্ঠ শিক্ষক ছিলেন বল্লুবন। ইনি তামিলনাডের সর্বশ্রেষ্ঠ গুরু। ভক্ত নামদেব দর্জীর কাজ করতেন, কবীর ও বল্লুবন কাপড় বুনতেন। পুরাকালে অন্যান্য অনেক সাধু-সন্ত ছিলেন যাঁরা কোন-না-কোন শরীর-শ্রমের দ্বারা জীবিকা অর্জন করতেন। তাঁদের সকলেরই উপদেশের মর্ম হচ্ছে—'মুখে ভগবানের নাম কর আর হাতে উৎপাদক কর্ম কর।' এইজন্যেই পূর্বে উল্লেখ করেছি যে, গ্রামে গিয়ে ক্ষেতে কাজ করলে জীবন সার্থক হবে।

গ্রামে নঈ-তালীম

গ্রামে যেতে লোকেরা ভয় পায়। গ্রামের প্রেমপূর্ণ জীবনের তুলনায় শহরবাসীদের জীবন কতই-না ভাবসম্পদশূন্য ও শুষ্ক। গ্রামের লোকেরা পরস্পরের সঙ্গে নিবিড়ভাবে যুক্ত আর শহরে একে অন্যের থেকে বিযুক্ত হয়ে পৃথক-পৃথক বাস করে। শহরে আপন-আপন স্বার্থসিদ্ধির জন্যে বহুলোক একত্রিত হয়েছে ; এই ভাব থেকে এক কবি বলেছেন, 'ভগবান সৃষ্টি করেছেন গ্রাম আর মানুষ সৃষ্টি করেছে শহর।' শিক্ষিত লোকেরা শ্রমিকদের মধ্যে গিয়ে কাজ করলে নিজেরাও শিক্ষা লাভ করতে পারবেন আর শ্রমিকদেরও শিক্ষা দিতে পারবেন। দুপুরে কিম্বা রাত্রে যখন সময় পাওয়া যাবে, সেই সময় ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া শেখানো যেতে পারে। ক্ষেতের কাজ ছাড়া অন্যান্য কাজও বিনা পয়সায় হতে পারে। চরখায় সূতা কাটতে হলে চরখা কিনতে হবে। কিন্তু ১৫-দিনেই সূতা কেটে চরখার দাম উঠিয়ে ফেলা যায়, আর

তকলীর দাম তো একদিনের কাজ থেকেই আদায় হয়ে যাবে। ছোট-ছোট হাতিয়ারের এই গুণ। তাছাড়া এসব যন্ত্রপাতি নিজের হাতেও তৈরী করে নেওয়া যায় আর এসব তৈরী করার শিক্ষাও নঈ-তালীমের এক বিশেষ অঙ্গ হতে পারে। শারীরিক শ্রম করবার ঐকান্তিক ইচ্ছা, গ্রামের ভাইদের প্রতি প্রেমের ভাব, কার্য-কুশলতা ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে গ্রামে যেতে হবে এবং সেখানকার পরিস্থিতি অনুসারে আপন বিবেচনা অনুযায়ী এখনই নঈ-তালীম শুরু করে দিতে হবে।

ছুটি সম্বন্ধে মতামত

আগে উল্লেখ করেছি যে, চাষের কাজ দিয়েই গ্রামের জীবন শুরু করতে হবে। আমাদের স্কুলে যে-সময় ছুটি হয় সেসময় চাষের কাজ হয় না। ইংরেজের থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে আমরা যে গরমের ছুটি পেয়েছি, তা আজও আমরা বজায় রেখেছি। তাঁদের কাছে আমরা শিখেছি যে, গরমের সময় কাজ কম হয় আর এনার্জীও (উৎসাহ) কমে যায়। কিন্তু গ্রীষ্মপ্রধান দেশেই নানারকম মজবুত গাছ পাওয়া যায়। এইজন্যে স্কুল ছুটি দিতে হলে বর্ষাকালে দেওয়া উচিত। আমার মতে ছুটি কথাটাই ভুল। কারাগারে ছুটির অর্থ বোঝা যায়। আর যেহেতু আমাদের পুরানো স্কুলগুলি জেলাখানার মতোই ছিল, সেজন্যে সেসব স্কুলে ছুটির দরকার হত। কিন্তু নঈ-তালীম বিদ্যালয়ে একদিনের জন্যেও ছুটি না হওয়া উচিত। জ্ঞানে যদি আনন্দ পাওয়া যায়, তাহলে বিদ্যালয়ে ছুটির আর কী অর্থ থাকে ?

বুদ্ধির দ্বারা ক্রান্তি

যখন আমি 'সুরগাঁ'-এ মেথরের কাজ করতাম, তখন প্রতিদিন 'পওনা'র থেকে হেঁটে তিন মাইল দূরে সেখানে যেতাম। যেদিন বৃষ্টি হত সেদিনও কামাই ছিল না। বৃষ্টির মধ্যে আসতে দেখে সুরগাঁ-এর লোকেরা বলত, 'এত বর্ষায় কেন এলেন?' আমি বলতাম, 'অন্য কাজে ছুটি চলে কিন্তু মেথরের কাজে ছুটি হলে চলবে কেন?' সূর্যদেব আমার আদর্শ ছিলেন। সূর্যদেব তো সর্বশ্রেষ্ঠ ভাঙ্গী। আমরা চারদিক এত নোংরা করে রাখি যে, ভারতের রোদ যদি কড়া না হত তো কবে আমরা মরে শেষ হয়ে যেতাম। দুঃখের বিষয় ৯-দিন অসুখের জন্যে আমাকে অনুপস্থিত থাকতে হয়েছিল, তাই সম্পূর্ণরূপে সূর্যদেবের অনুকরণ করতে পারিনি। কিন্তু এই কাজের প্রভাব গ্রামবাসীদের উপর পড়ল। তারা মেথরের কাজকে অত্যন্ত পবিত্র কাজ বলে বুঝে নিল।

গণেশ-উৎসবের দিন গ্রামে গিয়ে দেখি আমি পৌঁছাবার আগেই সারা গ্রামের ময়লা পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে। সকাল ৭-টায় পৌঁছে দেখলাম তার আগেই সব কাজ শেষ। জিজ্ঞাসা করলাম, 'এত ময়লা কে পরিষ্কার করল?' গ্রামবাসীরা বললেন, 'আজ গণেশ-উৎসবের দিন একটা পবিত্র কর্ম সম্পাদন করা উচিত মনে করে গ্রামের তরুণেরা একাজ করেছে।' এরই নাম ক্রান্তি। এইপ্রকার বিপ্লব কোন রাষ্ট্রক্ষমতাদ্বারা সংঘটিত হওয়া সম্ভব নয়। এইজন্যে কাল যখন শুনলাম, একমাত্র রাষ্ট্রশক্তিই সমাজ-বিপ্লব ঘটাতে পারে, তখন একথা আমার কাছে সত্য মনে হল না। আমার

তো মনে হয়, আসল ব্যাপার ঠিক এর উল্‌টো। কোন রাষ্ট্রই বিপ্লব আনতে পারে না। বিপ্লব ঘটানো রাষ্ট্রের কর্তব্যের অন্তর্গত নয়।

আমার মতে উপরোক্ত প্রকারের বিপ্লব তালীমী-সংঘও ঘটাতে পারবে না। বোধের দ্বারাই এই ক্রান্তি হবে। তালীমী-সংঘ তো অচেতন। তাই বোধের দ্বারা যে-ক্রান্তি হওয়া সম্ভব, তা শুধু চেতন আত্মা ঘটাতে পারে। অচেতন সংঘ কি করে এইরকম ক্রান্তি আনবে? মনে রাখতে হবে, বৃহৎ হলেও সংঘ অচেতন আর ক্ষুদ্র হলেও ব্যক্তি চেতন।

বিদ্যালয়ের সাহায্যে গ্রামসেবা

বিদ্যালয়ের শিক্ষক গ্রামের সেবক হবেন। আর বিদ্যালয় সেবাকার্যের কেন্দ্রস্থল হবে। যেমন, গ্রামবাসীদের ঔষধ দিতে হলে তা বিদ্যালয়ের মাধ্যমে দিতে হবে আর ছাত্রেরা এইকাজে সাহায্য করবে। গ্রামে সাফাইর কাজ করতে হলে বিদ্যালয় থেকে এ কাজের সব ব্যবস্থা করা হবে, ছাত্র ও শিক্ষকেরা একাজে গ্রামবাসীদের সহায়তা দেবেন। গ্রামে যেসব বিবাদ বিসম্বাদ হবে, সেই সকলের মীমাংসার জন্যে উভয়পক্ষ বিদ্যালয়ে উপস্থিত হবেন। গ্রামে উৎসবের আয়োজন বিদ্যালয় থেকেই হবে। এইভাবে গ্রামের সমগ্র জীবনধারাটি বিদ্যালয়কে কেন্দ্র করে প্রবাহিত হতে থাকবে। গ্রামে যা আছে তার বিকাশ বিদ্যালয় করবে, আর যা নেই তার স্থাপনাও বিদ্যালয় করবে। গতকাল চাষ ও বুনাই-এর আলোচনা হচ্ছিল। দুটি কাজই খুব গুরুত্বপূর্ণ। চাষের আলোচনা গুরুত্বপূর্ণ

কারণ, গ্রামে-গ্রামে সর্বত্র এর প্রচলন আছে। আর বুনাই-এর আলোচনা গুরুত্বপূর্ণ কারণ, কোথাও এখনও বুনাই প্রচলিত হয় নাই। বিদ্যালয়ের কাজ হবে চাষের উন্নতির পথ দেখানো আর বুনাই যাতে গ্রামে-গ্রামে প্রচলিত হয় সেই চেষ্টা করা।

অর্থাসক্তি ত্যাগ করতে হবে

চাষের কাজ করে বা কাপড় বুনে, কিম্বা ছুতোরের কাজ করে কত টাকা পাওয়া যাবে—এইরকম প্রশ্ন করা অন্যায়। বুঝতে হবে বুনাই প্রচলনের দ্বারা টাকা পাওয়া সম্ভব নয়, কিন্তু এথেকে আমরা কাপড় নিশ্চয়ই পাব। তেমনি চাষ-আবাদের দ্বারা পয়সা পাব না, কিন্তু শস্য অবশ্যই মিলবে। ছুতোরের কাজ দিয়ে পয়সা মিলবে না সত্য, কিন্তু বাড়ীঘর তো মিলবে। কাঞ্চন-মূল্যে এইসব নিত্য প্রয়োজনীয় বস্তুর মূল্য নির্ণীত হতে পারে না। লোকে বলে, দুধের দাম বেশী আর জলের দাম কম। আমার প্রশ্ন হচ্ছে, তৃষ্ণার্ত হলে কি দুধে তৃষ্ণা মেটে? বস্তুত এই সংসারে যেসব বস্তু মানুষের নিতান্ত প্রয়োজন, সেসব বস্তু যাতে সকলের সহজলভ্য হয় ভগবান সেরকম ব্যবস্থা করে রেখেছেন। এইজন্যে কিসে কত পয়সা পাওয়া যেতে পারে সে চিন্তা ছেড়ে দিয়ে, সমগ্র জীবনকে যথার্থভাবে দেখতে হবে।

নঈ-তালীম দ্বারা সমস্যাসমূহের সমাধান

শিক্ষকদের উপরই শিক্ষাকার্যের সাফল্য নির্ভর করছে। এইজন্যে ভারতবর্ষে তথা সমগ্র জগতে যেসব কাজ চলছে, আমাদের শিক্ষকদের সেসব কাজে অভ্যস্ত হতে হবে। আর এইসব কাজে

যেসমস্ত সমস্যার উদ্ভব হতে পারে, যেসমস্ত মুশকিল দেখা দেওয়ার সম্ভাবনা আছে, সেসকলের সমাধান শিক্ষকদেরই করে রাখা উচিত। ভারতবর্ষে যত শস্যের প্রয়োজন, তার সবই দেশে উৎপন্ন হতে পারে কি-না—এসম্বন্ধে কাল আলোচনা হচ্ছিল। তখন একজন বললেন, 'এর উত্তর জয়রামদাসজীই দিতে পারেন নি, তো শিক্ষকেরা কোথা থেকে দেবেন?' কিন্তু আমি বলব, 'জয়রামদাসজী হয়তো একবার উত্তর দিতে পারেন নি, কিন্তু এর উত্তর আমাদের শিক্ষকদের কাছে নিশ্চয়ই থাকবে।' এর কারণ, জয়রামদাসজীর তো বিশ্বরূপদর্শন, আর বিশ্বরূপদর্শনে স্বয়ং অর্জুনই ঘাবড়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু শিক্ষকেরা গ্রামকেই জগতের প্রতীকস্বরূপ মনে করবেন। কাজেই গ্রামের সমস্যা যদি তাঁরা সমাধান করতে পারেন, তাহলে সমগ্র জগতের সমস্যার কি করে সমাধান হবে, তারও একটা হদিস তাঁদের মিলবে। তখন তাঁরা জয়রামদাসজীকে পরামর্শ দিতে পারবেন। তাঁরা বলবেন, 'আমাদের গ্রামে গিয়ে দেখুন, শস্যের সমস্যা আমরা কি ভাবে সমাধান করেছি।' এইভাবে ব্যাপক দৃষ্টি নিয়ে সব কাজ করতে হবে, যাতে দেশের নানাসমস্যার সমাধানের উপায় নঈ-তালীমের প্রয়োগক্ষেত্র থেকে উদ্ভাবিত হতে পারে।

সত্যনিষ্ঠা গড়ে তুলতে হবে

উপরোক্ত সমস্ত কথা থেকেও অধিক গুরুত্বপূর্ণ একটি কথা এখন বলতে চাই। তা হচ্ছে সত্যনিষ্ঠা। প্রত্যেক বিদ্যালয়ের ছাত্রেরা যাতে সত্যনিষ্ঠ হয় সেজন্যে আমাদের প্রাণপণ চেষ্টা করতে হবে। সবসময় ছাত্রদের বিশ্বাস করতে হবে। ছেলেরা যা বলবে তাকে

সত্য বলে গ্রহণ করতে হবে এবং তার উপর নির্ভর করে কাজ করতে হবে। সত্যনিষ্ঠ ব্যক্তি কখনও অন্যকে অবিশ্বাস করে না।

ত্রিশবছর আগের কথা। আমি সেসময় কাশীতে থাকতাম। এক দোকানে তালা কিনতে গিয়েছিলাম। জিনিস কিনি আর না-কিনি জিনিসের দাম জিজ্ঞাসা করা আমার অভ্যাস। এইজন্যে আমি আগে থেকেই সেই তালার দাম জানতাম। ঐ দোকানে দোকানদার তালার দাম দশ আনা বলল। কিন্তু আমি জানতাম, ঐ তালার দাম মাত্র তিনি আনা। আমি দোকানদারকে বললাম, 'দেখ, আমি জানি যে, এই তালার দাম মাত্র তিনি আনা। কিন্তু তুমি যখন এর দাম দশ আনা চেয়েছ, তখন আমি তোমাকে দশ আনাই দেব।' এই কথা বলে দশ আনা দিয়ে তালাটা নিয়ে এলাম। ঐ দোকানের কাছ দিয়েই রোজ বেড়াতে যেতাম। প্রায় তিন সপ্তাহ পরে একদিন দোকানের কাছ দিয়ে যাচ্ছি এমন সময় দোকানদার নির্জন দেখে আমাকে সেখানে ডেকে নিল। কি জানি তার মনে কি হল? সে আমাকে বলল, 'তালার দাম তিন আনা ছিল, সাত আনা ফিরিয়ে নিন।' এই অপ্রত্যাশিত ঘটনায় আমার চোখে জল এসে গেল। আমার মনে হল, ভগবান আমাকে সত্যনিষ্ঠা কী তা বুঝিয়ে দিলেন। হতে পারে, উপরোক্ত ঘটনা হয়তো সব সময় ঘটবে না। তিনি অনেক সময় ভক্তের বিশ্বাসের দৃঢ়তা পরীক্ষা করেন। সে যাহোক, অন্যের উপর আমার সত্যনিষ্ঠার প্রভাব পড়ুক আর না-পড়ুক, আমাকে কিন্তু সত্যনিষ্ঠ হতেই হবে।

নঈ-তালীমের প্রসারতা

(হিন্দুস্থানী তালীমী-সংঘ, শেরঘাটে শিক্ষকদের সঙ্গে আলোচনা)

বিহারে বহুদিন ধরে ব্যাপকভাবে ও নিষ্ঠার সঙ্গে বুনিয়াদী-শিক্ষার প্রয়োগ করা হচ্ছে। সারাদেশ আজ এই পরীক্ষার কি ফল হয়, তা দেখবার জন্যে প্রতীক্ষা করে আছে। কিন্তু যেরকমটি হওয়া উচিত ছিল সেরকম হচ্ছে না। গান্ধীজী বলতেন, নঈ-তালীম স্বাবলম্বী হওয়া চাই। কিন্তু আজ তো নালিশ শোনা যাচ্ছে যে, এই শিক্ষাও ব্যয়বহুল হয়ে পড়ছে।

নঈ-তালীমের শিক্ষকেরা স্বাবলম্বী নন

এর কারণ, আমরা যদিও মূল্য-পরিবর্তনের কথা বলে থাকি, নঈ-তালীমের শিক্ষাক্ষেত্রে কিন্তু সেটি কার্যত প্রমাণ হয় না। শিক্ষা-বিভাগে যেমন শিক্ষকদের বেতনের তারতম্য আছে, নঈ-তালীমের বিদ্যালয়গুলিতেও দেখছি অনুরূপ তারতম্য বজায় রাখা হয়েছে। চাকুরীর মনোভাব, চাকুরীতে উন্নতি করবার চেষ্টা, এসবও নঈ-তালীমের শিক্ষকদের মধ্যে দেখা যাচ্ছে।

এদিকে গভর্ণমেণ্ট শিক্ষার পরিণাম সম্বন্ধে ভাল করে না ভেবে-চিন্তেই যত ইচ্ছা স্কুল খুলে দিচ্ছেন। পুরানোধরণের স্কুল তো গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডের মতো, সোজাসুজিভাবে চললেই ছেলে তৈরী হয়ে বেরিয়ে আসবে। কিন্তু নঈ-তালীমের স্কুলে স্বাবলম্বী না হতে পারলেই বিপদ।

শুধু উচ্চপদের অধিকারী হলেই কিছু হয় না

শিক্ষাবিভাগের এক কর্মচারী বললেন, 'গভর্ণমেণ্টের উচ্চপদে অধিষ্ঠিত কর্মচারীদের উত্তম না হলে চলে না।' তিনি তাঁর কথা ঠিকভাবেই বলেছেন। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে, নঈ-তালীমের স্কুলে পড়ে পাশ করে বেরিয়ে এলেই চলবে না। নঈ-তালীমের ট্রেনিং পেয়েছে অথচ নিজের পায়ে দাঁড়াতে শেখেনি—এমন যে লোক, তাকে উচ্চ-পদে বসিয়ে দিলেও সে কিছু করতে পারবে না। কোন্ স্বাবলম্বী কর্মকারকে প্রধানমন্ত্রী করে দিলে হয়তো সে ভালভাবেই কর্তব্য-পালন করতে পারবে। কিন্তু যে-ব্যক্তি চাকুরী না পেলে অসহায় হয়ে পড়ে, তাকে উচ্চপদে বসিয়ে দিলেও সে কিছু করতে পারবে না। সরকারী ব্যবস্থার দ্বারা সে পরিচালিত হবে, নিজে ঐ ব্যবস্থা বদলাতে সক্ষম হবে না। যে-সৈনিক নিজের কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে অক্ষম তাকে যদি শিবাজীর আসনে বসিয়ে দাও, তবেই সে শিবাজী হয়ে যাবে না।

নতুন কাঠামো দরকার

বর্তমানে নঈ-তালীমের বাইরের রূপটা পুরানো শিক্ষাপদ্ধতির মতোই। কিন্তু সত্যিকারের বুনিয়াদী শিক্ষার ভিত্তির উপর শিক্ষার পুরা কাঠামো (structure) দাঁড় করাতে হবে। বর্তমানে সেরকম করা হচ্ছে না। আজ তো key position গভর্ণমেণ্টের নয়, key position হচ্ছে ভোটারদের। জনতার মত অনুসারেই সামাজিক ও রাষ্ট্রীক সমস্ত ব্যবস্থা নির্ধারিত হবে। আজকের শিক্ষকেরা যদি জনসাধারণের চিন্তাধারায় পরিবর্তন আনতে পারেন, তাহলে শিক্ষা-

সম্বন্ধে নির্ণায়ক শক্তি শিক্ষকদেরই আয়ত্বে থাকবে। এছাড়া রাষ্ট্র-গঠন সম্বন্ধীয় সমস্ত ব্যাপার নির্ণয় করবার শক্তিও তাঁদের হবে। এইভাবে শিক্ষকেরা নিজেরা গভর্ণমেণ্ট গঠন করবেন না সত্য, কিন্তু তাঁরা গভর্ণমেণ্ট নির্মাতা হবেন। তাঁরা নিজেরা চাকুরী করবেন না, কিন্তু চাকুরেদের নিয়ন্ত্রণ করবেন। যখন সর্বসাধারণের দৃষ্টিভঙ্গীর (মূল্যের) পরিবর্তন ঘটবে, তখনই নঈ-তালীমের শিক্ষকেরা উপরোক্ত শক্তিসমূহের অধিকারী হবেন।

বর্তমান শিক্ষক

আমি ভূদান-যাত্রার পথে যেখানে-যেখানে বেসিক-স্কুল পাই, সে-সব স্কুলে গিয়ে তাদের কার্যকলাপ পর্যবেক্ষণ করে থাকি। সে-সব স্কুলের শিক্ষকদের যখন জিজ্ঞাসা করি যে, তাঁদের ছেলেরা কোথায় লেখাপড়া করছে, তখন তাঁরা জবাব দেন যে, তারা পাটনা, গয়া প্রভৃতি শহরে পড়াশুনা করছে! যেখানে পিতা, গুরু ও ভাল পদ্ধতি একস্থানে একসঙ্গে রয়েছে, সেখানে ছেলেদের নিজের কাছে রেখে লেখাপড়া কেন শেখানো হয় না? এ থেকে এই প্রমাণিত হয় যে, শিক্ষকদেরই নঈ-তালীমের উপর আস্থা নেই।

বেসিক-স্কুলগুলিতে যদিও খাদি উৎপন্ন হয়, কিন্তু ছেলেদের পরিধানে খাদি দেখা যায় না। তার মানে, যে-সব খাদি সেখানে হয়, সেগুলি পরার উপযুক্ত হয় না। এ তো হোটেলের মতো হল। হোটেলে মালিক নিজে খায় না, অন্যকে খাওয়াবার জন্যে রান্না করায়। বুনিয়াদী-শিক্ষার শিক্ষকের পত্নী সন্তানদের নিয়ে শহরে থাকেন আর অন্তত এইটুকু তো নিশ্চয়ই শেখান

যাতে ছেলেরা আর যা-ই করুক, বাপের মতো যেন বেকুব না হয়।

নঈ-তালীমের ভুল প্রয়োগ

তারপর শিক্ষকদের আরও জিজ্ঞাসা করে থাকি। তাঁদের প্রশ্ন করি, 'এখানে যেসব শ্রমশিল্পের কাজ হয়, তাতে তিনঘণ্টা খেটে আপনারা যে-মজুরী পেয়ে থাকেন, এরপর যদি তিনঘণ্টা পড়াবার জন্যে সেই মজুরীই আপনাদের দেওয়া হয়, তাহলে আপনাদের কি তাতে সম্মতি আছে?' তাঁরা বলেন যে, এতে তাঁদের সম্মতি নেই। অর্থাৎ তাঁরা উপরোক্ত শ্রমশিল্পগুলির উপর নির্ভর করে জীবিকা-নির্বাহ করতে পারেন না। আমাদের সূতাকাটা, কাপড়বোনা প্রভৃতি শিল্পগুলির মান (স্তর) উঁচু করতে হবে। এইজন্যে নিজেদের জীবনযাত্রার বর্তমান মান নীচু করা দরকার। কিন্তু নিজেদের চিরাভ্যস্ত জীবন-মান নীচু করতে আমরা রাজী নই। তাহলে আর ছেলেদের কেন বলি যে, শ্রমের দ্বারা জীবিকা নির্বাহ কর?

তারপর আমি তাঁদের বলি, 'সরকার আপনাদের বেতনের তারতম্য করেন। কিন্তু আপনারা নিজেরা তো সব টাকা একসঙ্গে করে সমভাগে ভাগ করে নিতে পারেন, এটা করেন না কেন? আমাদের প্রত্যেক পরিবারে তো এমনই হয়।' কিন্তু তাঁরা বেতন সংবিভাজন করতে রাজী হন না। এর অর্থ হচ্ছে, নঈ-তালীমের একটিও আদর্শ (মূল্য) নঈ-তালীমের বিদ্যালয়গুলিতে প্রতীয়মান হয় না। কাজেই ফল যা হবার হচ্ছে। আজকাল তো আপাদমস্তক মিলের বস্ত্রে ভূষিত আর গৃহে বিদেশী সামগ্রী ব্যবহারকারী

লোকেরাই নঈ-তালীম সম্মেলনে কর্মকর্তাদের উপদেশ দিতে এগিয়ে আসেন। আমি ব্যক্তিবিশেষের সমালোচনা করতে চাইনে। কিন্তু আমি বুঝতে পারিনে যে, নঈ-তালীমের আদর্শ অনুসরণ করার জন্যে যাঁরা প্রস্তুত হয়েছেন, তাঁরা ছাত্রদের হাতে প্রস্তুত খাদি কেন পরেন না। নঈ-তালীমের এরকম আংশিক প্রয়োগদ্বারা নঈ-তালীম পঙ্গু হয়ে পড়বে এবং এর বহুল প্রচার সুদূর পরাহত হবে।

নঈ-তালীমের বিদ্যালয় কেমন হবে ?

নতুন কার্যপদ্ধতি বর্তমান পদ্ধতি থেকে ভিন্ন হবে। গ্রামের স্কুলে একঘণ্টা পড়াশুনা হবে আর দিনের বাকী সময় ছেলেরা ক্ষেতে চাষের কাজ করবে। এতে লেখাপড়ার জন্যে কোন খরচ করতে হবে না। সঙ্গে-সঙ্গে গ্রামবাসীদের কিছু-কিছু কাপাস গাছ বুনতে উৎসাহিত করা হবে। এরপর তাদের বাঁশের চরখা তৈরী করতে শেখাব। এভাবে গ্রামে চরখার প্রচলন হবে আর এইসব চরখা বিনা খরচে স্কুলের ছেলেদের জন্যে পাওয়া যাবে। এইরকম করে হয় স্কুলে চরখা প্রচলন করে তার প্রভাবে গ্রামে পরিবর্তন আনতে হবে, নয়তো গ্রামে শ্রমশিল্পের প্রবর্তন করে পরে স্কুলে সেগুলি প্রচলিত করতে হবে। স্কুলে যেসব জিনিস উৎপন্ন হবে, সেগুলি স্কুলেই ব্যবহার করতে হবে। স্কুলে যেসব তরীতরকারী হবে, তা শিক্ষক ও ছাত্রদের মধ্যে বণ্টন করে দিতে হবে। ক্ষেতে কাজ করে প্রত্যেকে কত উৎপাদন করতে পারে এর থেকে তার একটা হিসাবও পাওয়া যেতে পারে। এভাবে যতটা খাদি উৎপন্ন হবে, তা-ও ছেলেদের ভাগ করে দিতে হবে। শুধু দেখতে হবে জনপ্রতি

উৎপাদনের হার আশানুরূপ হচ্ছে কি-না। স্কুলে যেসব বস্তু উৎপন্ন হবে, সেগুলি ছাত্রদের মধ্যে বণ্টন করে দিলে কিছু খরচ বাড়বে সন্দেহ নেই ; কিন্তু প্রথম-প্রথম খরচ একটু বেশীই হবে। ভবিষ্যতে সরকার যখন এসব হাতে নেবে, তখন শিক্ষার জন্যে তো সরকারকে খরচ করতেই হবে। কাজেই এ ব্যবস্থায় কোন অসুবিধা হবে না।

পাঠ্য বিষয় ভাল হওয়া চাই

কেউ-কেউ মনে করেন বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে লেখাপড়া কিছুই শেখানো হয় না। কিন্তু আমি যদি পড়াই, তবে ছাত্রদের প্রথম থেকেই উপনিষদ পড়াব। 'সত্যং বদ, ধর্মং চর'—এসব শেখাব। আমি শুনেছি আজকালকার সংস্কৃত পাঠ্যপুস্তকে টেবিল, চেয়ার এবং বাজারের নানারকম গল্প থাকে। এই জাতীয় বই একেবারেই নিরর্থক। ছেলেমেয়েদের প্রথম থেকেই উপনিষদের গল্প শেখাতে হবে, আর ভাল-ভাল শ্লোক মুখস্থ করতে শেখাতে হবে। কারও-কারও মতে মুখস্থ করা ঠিক নয়। কিন্তু কোন-কোন জিনিস মুখস্থ করা ভাল। রাস্কিনের ৫-বছর বয়সে সমগ্র বাইবেল কণ্ঠস্থ হয়ে গিয়েছিল এবং তাঁর পরবর্তী জীবন এতে বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত হয়েছিল। আজকাল যে মুখস্থ করানো হয় না তা নয়, কিন্তু এরা মুখস্থ-করায় কাক-শালিখের গল্প।

প্রসংগ অনুসারে পাঠ

ছেলেমেয়েদের মনের যখন যে-ভাব থাকবে, তখন সেই অনুসারে পাঠ্য নির্বাচন করতে হবে। যদি কোন ছাত্র অলসতা করে, তাহলে তাকে এমন সব কবিতা মুখস্থ করাতে হবে যাতে তার মনে উৎসাহের

সঞ্চার হয়। যদি সে ভয়প্রবণ হয়, তাহলে তাকে নির্ভীকতাদ্যোতক শ্লোক শেখাতে হবে। এভাবে সুযোগ বুঝে শেখাতে হবে। বেমৌকা শেখালে লাভ হবে না। দৃষ্টান্তস্বরূপ সূতাকাটার উদাহরণ নেওয়া যেতে পারে। একটি ছেলের সূতাকাটার speed (গতি) কম, কিন্তু তার সূতা ছেঁড়ে না। আরেকটি ছেলে খুব তাড়াতাড়ি কাটে, কিন্তু তার সূতা বারবার ছিঁড়ে যায়। তখন সুযোগ বুঝে ছেলেদের কাছে খরগোস আর কচ্ছপের গল্প বলে নিষ্ঠার সংগে একটানা কাজ করে যাওয়ার মাহাত্ম্য বুঝিয়ে দিতে হবে। এভাবে ওদের মধ্যে অখণ্ডতার জ্ঞান জন্মাবে।

প্রত্যক্ষ জ্ঞান

পুস্তকের মাধ্যমে জ্ঞান দেওয়া সহজ—অনেকেরই এই মত। কিন্তু এই মত ঠিক নয়। যথা, অঙ্ক শেখাতে গিয়ে যদি বলি ৩ আর ২-এ মিলে ৫ হয়, তাহলে একথা সহজে বোধগম্য হয় না। ছেলেরা বলবে, '২ আর ৩-এ মেলানোই যায় না। ২ দুইই থাকে আর ৩ তিনই।' কিন্তু যদি বলা হয় যে, ২-টি আম আর ৩-টি আম একত্র করলে ৫-টি আম হয়, তাহলে ২ আর ৩-এ মিলে-যে ৫ হয়—একথা খুব সহজেই বোঝা যায়।

অনেকের মতে কাজ-কর্মের মধ্য দিয়ে শিক্ষা দেওয়া বা জ্ঞানদান করা খুব কঠিন। কিন্তু আজকাল যে-পদ্ধতিতে জ্ঞানদান করা হয়, সে তো আরও কঠিন। প্রকৃতির নানাবিষয় থেকে শিক্ষার্থীকে দূরে রেখে তাকে জ্ঞানদান করা হয়। তাকে শেখানো হয়, 'অশ্ব' অর্থ ঘোড়া বা horse। কিন্তু যাকে শেখানো হচ্ছে সে যদি কখনও

ঘোড়া না-দেখে থাকে, তাহলে সে কী বুঝবে? শিশুকে জিনিসের নাম শেখানো হচ্ছে অথচ তাকে জিনিসগুলি কী তা বলা হচ্ছে না। কাজেই সে নামগুলিই শেখে। এতে প্রকৃত জ্ঞান কখনও হয় না, যা হয় তা ভ্রান্তজ্ঞান।

১৮৷২০ বছর বয়স পর্যন্ত পুঁথিগত বিদ্যা অর্জন করে আজকাল ছাত্র-ছাত্রীরা প্রবীণতা লাভ করে। দেখে মনে হয়, সুশিক্ষিত হওয়ার এটিই সহজ উপায়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এ উপায় সহজ নয়। নঈ-তালীম পুঁথি বর্জন করে না, বরং পুঁথির যথোপযুক্ত ব্যবহার করে। কারও রোগ হলে, সেই রোগের কারণ জানার ইচ্ছা স্বাভাবিকভাবেই হয়। এভাবে রোগকে জ্ঞানচর্চার উপায়রূপে গ্রহণ করা যেতে পারে। এমনি করে জন্ম, মৃত্যু, রোগ, আরোগ্য-লাভ প্রভৃতি নানা দৈনন্দিন ঘটনা জ্ঞানলাভের উপায় হতে পারে। যে-ব্যাক্তি পরিপার্শ্বের সকল বস্তু ও ঘটনা থেকে জ্ঞানলাভ করতে চায়, তার অজ্ঞানতা থাকতে পারে না। অনুরূপভাবে রান্নাবান্না, কুটনোকাটা প্রভৃতি গৃহকর্মের মাধ্যমেও জ্ঞানলাভ হতে পারে। কুটনোকাটার সময় কীভাবে বসতে হয়, কীভাবে আসন পাততে হয়—এসব শেখানো হয়। রান্না করার সময় ধূমহীন চুল্লী কীকরে বানাতে হয় এবং কীরকম চুল্লীতে কম জ্বালানী লাগে—এসব শেখানো যেতে পারে। খাওয়ার সময় কী খেতে হবে, খাওয়ার জন্যে কতক্ষণ সময় দেওয়া উচিত—এসব শেখানো যায়। এমনিভাবে দেখলে দেখা যাবে যে, প্রত্যেক বিষয়ই জ্ঞানে ওতঃপ্রোত হয়ে রয়েছে। কিন্তু জ্ঞানলাভের যে নানা অবলম্বন রয়েছে, তা আজকালকার

বিদ্যালয়ে কাজে লাগানো হয় না। নঈ-তালীমের শিক্ষকদের ট্রেনিং-এর প্রয়োজন নেই—একথা বলা ভুল। পুরানো শিক্ষাপদ্ধতির শিক্ষকদের যেমন বি. এ. পাশ করে বি. টি. পাশ করতে হয়, তেমনিভাবে নঈ-তালীমেও সাধারণ শিক্ষার পর শিক্ষকদের ট্রেইনড্ হওয়া দরকার। কিন্তু এই ট্রেনিং হবে চাষের ক্ষেতে হাতে-কলমে শিখতে-শিখতে।

গুরুপত্নী ছাড়া গুরুকুল হয় না

নঈ-তালীমের ট্রেনিং কেন্দ্রে শিক্ষার্থী-শিক্ষকদের সঙ্গে তাঁদের পত্নীরা থাকেন না। কিন্তু গুরুপত্নী ছাড়া কী করে বিদ্যালয় চলবে? শিক্ষকের পত্নীরও ট্রেনিং নেওয়া দরকার, যাতে তিনিও তাঁর স্বামীর সঙ্গে শিক্ষাদানের কাজ করতে পারেন। উপনিষদে এক গল্প আছে। উপকোশল নামে এক বালক গুরুগৃহে থাকত। একদিন সে কিছুই খেল না। গুরুকে সে খুব ভয় করত, তাই গুরুর কাছে কিছু বলার সাহস তার ছিল না। কিন্তু সে কিছু খেল না দেখে গুরুপত্নী জিজ্ঞাসা করলেন,'তুমি খেলে না কেন?' উত্তরে শিষ্য বলল, 'মানুষের বিভিন্ন ইচ্ছা পূরণ না-হলে ভোজনের ইচ্ছা হয় না।' তখন গুরুপত্নী গুরুকে বললেন, 'এই বালকটির জ্ঞানলাভের ইচ্ছা হয়েছে। একে জ্ঞান দাও।' এইভাবে গুরুপত্নী শিষ্য ও গুরুর সংযোগ ঘটানোর সেতুস্বরূপ হলেন। এইজন্যে শিক্ষার্থী-শিক্ষকদের সঙ্গে তাঁদের পত্নীদেরও ট্রেনিং-এ থাকা নিতান্ত দরকার। আমার মতে গুরু-পত্নীদেরও বেতন দেওয়া উচিত, তাঁরাও ছেলেমেয়েদের পড়াতে পারেন। যেখানে শিক্ষকেরা ১০০৲ টাকা বেতন পাচ্ছেন, সেই

জায়গায় শিক্ষকদের ৮০৲ টাকা দিয়ে তাঁদের পত্নীদের ৪০৲ টাকা করে দেওয়া উচিত।

আজকাল নঈ-তালীমের বিরুদ্ধতা করার একটি কারণ হচ্ছে, এই স্কুলগুলি কেবল গ্রামেই খোলা হয়ে থাকে। এতে গ্রামের লোকেরা মনে করে যে, তাদের প্রতি বিশেষ কৃপা করে সরকার গ্রামে নঈ-তালীম প্রবর্তন করছে। মাদ্রাজে রাজাজীর শিক্ষা-পরিকল্পনার বিরুদ্ধে ঐ একই কারণে আন্দোলন হয়েছে। আন্দোলনকারীরা বলেছেন যে, গ্রামের জন্যে এই শিক্ষাব্যবস্থা করা হয়েছে, শহরের জন্যে নয়। অন্যত্র ব্রাহ্মণদের সঙ্গে অব্রাহ্মণদের ঝগড়ার বিরাম নেই। ব্রাহ্মণেরা সাধারণত শহরে থাকেন, তাঁরা শহরে ভিন্নধরণের শিক্ষা পান। তাই অব্রাহ্মণেরা বলছেন, 'ব্রাহ্মণেরা উন্নত পদ্ধতিতে সুশিক্ষা লাভ করছেন আর আমাদের নঈ-তালীমের পড়া পড়িয়ে মূর্খ করে রাখা হচ্ছে।'

অসাম্য দূর করুন

আমরা যদি বলি, সমস্ত অসাম্য দূর হওয়ার পর নঈ-তালীম সফল হবে, তাহলে নঈ-তালীমের ভিত্তি দুর্বল হয়ে যাবে। আমরা তো চাই নঈ-তালীম দিয়ে অসাম্য দূর করতে। ভেদভাব দূর করার সামর্থ্য সরকারের নেই। কারণ সমাজের অসাম্যের প্রতিছায়া সরকারের রয়েছে। কাজেই যখন সমাজ পরিবর্তিত হবে এবং সামাজিক সাম্য স্থাপিত হবে, তখন সেই অনুসারে সরকারও পরিবর্তিত হতে বাধ্য। কাজেই শিক্ষা-বিভাগের লোকেদের হাতেই বিপ্লবের পতাকা থাকবে। শিক্ষকদের নিয়ে এক সেনাদল গড়তে

হবে। এই সেনাদল নিয়ে coup-de-etat (বিদ্রোহ) করে পুরানো ব্যবস্থাকে অচল করে দিতে হবে। অবশ্য এই coup-de-etat non-violent coup-de-etat হবে। এই coup-de-etat করার শক্তি একমাত্র শিক্ষকদেরই আছে। শিক্ষা-বিভাগ যদি শিক্ষকদের মধ্যে এই ভাব জাগ্রত করতে পারে, তাহলেই শিক্ষকদের সহায়তায় এই বিপ্লব (coup) সম্ভব হবে।

নঈ-তালীমের জীবন-দর্শন

১৯৩৭ অর্থাৎ স্বাধীনতালাভের ১০-বছর আগে বাপু নঈ-তালীমের পরিকল্পনা দেশবাসীর সামনে ধরেছিলেন। শুধু পরকীয় শাসন থেকে মুক্ত হলেই স্বাধীনতা লাভ হল—বাপু একথা মনে করতেন না। তাঁর কাছে স্বাধীনতার অর্থ আরও ব্যাপক ছিল। যে নতুন সমাজ প্রতিষ্ঠিত হলে সমাজে শোষণ থাকবে না, কেন্দ্রীয় শাসন হবে ন্যূনতম এবং প্রত্যেক ব্যক্তি বিকাশের পূর্ণ সুযোগ পাবে—স্বরাজ বলতে গান্ধীজী এইরকম সমাজ-ব্যবস্থাই বুঝতেন। স্বরাজ অর্থ এমন রাষ্ট্র যেখানে প্রত্যেকে অনুভব করবে—এ আমার রাষ্ট্র। এমন যে রাষ্ট্র, গান্ধীজী তার নামই 'রাম-রাজ্য' দিয়েছিলেন।

নতুন ও পুরাতন শিক্ষাপদ্ধতির পার্থক্য

নঈ-তালীমের অর্থ নতুন মূল্যের প্রতিষ্ঠা। পুরানো শিক্ষা অনুসারে চুরি করা পাপ বলে গণ্য হয়। কিন্তু নঈ-তালীমে কেবল

চুরি করাই পাপ নয়, অতিরিক্ত সংগ্রহ করাও পাপ। পুরানো শিক্ষাতে মানসিক ও শারীরিক শ্রমের মূল্য সমান মনে করা হয় না, নঈ-তালীমের কাছে এই দুইরকম শ্রমই তূল্যমূল্য। শুধু তাই নয়, নঈ-তালীম এই দুই শ্রমের সমন্বয় করেছে, এদের 'সমবায়' সাধন করেছে। পুরানো শিক্ষা ক্ষমতাপন্নের কাছে মাথা নত করতে শেখাত, নঈ-তালীম শেখায়—ক্ষমতা 'সমতা'র দাসী। পুরানো শিক্ষা ধন, শক্তি ও বিদ্যাকে ভিন্ন-ভিন্ন দেবতারূপে পূজা করতে শেখাত, নঈ-তালীম মানবতাকে পূজা করতে শেখায় এবং ধন, বিদ্যা ও শক্তিকে সমাজসেবার উপায় স্বরূপ জ্ঞান করে।

সেবা ও ক্ষমতা

ক্ষমতা হস্তান্তর স্বরাজ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য ছিল না। ক্ষমতা-মূলক রাষ্ট্রের পরিবর্তে সেবামূলক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠাই স্বরাজের উদ্দেশ্য ছিল। এখন একদল লোক উভয় আদর্শের কিছু-কিছু নিয়ে রাষ্ট্র গড়তে চাইছেন। নেতৃস্থানীয় লোকেরা বলছেন, 'জনগণের সেবার জন্যেই আমরা ক্ষমতা হস্তগত করতে চাই।' জনগণ ভাবছে, 'মনে তো হচ্ছে ক্ষমতা হস্তগত করার জন্যেই নেতারা জনসেবা করছেন।' নেতাদের কথার অর্থ অনুগামীদের কাছে এভাবে প্রতিভাত হয়। ফলে এই হয়েছে যে, আজ দেশের রাজনৈতিক দলগুলি ক্ষমতা হস্তগত করাকেই মুখ্য কাজ মনে করছে আর সেবা করার সব ভার 'ভারত সেবক সমাজে'র উপর পড়ছে।

নকল নঈ-তালীম

বহু বৎসর ধরে লক্ষ্য করছি যে, নঈ-তালীমের প্রয়োজনীয়তা

অংশত স্বীকার করাতে ইষ্টের চেয়ে অনিষ্টই বেশী হচ্ছে। বর্তমানে বিভিন্ন প্রাদেশিক সরকার নঈ-তালীমের ব্যাপক প্রয়োগ করছে। ফলে সর্বত্র নঈ-তালীমের ব্যর্থ অনুকরণ হচ্ছে। কারণ, নঈ-তালীমের পশ্চাতে যে জীবন-দর্শন রয়েছে, তাকে সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ না করে নঈ-তালীমের কোন-কোন অঙ্গ প্রয়োগ করাতে এর বিকৃত অনুকরণ মাত্র হচ্ছে। এতে নঈ-তালীমের সুনাম হওয়ার কোন আশা নেই বরং দুর্নাম হওয়ারই সম্পূর্ণ সম্ভাবনা রয়েছে। আর হচ্ছেও তাই। যেসকল প্রাদেশিক সরকার নঈ-তালীমের প্রয়োগ করেছে, তাদের মধ্যে বিহার প্রদেশের কাজই সর্বাপেক্ষা প্রামাণিক বলে মনে করা হয়। কিন্তু এই বিহারেই আমি নঈ-তালীমের যে-দশা দেখেছি, তাতে সন্দেহ হয় নঈ-তালীমকে ধ্বংস করার চেষ্টাই হচ্ছে।

বাপুর একীকরণের স্বপ্ন

যাঁরা নঈ-তালীমকে সরকারের আওতায় আসতে দিয়েছেন, এই বিকৃতির জন্যে তাঁরাই দায়ী। বিশুদ্ধভাবে নঈ-তালীমের প্রয়োগ করবার উদ্দেশ্যে স্থানে-স্থানে বিদ্যালয় স্থাপন করা উচিত ছিল। কিন্তু সমস্ত সংগঠক-সংঘ পৃথক-পৃথক কাজ করাতে একাজ সম্ভব হয় নি। সকল সংঘ ঐক্যসূত্রে আবদ্ধ হয়ে একটি সংঘরূপে কাজ করছে—গান্ধীজী এর সমীচীনতা উপলব্ধি করেছিলেন এবং তাঁর ধ্যাননেত্রের সম্মুখে এমনি একটি ঐক্যবদ্ধ সংঘ রূপ নিয়েছিল। কিন্তু তাঁর ভক্তেরা সম্পূর্ণভাবে এই পরিকল্পনার সমীচীনতা অনুধাবন করতে আজও সক্ষম হননি। এখন চরখা-সংঘ সর্বসেবা-সংঘের মধ্যে আত্মবিলোপ সাধনে সাহসী হওয়াতে, সর্বসেবা-সংঘ সংগঠনের পথ

উন্মুক্ত হয়েছে। নঈ-তালীমের প্রকৃত পরিচয় পেতে হলে এবং এর শক্তিমত্বা প্রমাণ করতে হলে তালীমী-সংঘকে সর্বসেবা-সংঘের সঙ্গে যুক্ত হতে হবে। এই যোগ না-হওয়া পর্যন্ত সর্বসেবা-সংঘ আর তালীমী-সংঘ উভয়ই প্রাণহীন হয়ে থাকবে। শিরশ্ছেদ করলে দেহের যে-অবস্থা হয়, সেই দশা হবে।

ভাববার কথা

এই-যে নেতৃস্থানীয়েরা আংশিকভাবে হলেও নঈ-তালীমের প্রবর্তনের কথা বিবেচনা করলেন, তা-ও করলেন স্বাধীনতার ছয় বৎসর পর। এতে আমি যত-না আশ্চর্যান্বিত হয়েছি তার চেয়ে বেশী আশ্চর্যান্বিত হয়েছি এই দেখে যে, সর্বদা সামগ্রিক দৃষ্টির কথা আলোচনা করেও কার্যকালে আমরা সেই সামগ্রিকতাকে কিছুতেই অনুধাবন করতে পারছি নে। সর্বোদয়পন্থীরা কংগ্রেসের কর্মচারী হতে পারেন, এসেম্বলীর সদস্য হতে পারেন, সরকারের অধীনে মন্ত্রীত্ব গ্রহণ করতে পারেন, সরকার বিরোধী রাজনৈতিক দল সংগঠন করতে পারেন, শুধু নিজেদের মধ্যে একতা রাখতে পারেন না। এটি খুব চিন্তার বিষয়।

সম্পূর্ণরূপে এক হয়ে যাওয়া

সরকারী কর্মচারীদের প্রবর্তনায় এযাবৎ নঈ-তালীমের প্রয়োগ দুইভাবে হয়েছে। এক তো জেনে শুনে নঈ-তালীমের অকর্মণ্যতা প্রমাণ করবার জন্যে। এই উদ্দেশ্য নিয়ে যাঁরা নঈ-তালীমের প্রয়োগ করেন, তাঁরা প্রমাণ করতে চেষ্টা করেন যে, এ পদ্ধতি ব্যয়বহুল, এতে লেখাপড়া ভাল হয় না। তাঁরা সর্বদাই চেষ্টা করেন যাতে

অভিভাবকেরা এই পদ্ধতি অনুসরণ করতে রাজী না-হন আর শিক্ষার্থীরাও এতে সন্তুষ্ট না-হয়। স্পষ্টই বোঝা যায় যে, এভাবে একটি উত্তম পদ্ধতিকে ভুল পথে প্রয়োগ করা হচ্ছে। দ্বিতীয় প্রকারের প্রয়োগে কোন দুরভিসন্ধি নেই। কিন্তু নঈ-তালীমের মূলে যে নতুন মূল্যবোধ রয়েছে, সেটি গ্রহণ না-করে এতে পুরানো মূল্যবোধের ভিত্তিতেই নঈ-তালীমকে আংশিকভাবে গ্রহণ করা হয়েছে। সুতরাং দ্বিতীয় প্রকারের প্রয়োগ বাহ্যত ঠিকপথে হলেও এদ্বারা নঈ-তালীমের প্রকৃত পরিচয় পাওয়া সম্ভব হয় না। এইজন্যে নতুন জীবন-দর্শনের ভিত্তিতে নঈ-তালীমের প্রয়োগ করা প্রয়োজন। এমন উপায় উদ্ভাবন করতে হবে যাতে নঈ-তালীম,সর্বসেবা-সংঘ আর ভূদানযজ্ঞ—এই তিনটি সম্পূর্ণরূপে এক হয়ে যেতে পারে।

সরকার-নিরপেক্ষ প্রয়োগ

দেশের পরাধীন অবস্থায় জাতীয় শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয় এবং এইজন্যে পৃথক বিদ্যাপীঠ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এখন লোকেদের ধারণা হয়েছে যে, দেশ যখন স্বাধীন হয়েছে, তখন সমস্ত সরকারী বিদ্যালয়গুলি জাতীয় বিদ্যালয়ে পরিণত হয়ে গেছে। কিন্তু হয়ে গেছে বললেই তো আর হয়ে যায় না। ঐসব বিদ্যালয়গুলিকে জাতীয় বিদ্যালয়ে পরিণত করতে হয়। আমার আশা আছে যে, উপরোক্ত জাতীয়করণ একদিন হবেই। কিন্তু তা হলেও সরকার-নিরপেক্ষ শিক্ষা-ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা থেকেই যাবে। গ্রামে-গ্রামে স্থানীয় পরিস্থিতি অনুসারে জনসাধারণের পক্ষ থেকে বিদ্যালয় পরিচালনা করতে হবে। তা না

হলে সমগ্র শিক্ষা-ব্যবস্থা যদি রাষ্ট্রায়ত্ব হয়, তবে ছেলেমেয়েদের মস্তিষ্ক এক ছাঁচে ঢালা হয়ে যাওয়ার ভয় থাকবে। এদিক থেকে দেখলেও নঈ-তালীমের রাষ্ট্র-নিরপেক্ষ প্রয়োগ হওয়া প্রয়োজন। এ বিষয়টি গভীরভাবে চিন্তা করে দেখা দরকার।

('সর্বোদয়', ডিসেম্বর ১৯৫৩)

নঈ-তালীমের দায়িত্ব

নঈ-তালীমের সম্মুখে আজ বহু গুরুতর সমস্যা উপস্থিত হয়েছে। ভূদানযজ্ঞমূলক গ্রামোদ্যোগ প্রধান (বিকেন্দ্রিত শিল্পের উপর প্রতিষ্ঠিত) অহিংস বিপ্লব সফল করে তুলবার যে গুরুভার ভগবান আমাদের উপর দিয়েছেন, সেই বিপ্লব রূপ নেওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে দেখা যাচ্ছে যে, আমাদের সমগ্র রচনাত্মক কার্যের পরিকল্পনায় গুরুতর পরিবর্তন করতে হবে। সুতরাং নঈ-তালীমের পরিকল্পনাও বিশেষভাবে বদলাতে হবে। যদি নঈ-তালীম বৈপ্লবিক আদর্শের অনুযায়ী না-হতে পারে, তাহলে এ পুরানো 'তালীম' হয়ে যাবে। এই কারণে নঈ-তালীমকে নিত্যনতুন করে গড়তে হবে।

পাঁচকোটি একর ভূমির দানপ্রাপ্তি, এই ভূমির পুনর্বণ্টন এবং এর-পরে সংগঠন কার্য—এসব নঈ-তালীমের সহায়তা ভিন্ন সফল হবে না। পক্ষান্তরে এসকলের সাফল্য ব্যতীত নঈ-তালীমের স্থায়িত্ব সম্ভব নয়। ভূমি-প্রাপ্তির জন্যে যেসকল চিন্তাশীল, বিনয়ী, কার্যদক্ষ ও নিষ্ঠাবান কর্মী দরকার, তাদের কে গড়ে তুলবে? ভূমি-বণ্টনের কাজের জন্যে

বিশেষজ্ঞ কর্মীর প্রয়োজন হবে, তাদের কে শিক্ষিত করবে? সপরিবারে জীবনদানী সেবকেরা কোথা থেকে সামগ্রিক জীবন-দর্শন সাধন করার শিক্ষা লাভ করবেন? পূর্ণ গ্রামদান আরম্ভ হয়েছে এবং ভবিষ্যতে আরও হবে। এসকল গ্রাম সর্বোদয়ের আদর্শে কাদের দ্বারা দীক্ষিত হবে? সর্বোদয়ের ভাবধারা যথার্থ প্রণালীতে প্রতি গ্রামে, প্রতি গৃহে প্রচার করবার দায়িত্ব কারা পালন করবে? এইসকল প্রশ্নের উত্তরের সঙ্গে নঈ-তালীম অনিবার্যভাবে যুক্ত হয়ে আছে।

আজ সরকারও নঈ-তালীম সম্বন্ধে গভীরভাবে চিন্তা করছে। সরকারকে সম্যক দিগ্‌দর্শন করাবার দায়িত্ব আমাদের নিতে হবে। সর্বোদয়-সমাজের আদর্শানুযায়ী শাসনমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠিত করতে হলে-যে শিক্ষাকেও যথাসম্ভব শাসনমুক্ত রাখতে হবে, একথা দেশবাসীকে বোঝানো দরকার এবং এই আদর্শকে রূপ দেওয়ার জন্যে দেশবাসীকে উদ্বুদ্ধ করা দরকার। এমন কি রাষ্ট্র শাসনমুক্ত না-হলেও শিক্ষার শাসনমুক্তির অধিকার স্বীকার করা চাই।

সবাই নিশ্চয় জানেন যে, এবার সম্মেলনে উপস্থিত হওয়া আমার পক্ষে সম্ভব হবে না। কিন্তু আমি নিজেকে নঈ-তালীমের একজন সেবক মনে করি। বরাবর এর কাজ করে আসছি—এ দাবীও আমার আছে এবং সম্প্রতি একাজই দ্রুতগতিতে করে চলেছি। আমি সম্মেলনের সাফল্য কামনা করি। আমার আশা আছে, এই সম্মেলন সেবকদের প্রেরণা যোগাবে।

—(১৯৫৪-এর নভেম্বর মাসে সনোসরা-তে অনুষ্ঠিত নঈ-তালীম সম্মেলনে প্রেরিত বাণী)।

নঈ-তালীম ও গণসংযোগ

(পুরী সর্বোদয়-সম্মেলনে তালীমী-সংঘের অধিবেশনে প্রদত্ত ভাষণ)

বলরামপুরে নঈ-তালীম ও কস্তুরবার দুইটি কেন্দ্র আছে। বাংলাদেশে পদযাত্রার সময় বলরামপুরে দুইদিন ছিলাম। সেইসময় একদিন ভোর পাঁচটায় নিকটবর্তী এক গ্রামে বেড়াতে গিয়েছিলাম। সেখানে গ্রামের বোনেরা প্রদীপ জ্বালিয়ে স্বাগত সম্ভাষণ করার জন্যে এসেছিলেন।

গণসংযোগের অভাব

জিজ্ঞাসাবাদ করে জানতে পারলাম গ্রামবাসীরা ভূদান সম্বন্ধে কিছুই জানেন না। প্রশ্ন করলাম, 'এখানে ভূমিহীন কতজন আছেন?' তাঁরা জবাব দিলেন, 'এখানে বহু ভূমিহীন আছেন।' একথাও তাঁরা বললেন যে, জমিদাররা অধিকাংশই অন্যত্র থাকেন। আমি জিজ্ঞাসা করে জানতে পারলাম যে, এইসব জমিদারদের কাছে ভূমিদান সংগ্রহের জন্যে কোন কর্মী যান নি। আমি ভাবলাম কেন এমন হল। যেখানে আমাদের দুই-দুইটি প্রতিষ্ঠানের কাজ চলছে, তার এত কাছে এমন ঘন অন্ধকারের কারণ কী? গ্রামে কোন কাজই হয় নি। এই অবস্থায় গ্রামের লোকদেরই-বা কি বলি? প্রতিষ্ঠান দুইটির কর্মী সেখানে উপস্থিত ছিলেন। আমি তাঁদের বললাম, 'আমাদের প্রতিষ্ঠানগুলি যদি নিজ-নিজ কাজে এমনভাবে ব্যাপৃত থাকে যে, আশেপাশের জনসাধারণের সঙ্গে যোগ

স্থাপন না করতে পারে, তাহলে তো এদের মূল উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়ে যাবে। প্রতিষ্ঠানগুলির এই 'ত্রুটি সংশোধন করা দরকার'। বহু-বর্ষের অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি যে, যেস্থানে ১০০।১৫০ জন কর্মী একত্রে কাজ করেন, সেস্থানে এত কাজ জড়ো হয়ে পড়ে যে, বাইরের কোন কাজ করার সময়ই পাওয়া যায় না। অর্থাৎ বড় প্রতিষ্ঠানগুলি আত্মকেন্দ্রিক হয়ে পড়ে, এদের পক্ষে অর্থ-নিরপেক্ষ থাকাও সম্ভব হয় না। এইসব বড় প্রতিষ্ঠান নিজ-নিজ অর্থ-ভাণ্ডারের (Fund) উপর নির্ভর করে কাজ করে। মণ্ডলীকে হয় টাকার উপর নির্ভর করে কাজ করতে হয়, নয় তো জনসাধারণের সহায়তার উপর। অর্থ-নির্ভরতার পরিবর্তে গণ-নির্ভরতা গ্রহণ করলে আশেপাশের জনসাধারণের সঙ্গে সংযোগ সাধন না করলে চলে না; ফলে এসব প্রতিষ্ঠান মিথ্যা-যোগ থেকে রক্ষা পায়।

যে-সাধনা টাকা-পয়সার উপর নির্ভর করে করা হয়, তাকে আমি মিথ্যা-যোগ নাম দিয়েছি। এ ধ্যান-যোগও নয়, কর্ম-যোগও নয়, জ্ঞান-যোগও নয়। অর্থের উপর নির্ভরশীল প্রতিষ্ঠানগুলি লোক দেখানো কাজ করে, এদের কাজে হৃদয় স্পর্শ করে না। এ যেন সেবাকাজের অভিনয়। জনগণের উপর অর্থ-নির্ভর প্রতিষ্ঠানের প্রভাবের সঙ্গে দর্শকের উপর নাটকের প্রভাব তুলনীয়। যোগযুক্ত জীবনের প্রভাব নাটকীয় প্রভাব নয়। এইজন্যে অনেক বিবেচনা করে স্থির করা হয়েছে যে, ১৫।২০ জনের বেশী কর্মী এক-একটি প্রতিষ্ঠানে থাকবে না। অবশ্য বহু সংখ্যক কর্মী যদি অর্থ-নিরপেক্ষ হয়ে একত্রে কাজ করতে পারেন, তাহলে আমার আপত্তি নেই।

বাস্তবিকপক্ষে যখন বহু সংখ্যক লোক টাকা-পয়সার উপর নির্ভর না-করে প্রতিষ্ঠান চালাতে পারবেন, তখনই তো তাঁরা সমাজ-বিপ্লব সংঘটিত করতে সক্ষম হবেন।

নঈ-তালীমের লক্ষ্য

বৃহৎ প্রতিষ্ঠানের আরেকটি দোষ দেখতে পাওয়া যায়। প্রতিষ্ঠান বড় হলেই, তার কাজের ব্যবস্থা বড় করে আরও ভাল করতে হয়। ফলে সংশ্লিষ্ট শিক্ষার্থীরা উত্তম ব্যবস্থার মধ্যে কাজ করতে অভ্যস্ত হয়। শিক্ষা সমাপ্ত করে যখন এসব বিদ্যার্থী সংসারে প্রবেশ করে, তখন এদের অবস্থা সঙ্গীন হয়ে পড়ে। প্রতিষ্ঠানের বাইরে অব্যবস্থার মধ্যে কাজ করতে গিয়ে এদের মাথা ঘুরে যায়। এইজন্যে নঈ-তালীমের বিদ্যালয়গুলিতে এমন আয়োজন করতে হবে, যাতে শিক্ষার্থীরা সাহসের সঙ্গে সমস্ত রকম দুঃখবিপদের সম্মুখীন হওয়ার যোগ্যতা লাভ করে এবং এই তপস্যাদ্বারা নিজেদের জীবন গড়ে তুলতে পারে।

নঈ-তালীম-পদ্ধতি অনুযায়ী শিক্ষাদান বহুস্থানে চলছে। এর থেকে বুঝতে পারছি, আমরা যেভাবে এই পদ্ধতির প্রয়োগ করছি তাতে কোন ত্রুটি নেই, তবে সমসাময়িক পরিস্থিতির যতটা উন্নতি করা প্রয়োজন ততটা আমরা করছি নে। 'রাজকুমার কলেজ' যেমন সুব্যবস্থিত, আমাদের নঈ-তালীমের বিদ্যালয়গুলিও তেমনি সুব্যবস্থিত ; অবশ্য 'রাজকুমার কলেজে'র ভোগ-বিলাসের পরিবেশ এখানে নেই, তাই এই দৃষ্টান্ত সম্পূর্ণভাবে প্রয়োগ করা যাচ্ছে না। তবে এক বিষয়ে দুই-এর মিল আছে, দুই-এরই আশেপাশের

লোকের সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই। আমাদের ব্যবস্থা স্থিতিস্থাপক হওয়া চাই (যাতে আমাদের বিদ্যায়তনগুলি অচলায়তন হতে না পারে)। বিভিন্নস্থানে বিভিন্নরূপে প্রয়োগ করে দেখা দরকার। আমি দৈনিক এক ঘণ্টাকালস্থায়ী যে-বিদ্যালয়ের প্রস্তাব করেছি, সে কথাও বিবেচনা করে দেখতে হবে।

গ্রামে শিক্ষা চলছে

কেউ-কেউ বলেন, 'নঈ-তালীমের বিদ্যালয়গুলি এত ব্যয়বহুল যে, অনেকটা এই কারণেই নঈ-তালীম অচল হয়ে পড়ে। বর্তমানে রাষ্ট্রের যে-অবস্থা, তাতে এত ব্যয়বহুল শিক্ষার প্রচলন করা সম্ভব নয়।' এই কথা নঈ-তালীমের নিন্দুকদের মুখেই শোনা যায়। কারণ নঈ-তালীম বাস্তবিকপক্ষে ব্যয়বহুল নয়। শুধু তাই নয়, নঈ-তালীমের অন্তিম লক্ষ্য ধন-মুক্তি। যাতে সম্পূর্ণরূপে অর্থ-নিরপেক্ষ হয়ে শিক্ষা চলতে পারে, নঈ-তালীম সেই চেষ্টাই করছে। তবে এখনও সে-ব্যবস্থা চূড়ান্ত হয় নি, তাই কিছু অর্থ ব্যয় করতে হয়।

আমার মনে হয়, একদিক থেকে দেখলে প্রত্যেক গ্রামই স্বাবলম্বী, গ্রামবাসীরা প্রত্যেকেই কোন-না-কোন উৎপাদক শ্রম করে জীবিকা অর্জন করে। সেখানে কিছু-না-কিছু উৎপাদন চলছে, কেউ না খেয়ে থাকছে না। মোটকথা গ্রামে বাইরের সাহায্য ছাড়াই এক সম্পূর্ণ জীবনযাত্রা নির্বাহিত হচ্ছে। এইরকম গ্রামে সকলকেই পুরুষার্থের উপর নির্ভর করতে হয়। এইরকম ক্ষেত্র নঈ-তালীমের পক্ষে বিশেষ উপযুক্ত। গ্রামের জীবন পরাশ্রয়ী নয় কিম্বা কৃত্রিম নয়। এখানে লোক (পেটের) ক্ষুধার প্রেরণায় কাজ করে আর

বুদ্ধির আলোতে নানা উপায় উদ্ভাবন করতে পারে। গ্রামের জীবনযাত্রা নির্বাহের মধ্যেই অজ্ঞাতসারে নঈ-তালীমের কাজ চলছে। এখন শুধু দরকার গ্রামের কাজগুলিকে শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে নঈ-তালীমের পদ্ধতির মধ্যে সংবদ্ধ করে দেওয়া। গ্রামে নঈ-তালীম প্রচলন করবার আগে, গ্রামের লোকেরা অশিক্ষিত আর আমরা শিক্ষিত—এই অহংকার ছাড়তে হবে। আর একথাও বুঝতে হবে যে, আমরা নিমিত্তমাত্র। আমরা শিক্ষা প্রচলন না-করলে গ্রামবাসীরা যে অশিক্ষিত থেকে যাবে, তা নয়।

গ্রামে-গ্রামে যে কৃষি, শিল্প চলছে, নঈ-তালীমের শিক্ষক ও ছাত্রদের শুধু তারমধ্যে নিজেদের লিপ্ত করে দিতে হবে। পরস্পরে এইভাবে সংযোগের দ্বারাই জনগণ শিক্ষিত হয়ে উঠবে।

এক কড়িও খরচ হবে না

মনে রাখতে হবে, গ্রামে যেশিল্প চালু আছে শুধু সেইশিল্পের মাধ্যমে শিক্ষা দিতে হবে, তাহলেই নঈ-তালীম সফল হবে। গ্রামে যদি চরখা প্রচলিত না থাকে, তাহলে গ্রামের লোকেদের উপর নতুন করে চরখা চাপিয়ে চরখাকে শিক্ষার মাধ্যম বানাবার দরকার কী? আমি যদি গ্রামে শিক্ষকতা করতে যাই, তাহলে আমার তো এক-পয়সারও দরকার হবে না। আমি গ্রামবাসীদের বলব, আমাদের উদ্দেশ্য জ্ঞানের সাহায্যে অজ্ঞানকে দূর করা। আমার জ্ঞান আছে আর এখানে আছে অজ্ঞান, তাই এখানে আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে। যদি এখানে অজ্ঞান না থাকত, তাহলে আমার আসার কোন সার্থকতা থাকত না। আর আমার যদি জ্ঞান না থাকত

তাহলেও এখানে আসার কোন অর্থ থাকত না। কিন্তু এখানে উভয়ের (জ্ঞান ও অজ্ঞানের) সম্মিলন-ক্ষেত্রে শিক্ষার কাজ বেশ ভালই হবে।' গ্রামে যদি কৃষিকাজ হয় তো আমি কৃষিকাজ করব, সেখানে যদি গো-পালন প্রধান কাজ হয়, তবে তাই আমি করব। আমি গোসেবার সঙ্গে-সঙ্গে গ্রামবাসীদের উপনিষদ শেখাব। নঈ-তালীমের জন্যে পুস্তক একান্তভাবে প্রয়োজনীয় নয়, পাওয়া যায় ভাল, না পেলেও ক্ষতি নেই। প্রচলিত স্কুলগুলিতে অন্ততপক্ষে ব্ল্যাকবোর্ড, খড়ি আর বই তো চাই-ই। কিন্তু নঈ-তালীমে এসবের কিছুরই প্রয়োজন নেই। ভগবান আমাকে কথা বলবার জন্যে মুখ দিয়েছেন আর লোকেদের শুনবার জন্যে কান দিয়েছেন, সকলকে বসবার জন্যে জায়গা দিয়েছেন। স্কুলের জন্যে এছাড়া আর কী চাই? শুধু চাই একজন এমন সুশিক্ষক, যিনি গ্রামজীবনের সঙ্গে সম্বন্ধ রেখে শিক্ষা দেবেন।

সকলের সমান বেতন

সরকার ঠিক করেছে, 'বেসিক'-শিক্ষা চালাবে। ঠিক করেছে কংগ্রেস, তো সরকারও ঠিক করেছে। এখন এই শিক্ষা চলবে। আর এই শিক্ষার বহিরঙ্গও মোটামুটি ঠিক হয়ে গেছে—কয়েকটি মূল শ্রমশিল্পের মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়ার পদ্ধতিই এর মূল কাঠামো। কিন্তু বহিরঙ্গই কি যথেষ্ঠ? একটি মূলমন্ত্রের কি প্রয়োজন নেই? মন্ত্রহীন তন্ত্র তো লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারবে না। শরীর-শ্রমনিষ্ঠা ও সাম্যযোগ নঈ-তালীমের মন্ত্র। তাই নঈ-তালীমে শিক্ষকদের যোগ্যতার তারতম্যের উপর বেতন নির্ভর করে না—যোগ্যতা সমান

নয় বলে বেতনও সমান হবে না, এমন নয়। কারও বেতন ৪০৲, কারও ৮০৲ আর কারও ১০০৲—শিক্ষাবিভাগে এই-যে শ্রেণীভেদের ব্যবস্থা করা হয়েছে, নঈ-তালীমে তা চলতে পারে না। নঈ-তালীমে শিক্ষকদের বেতন সমান থাকবে। এতে যে সব সময় কম খরচ হবে, তা না-ও হতে পারে। এমনও হয়তো দেখা যাবে যে, সকলকে সমান বেতন দিতে গিয়ে খরচ বেশী হয়ে যাচ্ছে। আমি এখানে নঈ-তালীমের ব্যয়সংকোচের পন্থা নির্দেশ করছিনা, সাম্যযোগ কি করে সাধন করতে হবে সেই পন্থাই নির্দেশ করছি। সাম্যযোগ না হলে নঈ-তালীমের অগ্রগতি রুদ্ধ হয়ে যাবে।

নঈ-তালীমে শরীর-শ্রমের এবং বৌদ্ধিক শ্রমের মূল্যে কোন পার্থক্য করা হয় না। এ কথাও স্বীকার করা হয় যে, বিভিন্ন নেতা, ব্যবস্থাপক প্রভৃতির বেতনেরও তারতম্য থাকবে না। মন্ত্রীও নেতা, শিক্ষকও নেতা। এইসব নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের বেতন সমান হওয়া চাই। তা যদি না হয়, তাহলে শিক্ষার্থীদের নঈ-তালীমের উপর শ্রদ্ধা হবে কেন? আরও বিশদভাবে বিবেচনা করলে দেখা যাবে যে, 'বেতন' কথাটিই ত্রুটিপূর্ণ, বেতনের পরিবর্তে 'দক্ষিণা' বলাই ঠিক।

অসত্যই মহাপাপ

সমাজে যে-নৈতিকমূল্যবোধ প্রচলিত আছে, তার পরিবর্তন করা দরকার। সকলের মধ্যে এইবোধ অত্যন্ত উজ্বল হওয়া চাই যে, সকল অপগুণের মধ্যে 'অসত্য'ই সর্বাপেক্ষা হেয়। আর সব দোষ, কিম্বা রোগ। সংস্কৃত-শাস্ত্রে স্বর্ণ অপহরণ, মদ্যপান ও

ব্রহ্মহত্যা মহাপাতক বলে উল্লিখিত হয়েছে। এসকল দুষ্কৃতি থেকেও 'অসত্যাচরণ' মহাপাপ। গোপনতার দ্বারাই পাপ স্থায়ী হয় আর অসত্যই পাপ গোপন করার মূলে। অতিভোজনের ফলে কারও মৃত্যু হলে, তার প্রতি ঘৃণা না হয়ে দয়াই হয়ে থাকে। তেমনি সমাজে যদি নৈতিক দোষসম্পন্ন ব্যক্তিদের ঘৃণা না করে দয়া করা হয়, তাহলে এইসব দোষ গোপন করার প্রবৃত্তি আস্তে-আস্তে চলে যাবে। অসত্যাচরণই হেয়তম পাপ—এই ধারণা যদি জন-মানসে দৃঢ়বদ্ধ হয়, তাহলে গোপন করার প্রবৃত্তি সম্পূর্ণরূপে দূর হবে।

শ্রমশালাদ্বারা শিক্ষা

নঈ-তালীমে জীবনধারণের জন্যে কয়েকটি প্রয়োজনীয় কারিগরী শিল্পকে মুখ্যস্থান দেওয়া হয়েছে। আমরা আশাকরি যে, এই সকল শিল্পের সাহায্যে জনগণ সুশিক্ষিত ও মার্জিত হয়ে উঠবে। বহু স্থানেই এর প্রয়োগ দেখেছি। দেখেশুনে বলতে বাধ্য হচ্ছি যে, এদ্বারা শিক্ষাসমস্যার সমাধান হয়েছে বলে আমার মনে হয় না। এতে প্রয়োগকর্তাদেরও যে বিশেষ দোষ আছে, তা বলতে পারি নে। এখন পর্যন্ত এই পদ্ধতি তো নতুনই রয়েছে, তাই এর স্বরূপ ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বিভিন্ন লোকের বিভিন্ন ধারণা হচ্ছে। আর যার যেরকম মনে হচ্ছে, তিনি সেইভাবে একে সফল করতে চেষ্টা করছেন। কোথাও-কোথাও হয়তো দু-একজন প্রতিভাশালী কর্মী

আছেন, তাঁরা ঠিক বুঝতে পারছেন আর সেই অনুসারে সম্ভাব্য ত্রুটিগুলি সংশোধন করে নিচ্ছেন। নতুন বিচারধারা যুগে-যুগে এমনি করেই অগ্রসর হয়।

শিক্ষার নতুন রূপ

নঈ-তালীম প্রয়োগ করার অন্য একটি উপায় আমার মনে হচ্ছে। এই উপায়ে একেবারে যারা শিশু তাদের শিক্ষা দেওয়া যাবে না, কিন্তু একটু যারা বড় হয়েছে সেইসব ছেলেমেয়েদের শিক্ষা দেওয়া যেতে পারে। শিক্ষা পাওয়ার জন্যে তারা বিদ্যালয়ে এসেছে একথা তাদের বলা হবে না। কারখানায় যেমন শ্রমিকদের 'রোজ' দেওয়া হয়, ওদেরও তেমন দেওয়া হবে। ওরা ভাববে তারা খেটে মাইনে পাচ্ছে। কারণ প্রথমদিন থেকেই আমি ওদের মজুরী দিতে আরম্ভ করব। আমার বিদ্যালয় বেকারদের কাজ দেওয়ার জায়গা বলে পরিচিত হবে। এই কাজের মধ্যে ২।১ ঘণ্টা বাঁচিয়ে জীবনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নানাব্যাপার সম্বন্ধে আমি তাদের উপদেশ দেব। বিষয়গুলি আগে থেকে ঠিক করা থাকবে না। কাজ করতে-করতে যেসব বিষয় উপস্থিত হবে, তা নিয়েই আলোচনা করব। সঙ্গে-সঙ্গে ওরা যে-কাজ করবে তা কি করে উন্নত প্রণালীতে করা যায়, তা আবিষ্কার করার চেষ্টা করা হবে। তারা যাতে সুস্থ থাকে সেই ব্যবস্থাও করব। লোকে জানবে আমি এক কারখানা খুলেছি। কিন্তু এর মধ্য দিয়ে আজকালকার নঈ-তালীমের বিদ্যালয়ে যেশিক্ষা দেওয়া হচ্ছে, তার চেয়ে ভাল শিক্ষা ছেলেরা পাবে।

শ্রমশালায় নঈ-তালীম

উপরোক্ত উপায়ে শিক্ষা দেওয়ার কথা কোন কল্পনা থেকে বলছি না। 'পওনারে' ১৪।১৫-বছর বয়স থেকে ১৮-বছর বয়সের ছেলেরা দৈনিক আট-ঘণ্টা কাজ করে উপরোক্তভাবে উপার্জন করত। কারখানাটা ছিল সূতাকাটার। আমি প্রতিদিন ২।১ ঘণ্টা করে ওদের কাছে থাকতাম। প্রথম-প্রথম ওরা কি উপায়ে বেশী পয়সা পেতে পারে সেইকথা ভাবতাম। ছেলেরা ডান হাতে সূতা কাটত, আমি তিন-মাস বাঁ-হাতে সূতা কাটালাম। তারপর অদল-বদল করে দুহাতে সূতাকাটা হত।

তাদের সূতার গুণ্ডিগুলি প্রত্যেকটি একই নম্বরের হত না, কিছু সূতা মোটা হত তো কিছু সরু। মাইনে দেওয়ার সময় কর্মকর্তারা সব চেয়ে মোটা সূতার যে-মজুরী, সব সূতার মজুরীই সেই হারে দিতেন। এতে তাদের কত গুণ্ডির মজুরী লোকসান হল, তা হিসাব করে নিতে শেখানো হত। ৬৪০-তারের গুণ্ডিতে ৪০।৫০ তার কম হয়ে যেত। এ ভাবে কি করে ঠিক-ঠিক গুণতে হয়, তাও তাদের শিখিয়েছিলাম। প্রথম-প্রথম তাদের নিয়মনিষ্ঠার অভাব ছিল। সূতাকাটা থামিয়ে মধ্যে-মধ্যে গল্প করতে আরম্ভ করত। এরকম করলে কাজ করবার শক্তি কতটা অপচয় হয় তা ওদের পরীক্ষা করে দেখিয়েছিলাম। অনেকক্ষণ মৌন থেকে কাজ করলে যে বেশী সূতা কাটা যায় আর মজুরীও বেশী পাওয়া যায়, নিজেরা পরীক্ষা করে একথা তারা বুঝতে পেরেছিল। এর পর ৮-ঘণ্টার পরিবর্তে ৭-ঘণ্টা সূতাকাটার জন্যে রেখে ১-ঘণ্টা বিভিন্ন

আলোচনায় ব্যয়িত হতে লাগল। এ ছাড়া ছেলেরা নদীতে সাঁতার কাটত, খেলত, বেড়াত, গীতার শ্লোক মুখস্থ করত এবং বিভিন্ন পর্বের ছুটিতে কাজে লাগতে পারে এমন নানাজ্ঞান লাভ করত। এইভাবে তারা একদিকে যেমন আগের চেয়ে বেশী উপার্জন করত আবার অন্যদিকে তেমন নানাবিষয়ে শিক্ষালাভও করত। প্রথমে যারা বালক ছিল তারাই ক্রমে দায়িত্বশীল নাগরিকে পরিনত হল। এখন এরা নিজের হাতে সূতা কেটে নিজেরা কাপড় বুনে নেয় এবং গ্রামপঞ্চায়েতের দায়িত্বভারও গ্রহণ করে। তাছাড়া এরা পওনারের সর্বসাধারণের কাজেও অংশ গ্রহণ করে। বর্তমানে গ্রাম সাফাই-এর ভার নেওয়ার কথা বিবেচনা করছে। এই সমস্ত শিক্ষা পূর্বোক্ত শ্রমশালায় কাজ করেই হয়েছে। শ্রমশালা বেশীদিন চলে নি, কারণ কিছুদিন পরেই আমাকে জেলে যেতে হল। পরে তা একেবারেই বন্ধ হয়ে গেল। যদি ঐ শ্রমশালার কাজ চলতে থাকত, তাহলে তা নঈ-তালীমের একটি সফল প্রয়োগক্ষেত্র হয়ে উঠত। যদিও তার নাম শ্রমশালাই থাকত।

মূলোদ্যোগের খেলা

যেসব বিদ্যালয়ে শ্রমশিল্পের মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে, আমি দেখছি তাদের মধ্যে অনেক বিদ্যালয়েই তা ঠিকভাবে হয় না। কিছুটা হয় লোক দেখানোর কাজ আর কিছুটা হয় বাইরের সাজ-সজ্জা বজায় রাখার। ঐসব বিদ্যালয়ে কিছু কাজের সঙ্গে কিছু জ্ঞান জুড়ে দেওয়া হয়, মনে হয় খেলা করা হচ্ছে। এর চাইতে কি পরিশ্রমালয় অনেক বেশী ভাল নয়? শ্রমিকদের কাজে একটা

গাম্ভীর্য থাকে। মজুর জানে যে, ভাল করে কাজ না শিখলে সে রোজগার করতে পারবে না। কিন্তু এইসব বিদ্যালয়ের শ্রমশালায় কেমন একটা অবাস্তব পরিবেশ দেখতে পাওয়া যায়।

বাস্তুহারা বালকদের শিক্ষা

সরকার উদ্বাস্তু ব্যক্তিদের ছেলেমেয়েদের শিক্ষার ভার তালীমী-সংঘের উপর ন্যাস্ত করতে চান। আমার মনে হয় এইসব ছেলে-মেয়েদের মধ্যে যারা একটু বেশী বয়সের, তাদের যদি উপরোক্ত প্রকারের শ্রমশালায় নিযুক্ত করে নঈ-তালীম পদ্ধতিতে শিক্ষা দেওয়া যায়, তাহলে ভাল হয়। তবে, যাতে শ্রমশালাগুলির ব্যবস্থাপকরা প্রত্যেকে সুশিক্ষক হন, সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। শিক্ষাদান এইসব ব্যবস্থাপকদের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য হওয়া চাই। এঁরা স্বেচ্ছায় কাজ করবেন আর শ্রমশালাগুলিকে বিদ্যায়তনে পরিণত করবেন।

—(সর্বোদয়' সেপ্টেম্বর ১৯৪৯)

একঘণ্টার পাঠশালা

কিছুদিন থেকে আমি 'একঘণ্টা'র পাঠশালার কথা বলছি। এই পরিকল্পনা অনুসারে গ্রামে-গ্রামে সরকারী নয়, গ্রামীন স্কুল থাকবে। আর তা সকালবেলা ৫টা থেকে ৬টা—কেবল ১-ঘণ্টার জন্যে বসবে। নঈ-তালীম অর্থ 'একঘণ্টার পাঠশালা'—আমার মনে এই ধারণা ক্রমেই দৃঢ়বদ্ধ হচ্ছে। আমি আশা করতে পারিনি

যে, দেশবাসীরা এই বিচিত্র পরিকল্পনা গ্রহণ করবেন। কিন্তু এখন বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করছি, বহুলোক এই পরিকল্পনাকে শুধু গ্রহণযোগ্যই মনে করছেন না, তাঁদের মতে এটি হৃদয়গ্রাহী এবং কল্যাণকরও। এ আমাদের সকালবেলার মৌলিক পাঠশালা।

একঘণ্টার কলেজ

ভবিষ্যতে একঘণ্টার কলেজও হবে। এই কলেজ রাত্রিবেলা বসবে। পোনেরো বছরের নীচের ছেলেমেয়েরা সকালের স্কুলে পড়বে আর ১৫-বছর পূর্ণ হওয়ার পর কলেজে পড়বার যোগ্যতা লাভ করবে। যাঁরা স্কুলে পড়েনি তারাও ১৫-বছর বয়সের পর কলেজেই ভর্তি হবে, স্কুলে নয়। স্কুলে শিক্ষণীয় বিষয় হবে—লিখন, পঠন ও গণিত। আর কলেজে হবে শ্রবণ, কীর্তন, ভজন প্রভৃতি। ছেলে-মেয়েরা সারাদিন মা-বাবার কাজে সাহায্য করবে, শিক্ষকও তখন নিজের কাজকর্ম করবার জন্যে মুক্ত থাকবেন। স্কুলে কাজ করবার জন্যে শিক্ষক বেতন পাবেন না। বছরের শেষে প্রত্যেক চাষীর কাছ থেকে তিনি কয়েক সের করে শস্য পাবেন।

পাঠশালায় ও মহাবিদ্যালয়ে (কলেজে) অধীতব্য বিষয়সমূহ হবে গ্রামে প্রচলিত কৃষি, শিল্প প্রভৃতি সম্পর্কিত। উদ্যোগ (শিল্প) বলতে প্রচলিত অর্থ ছাড়াও রান্না, গৃহকর্ম, সাফাই, উৎসব-সমারোহ, মৃতের সংকার, ধাত্রীবিদ্যা ইত্যাদি বুঝতে হবে।

গ্রামে যেসব উদ্যোগ প্রচলিত আছে তাদের উন্নত করা এবং নতুন-নতুন উদ্যোগের প্রচলন করার দায়িত্ব গ্রাম-পঞ্চায়েতের উপর ন্যস্ত থাকবে। শিক্ষক এই গ্রাম-পঞ্চায়েতের অন্যতম সদস্য হবেন।

পঞ্চায়েত যদি আদর্শ শ্রমশালা, কৃষিক্ষেত্র প্রভৃতি পরিচালনা করে, তবে শিক্ষক ও ছাত্ররা দৈনিক তিনঘণ্টা সেসব জায়গায় কাজ করতে পারবে। এইকাজের জন্যে তারা পারিশ্রমিক পাবে, তবে টাকা-পয়সার পরিবর্তে পণ্যের দ্বারা দেওয়া হবে। গ্রাম-পঞ্চায়েত যেসব উদ্যোগ গ্রহণ করতে চাইবে না, তা উচিত কি অনুচিত হবে—সেসব বিচারের ভার স্কুলের উপর থাকবে না। বিশেষ কোন উদ্যোগের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করানোর ভার থাকবে মহাবিদ্যালয়ের উপর। প্রস্তাবিত আবশ্যকতা হৃদয়ঙ্গম করার পর, পঞ্চায়েত ঐ উদ্যোগ প্রচলনে যত্নবান হবে এবং পরে স্কুলে সেই উদ্যোগ গৃহীত হবে। সবসময় একথা মনে রাখতে হবে যে, শিক্ষাকার্যে সফলতার জন্যে অর্থের প্রয়োজন নেই, বরং শিক্ষা অর্থ-নিরপেক্ষ হওয়াই দরকার।

—('সর্বোদয়', ডিসেম্বর ১৯৫৪)

ভারতীয় শিক্ষাশাস্ত্র

লোকশিক্ষার ব্যাপারে মূল ছেড়ে শাখা-প্রশাখা নিয়ে আমাদের পড়ে না-থাকা চাই। প্রৌঢ়-শিক্ষার ব্যাপক প্রয়োগের ব্যয়ভার এবং এর প্রসারের প্রতিবন্ধকতা প্রভৃতির এক কার্য-বিবরণী সম্প্রতি সরকার প্রকাশ করেছেন। এই বিবরণী পাঠ করে আমার লোক-শিক্ষা সম্বন্ধীয় উপরোক্ত মত আরও দৃঢ় হয়েছে। ভাল নামকরণ হলেই আমরা মনে করি সমস্যার অনেকটা সমাধান হয়ে গেল, তাই

প্রৌঢ়-শিক্ষার নাম দেওয়া হয়েছে লোকশিক্ষা। কিন্তু প্রকৃত-পক্ষে লোকশিক্ষার নামে যা হচ্ছে, তা তো শুধু নিরক্ষরতা দূর করাই।

তোতাপাখীর বুলি আওড়ানো

সাক্ষরতা প্রচার করার কথা যখন চিন্তা করি, তখন আমার মনে বাল্যকালের এক স্মৃতি জেগে ওঠে। ব্রাহ্মণদের কৌলিক রীতি অনুসারে বাল্যকালে আমাকে বৈদিক-সন্ধ্যা শেখানো হয়েছিল এবং ৭-দিনের মধ্যে আমার তা কণ্ঠস্থও হয়ে গিয়েছিল। মা প্রায়ই এইকথা উল্লেখ করে সকলের কাছে আমার প্রশংসা করতেন। কয়েকবার আমি নিজের কানেও এই প্রশংসা শুনেছিলাম। সম্ভবত তা আমার ভালও লেগেছিল। কিন্তু একদিন মাতাপুত্রে নিম্নলিখিত কথোপকথন হল—

আমি—'মা, আমার সন্ধ্যাবন্দনার মন্ত্র মুখস্থ করার আশ্চর্য নিপুণতার কথা তো খুব বলে বেড়াচ্ছ। কিন্তু এর সঙ্গে-সঙ্গে আমার যে আরেক আশ্চর্য ক্ষমতাও আছে, সেকথা তো তুমি কিছুই জান না।'

মা—'সে আবার কি ?'

আমি—'বিন্যা যে-জিনিস ৭-দিনের মধ্যে শিখে ফেলেছিল, তার চেয়ে অনেক কম সময়ে তা আবার সে ভুলেও গেছে।'

কবি ওয়ার্ডসওয়ার্থের কথা মনে পড়ে—'আমরা অর্থ উপার্জন করতে শক্তি ক্ষয় করি, আবার সেই অর্থ খরচ করতেও শক্তি ক্ষয় করি।'

কার্যকরী শিক্ষা সাধন

আমরা যদি সাক্ষরতা প্রচারের দ্বারা সমাজের ক্ষতি না চাই, তাহলে সার্থক শিক্ষা প্রচারের জন্যে আমাদের প্রয়াসী হতে হবে। এই চেষ্টাকে সফল করতে হলে কাজের সাহায্যে পাঠ গ্রহণ করতে হবে আর এই উপায়ই ন্যূনতম ব্যয়সাধ্য।

চিন্তার দারিদ্র্য

প্রাচীনকালে এই উপায়েই অধ্যয়ন-অধ্যাপনা হত। সর্বোত্তম ভাবনা সর্বদা শোনা ও শোনানো কর্তব্য। নবধা ধর্মসাধনের প্রথম তিনটি হল—শ্রবণ, কীর্তন ও স্মরণ। সরকারী রিপোর্টে কেরোসিন তেল বাবত খরচের যে-হাঙ্গামার কথা বলা হয়েছে, সে-হাঙ্গামার কোন প্রয়োজন প্রাচীন পদ্ধতিতে দেখা যায় না। আমাদের নিদারুণ আর্থিক দৈন্যের কথা জানা ছিল, কিন্তু তার সঙ্গে দেখছি মানসিক দৈন্যও অত্যন্ত বেড়ে গেছে।

যে কান শোনে না হরিগুণ গান, শ্রবণ-রন্ধ্র সে অহি-ভবন সমান।
যে করে না কভু রামগুণ গান, জীবন তাহার হয় দাদুর সমান॥

শ্রুতি, স্মৃতি ও কৃতি

সংক্ষেপে 'শ্রুতি, স্মৃতি ও কৃতি'—এই হল আমাদের শিক্ষা-শাস্ত্র। হাজার-হাজার বছরের অভিজ্ঞতার ফলে এই শাস্ত্র রচিত হয়েছে। দেশের প্রত্যেক নাগরিক জ্ঞানী হবে—এই চিন্তা আমাদের দেশে নতুন নয়। উপনিষদে রাজা অশ্বপতি স্বীয় রাজ্যের গুণগান করছেন—'আমার রাজ্যে চোর, কৃপণ, মদ্যপ, অবিদ্বান, অকর্মণ্য

একজনও নেই। দুরাচারী পুরুষই নেই, দুরাচারিণী নারীর কথা তো ওঠেই না।'

শিক্ষা ও সুরাবর্জন

চোর আর কৃপণের কথা ছেড়েই দিলাম। সকলেই জানেন দেশে এইজাতীয় অপরাধ কত বেড়ে গেছে! আর আমার আলোচনার বিষয়ও এ নয়। তবে সুরাবর্জন সম্বন্ধে ইংরেজ শাসকেরা এই মত দিয়েছে—'শিক্ষার প্রসার চাইলে সুরা বর্জন করা চলবে না।' ইংরেজদের মতো এই কথা খোলাখুলি বলতে আমাদের সংকোচ হয়, তাই আমরা ঐকথাই একটু ঘুরিয়ে বলছি। আমরা বলে থাকি—'সুরা বর্জন করা উচিত, তবে ধীরে-ধীরে না করলে আর্থিক অবনতি হবে।' আমরা মনে করি অর্থাগমের পথ রুদ্ধ হলে যাবতীয় প্রগতির পথই রুদ্ধ হয়ে যাবে। কাজেই সাক্ষরতার অগ্রগতিও রুদ্ধ হয়ে যাবে—(ইংরেজদের মতো) সোজাসুজি একথা বলার আর দরকার কী ?

নিরক্ষরতা ও ব্যসনমুক্তি

দেখা যাচ্ছে লোকশিক্ষার নামে সাক্ষরতা প্রচার করতে গিয়ে সুরাবর্জন করা সম্ভব হচ্ছে না। (সুরাবর্জন করলেই আয় কমে যাবে আর আয় কমলেই সাক্ষরতা প্রচারের টাকা মিলবে না)। তাই যদি হয় তাহলে আমি বলব, 'আমাদের দেশ নিরক্ষর থাকলে কোন ক্ষতি নেই, কিন্তু আজই তাকে ব্যসনমুক্ত করতে হবে।'

শিক্ষিত লোকের শ্রেণী

দেশে একজনও অবিদ্বান নেই—অশ্বপতির এই সাক্ষ্যের তাৎপর্য

কী? এই নয় কি যে, প্রত্যেক নাগরিক সম্যকরূপে একথা হৃদয়ঙ্গম করেছিল—চুরি, কৃপণতা, পানাসক্তি, আলস্য ও দুষ্ক্রিয়া থেকে বিরত হওয়াই মানুষের কর্তব্য। এর সঙ্গে অক্ষরজ্ঞানের কী সম্বন্ধ আছে? কারণ দেখতে পাচ্ছি যে, লেখাপড়া জানা লোকেরাও এই সকল পাপে মগ্ন হয়ে আছে। একথা জেনেও কি সকলকেই ঐ শ্রেণীভুক্ত করা প্রয়োজন?

বুনিয়াদী-শিক্ষা

আমি একথা বলছি না যে, লেখাপড়া শিখেছে বলেই এরা পাপাসক্ত হয়েছে। আমি শুধু দেখাতে চেয়েছিলাম লোকশিক্ষাতে কেবল অধ্যয়নের উপর অত্যধিক জোর না দেওয়াই ভাল। এই ব্যয়বহুলতার ফাঁদে না পড়াই ঠিক। লোকশিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য ও কার্যক্রম যথার্থ অনুধাবন করে বাল্যকালেই যাতে নিরক্ষরতা দূর হয় সেইচেষ্টা করা সমীচীন এবং অল্পবয়স্কদের জন্যে বুনিয়াদী-শিক্ষার উপর অধিকতর মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন।

—('সর্বোদয়', ডিসেম্বর ১৯৪৯)

সাক্ষরতা-প্রচার

এখন মহীশূরে শিক্ষা-সম্মিলনীর অধিবেশন চলছে। এই অধিবেশনের আলোচ্য বিষয় হচ্ছে, দেশে প্রৌঢ়-শিক্ষার কী ব্যবস্থা করা যাবে। নানাদেশের শিক্ষাবিদেরা এই সম্মেলনে মিলিত

হয়েছেন। আশাকরি, এইবিষয়ে পরস্পরের মধ্যে চিন্তার আদান-প্রদানের ফলে সকলেই উপকৃত হবেন।

শিক্ষার কাল্পনিক বিভাগ

দেশের শিক্ষাসম্বন্ধে চিন্তা করতে গিয়ে এ কথাটাই আমার বারবার মনে হয় যে, আমরা শিক্ষাব্যাপারটিকে বৃথা জটিল করে তুলেছি। মূল বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য স্থির রাখাই সমস্যা সমাধানের প্রকৃষ্ঠ উপায়। আমরা তা না-করে নানা সংশ্লিষ্ট বিষয় নিয়েই মাথা ঘামাই। এতে শক্তির অপচয় হয়।

শিক্ষার মুখ্য উদ্দেশ্য প্রত্যেক মানুষকে কর্মনিপুণ ও মার্জিত-বুদ্ধিসম্পন্ন করে তোলা। আমরা কিন্তু একই শিক্ষার নানাবিভাগ করেছি। যথা—শহরের শিক্ষা, গ্রামের শিক্ষা, বয়স্ক-শিক্ষা, অল্পবয়স্কদের শিক্ষা। আবার অল্পবয়স্কদের শিক্ষারও নানাভাগ—শিশুশিক্ষা, বুনিয়াদী-শিক্ষা, স্ত্রী-শিক্ষা পুরুষের শিক্ষা, কৃষি ও শিল্প শিক্ষা, বৌদ্ধিক শিক্ষা, আর এসব থেকে ভিন্ন সাক্ষরতা-প্রচার!

যা পেলে সব পাওয়া যায়

এতসব ভিন্ন ভিন্ন শিক্ষার পদ্ধতি নির্ণয় করতে গেলে সারা-জীবন ভাবতে-ভাবতেই যাবে, কাজ আর হবে না। অল্প-অল্প করে প্রত্যেক শিক্ষাসম্বন্ধে ভাবতে গিয়ে কোনটি সম্বন্ধেই পুরাপুরি ভাবনা দেওয়া হয়ে উঠবে না। এইজন্যে একেবারে মূল ধরতে হবে। মূল শিক্ষাসম্বন্ধে আলোচনা করলেই নানাবিভাগের ধারণাও স্পষ্ট হয়ে যাবে। আমার মতে বুনিয়াদী-শিক্ষাই এই মূল শিক্ষা। বিশেষজ্ঞেরা এই শিক্ষার কাল ৭-বছর থেকে ১৪-বছর বয়স পর্যন্ত নির্ধারিত

করেছেন। অবশ্য এই কাল ৭-বছর থেকে আরও কিছু বাড়ানো যেতে পারে, ৬-বছর থেকে আরম্ভ করে ১৫-বছর পর্যন্ত করা যেতে পারে। অর্থাৎ শিক্ষা সম্পূর্ণ করার জন্যে যতটা সময় বাড়ানো প্রয়োজন বিবেচিত হবে, ততটা বাড়ানো যেতে পারবে। এই শিক্ষাকে এমন সর্বাঙ্গসুন্দর করে তুলতে হবে, যাতে সমগ্রদেশ এই শিক্ষার জন্যে ব্যাকুল হয়ে ওঠে। বুনিয়াদী-শিক্ষা ভাল করে হলে এর মধ্যেই সবরকম শিক্ষা সার্থক হয়ে উঠবে। এতে কৃষি ও শিল্প শিক্ষা হবে, বুদ্ধিবৃত্তির উৎকর্ষসাধন হবে আর সঙ্গে-সঙ্গে লেখাপড়াও হবে। অধিক বিদ্যা কী করে স্থায়ী করা যায়—এই শিক্ষাতে সেই প্রশ্নই ওঠে না। কারণ এই পদ্ধতিতে হাতেকলমে শেখা হয় বলে জ্ঞান ভাসাভাসা হয় না, খুব স্পষ্ট হয় এবং যা শেখা হয় তা ভুলবার কোন উপায়ই থাকে না। বরং এক বীজ উপ্ত হয়ে যেমন তা থেকে অসংখ্য বীজের উৎপত্তি হয়, তেমনি অধিগতবিদ্যা হতে অবিরত নানা সংশ্লিষ্ট বিদ্যার উৎপত্তি ঘটে। ফলে এই পদ্ধতিতে শিক্ষিত বিদ্যার্থী ভবিষ্যতে নিজের জ্ঞান বহুগুণে বর্ধিত করতে সক্ষম হয়।

শিক্ষাকে নানাভাগে বিভক্ত করে নিলে শিক্ষাদান কার্য দ্রুত হবে—একথাও ঠিক নয়। বুনিয়াদী-শিক্ষায় শিক্ষিত তরুণ-তরুণী ভবিষ্যতে শিক্ষিত দায়িত্বশীল নাগরিকে পরিণত হলে দেশে শিশু-শিক্ষা বা বয়স্ক-শিক্ষার সমস্যা থাকবে না। কারণ ঘরে-ঘরে এই নাগরিকেরাই পূর্ববুনিয়াদী-শিক্ষার প্রবর্তন করে শিশুশিক্ষার সমস্যা মিটিয়ে দেবেন এবং আগে থেকেই অশিক্ষা দূর হওয়াতে বয়স্ক-শিক্ষার সমস্যাও থাকবে না।

হস্তশিল্পের মাধ্যমে বয়স্ক-শিক্ষা

আজকাল যেভাবে বয়স্কদের সাক্ষর করে তোলার চেষ্টা হচ্ছে, তাতে আসলে কিছু লাভ হচ্ছে না। বয়স্কদের শিক্ষাও উদ্যোগ বা হস্তশিল্পের মাধ্যমে হওয়া উচিত। এতে কর্মহীনদের কর্ম জুটবে আর তাদের বুদ্ধিরও বিকাশ হবে।

মনে করা যাক, একটি গ্রামের মোট অধিবাসীর সংখ্যা ২০০০। এই গ্রামে যদি ৮ বা ৯ বৎসরব্যাপী পুরা বুনিয়াদী-শিক্ষা প্রবর্তন করা যায়, তবে ছাত্রসংখ্যা আনুমানিক প্রায় ৩০০ হবে। বিভিন্ন শ্রেণীর হিসাব করে অন্তত ৮।১০ জন শিক্ষকের দরকার হবে এবং তা ছাড়া আরও ২।৩ জন শিক্ষক দেওয়া যাবে। এঁরা সবাই মিলে অল্প বয়স্কদের বুনিয়াদী-শিক্ষা দেবেন আর বয়স্কদের কাজে লাগবে এমন সব কারিগরী শিক্ষা দেবেন। এইসব শিক্ষকেরা বিবিধ বিদ্যায় পারদর্শী হবেন তাই বয়স্ক কৃষকদেরও নানা ব্যবহারিক শিক্ষা দিতে সক্ষম হবেন। এছাড়া আধুনিক জগৎ সম্বন্ধে নানা জ্ঞাতব্য বিষয় শেখাবেন। ভূগোল, স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান প্রভৃতি নানাবিষয়েও শিক্ষা দিতে পারবেন।

ভ্রান্ত দৃষ্টি

কিন্তু, জাতীয় সরকার পয়সার অভাবে এখন পুরাপুরি বুনিয়াদী-শিক্ষা প্রবর্তন করতে অক্ষম—এরকম বলা হয়ে থাকে। আমি বলি যে, যে-পয়সা আছে তা এতেই লাগানো হোক। কারণ চার বছরের আংশিক বুনিয়াদী-স্কুল প্রতিষ্ঠিত করে সমস্যার মীমাংসা করা যাবে না। ৮।৯ বছরের পুরা বুনিয়াদী-শিক্ষা প্রবর্তন করলে শিক্ষা তো

সম্পূর্ণ হবেই আবার খরচও উঠে আসবে। কিন্তু কৃপণতা করে শিক্ষকের সংখ্যা কমিয়ে বয়স্ক-শিক্ষার জন্যে শিক্ষক নিযুক্ত করা হয়। বুনিয়াদী-শিক্ষার জন্যে যত জন প্রয়োজন তত জন নিযুক্ত করাই শ্রেয়। কারণ এঁরাই বয়স্ক-শিক্ষার ভারও নিতে পারবেন।

বুনিয়াদী-শিক্ষা সমুদ্রের মতো

বুনিয়াদী-শিক্ষা সমুদ্রের সঙ্গে তুলনীয়। এতে সকল প্রকারের বিচারধারা প্রবেশ করে যেমন সকল নদী সমুদ্রে গিয়ে মেশে। এই শিক্ষাতে স্ত্রী-পুরুষের পার্থক্য নেই, শহর এবং গ্রামের শিক্ষার পার্থক্যও এ শিক্ষাদ্বারা মিটে যায়। কারণ দুই জায়গাতেই যে-মূল শিক্ষার দরকার, তা ঐ বুনিয়াদী শিক্ষা। শেষের দিকে কিছু পার্থক্য করা দরকার হতে পারে। তবে এ পার্থক্য কখনও বিপরীত শিক্ষা সূচিত করবে না।

এই হচ্ছে শিক্ষার মূল। কিন্তু আমি দেখছি, এই বিষয়ে আগ্রহ ও দূরদৃষ্টির যথেষ্ট অভাব রয়েছে এবং শাখাগ্রাহী পাণ্ডিত্যেরই প্রাদুর্ভাব হয়েছে। এতে সমস্যা জটিলতরই হয়, কখনও মীমাংসায় উপনীত হওয়া যায় না। —(পরমধাম-পওনার, ৫-১১-৪৯)

হস্তশিল্পের মাধ্যমে শিক্ষার আদর্শ

ব্যায়ামের আদর্শ

হস্তশিল্পের মাধ্যমে যে-শিক্ষা দেওয়া হবে, তা একদিকে যেমন মনের উৎকর্ষ সাধন করবে অন্যদিকে তেমন শরীরেরও উন্নতি সাধন করবে। তবে শিক্ষককেও শরীরের বিকাশ হচ্ছে কি-না সেবিষয়ে দৃষ্টি রাখতে হবে। শিক্ষক যদি ঠিকমতো কাজ করার দিকে লক্ষ্য রাখেন তাহলে দেখা যাবে যে, ৫।৭ মিনিটের দ্রুত জিমন্যাষ্টিক ব্যায়ামের পরিবর্তে বহুক্ষণব্যাপী অল্প-অল্প করে শরীর চালনাদ্বারা শিক্ষার্থী কম লাভবান হবে না।

স্বাস্থ্যোন্নতি ও নৈপুণ্যের সমন্বয় না করতে পারলে অনেক লাভজনক হস্তশিল্প শরীর বিকাশের সহায়ক না হয়ে কষ্টপ্রদ হয়ে পড়ে। উদাহরণস্বরূপ ঋগ্‌বেদের প্রসিদ্ধ উক্তি 'পৃষ্ঠেব তষ্ট্‌যাময়ী'র উল্লেখ করা যেতে পারে। এর অর্থ—ছুতোরের কাজে পিঠে ব্যথা হয় আর পিঠ বেঁকে যায়। দশ হাজার বছরেও ছুতোরের কাজের এই ত্রুটি সংশোধন করা সম্ভব হয়নি। আমাদের দেশের ছুতোরদের পিঠ প্রায়ই ধনুকের মতো বেঁকে যায় আর সাধারণত তারা দীর্ঘায়ু হয় না। ছুতোরের কাজে উত্তম শরীর চালনা হওয়াতে শরীর বিকাশের পক্ষে এই কাজ খুবই উপযুক্ত, কিন্তু সারাদিন পিঠ নীচু করে ঝুঁকে পড়ে কাজ করতে হয় বলে এতে আশানুরূপ শরীরের উন্নতি হতে পারে না। ছুতোরের অনেক কাজ দাঁড়িয়ে করা যায়,

অথচ হাজার-হাজার বছরের মধ্যেও দাঁড়িয়ে কাজ করার উপায় উদ্ভাবনের দিকে দৃষ্টি দেওয়া হয়নি।

কাজের সঙ্গে ব্যায়াম

অনেকক্ষণ বসে-বসে কাজ করার পর কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে কাজ করলে কাজ ভাল হয়। একভাবে বসে কাজ না করে মধ্যে-মধ্যে বসবার ভঙ্গী বদলানো উচিত। অদলবদল করে ডান-বাঁ দুইহাতেই কাজ করা চাই। ক্লাসঘরের কুঠরীর মধ্যে কয়েক ঘণ্টা কাজ করার পর খোলা হাওয়ায় কসরৎ, বাগানের কাজ প্রভৃতি করার জন্যে কিছু সময় দেওয়া দরকার। চোখের কাজেও একঘেয়েমি না হয় এমনভাবে কাজ করা দরকার। কিছুক্ষণ কাছে তাকিয়ে কাজ করে আবার কিছুক্ষণ দূরে তাকিয়ে কাজ করা দরকার। তেমনি কিছুক্ষণ গানবাজনা করা এবং কিছুক্ষণ মৌন থাকা দরকার। মোট কথা হচ্ছে এই যে, কাজের হানি না করে এইভাবে বৈচিত্র্য আনা যায় এবং শ্রম লাঘব করার জন্যে এ করা দরকারও। তকলীতে সূতাকাটার দৃষ্টান্ত নেওয়া যেতে পারে। বসে-বসে আধঘণ্টা সূতা কেটে ৫।১০ মিনিট দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে নাটাইয়ে সূতা জড়ালে কাজেরও ক্ষতি হবে না আর ছেলেমেয়েরাও আরাম পাবে।

কাতাই-এর পাঠ্যক্রমে বলা হয়েছে যে, ড্রিলের কায়দায় সকলে একসঙ্গে সূতা কাটতে হবে। এই নির্দেশ প্রথম বছরের জন্যে হলেও সবকাজেই এই নিয়ম পালন করা প্রয়োজন। এই নির্দেশের উদ্দেশ্য হচ্ছে উদ্যোগের মাধ্যমে ব্যায়াম করানো। এছাড়াও পড়া-শুনার সময়েই হোক আর কাজ করবার সময়েই হোক, ছেলে-

মেয়েরা যাতে ঠিকভাবে বসে, ঠিকভাবে শরীর চালনা করে, সে বিষয়ে শিক্ষককে বিশেষ অবহিত হতে হবে।

সাতত্যযোগের অভ্যাস

শিশু-বিদ্যার্থীদের বসবার ভঙ্গী প্রভৃতি বারবার ভিন্ন হওয়া যেমন দরকার, হাতের কাজ ভাল করে শিখতে হলে একঘেয়েমি দূর করাও তেমনি দরকার। কিন্তু একটু বড় হলে শিক্ষার্থীদের আবার অন্য অভ্যাসও করতে হবে। একভাবে বসে একাগ্রচিত্তে অনেকক্ষণ ধরে একটি হাতের কাজ ভালভাবে করার অভ্যাসও একান্ত প্রয়োজন। এইরকম একাগ্র সাধনা বা সাতত্যযোগ সাধন আলোচ্য শিক্ষাপদ্ধতির একটি প্রধান অঙ্গ। উত্তরোত্তর এই অভ্যাসে দৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত হওয়া বিদ্যার্থীর কর্তব্য। শৈশব অবস্থা থেকেই ধীরে-ধীরে এই অভ্যাস করতে হবে। তকলী কাটবার সময় শিশুরা সাধারণত ১৫-মিনিট অন্তর হাত বদলাবে, কিন্তু সপ্তাহে একদিন ৩০।৪০ মিনিট একই হাতে একভাবে বসে সূতাকাটার অনুশীলন করবে।

সাতত্যযোগ ছাড়া কর্মযোগে সিদ্ধিলাভ করা যায় না। বর্তমানে শিক্ষিত লোকদের মধ্যে শ্রম-সাতত্য অর্থাৎ নিরবচ্ছিন্নভাবে বহুক্ষণ পরিশ্রম করার শক্তি প্রায় নেই বললেই চলে। এই ত্রুটি দূর করা দরকার। কয়েক সপ্তাহব্যাপী প্রতিদিন আধঘণ্টা করে কাজ করাই হস্তশিল্পের অন্তিম পরীক্ষা। বিদ্যার্থীকে ক্রমশ এই লক্ষ্যে উপনীত হতে হবে এবং তাকে এজন্যে যোগ্য করে তুলতে হবে। স্রোতস্বিনী পর্বতকন্দর থেকে নির্গত হয়ে নাচতে-নাচতে

এঁকেবেঁকে নীচের দিকে অগ্রসর হয়। কিন্তু যতই সাগরের কাছে আসে, ততই সে শান্ত হয়ে আসে, তার গতি হয় একমুখী। তেমনি উদ্যোগের মাধ্যমে যে-শিক্ষা, তার আরম্ভ হবে বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়ে ('তকলীর বিবিধ অভ্যাস' নামক নিয়মাবলীতে যেমন লেখা আছে) আর তার সমাপ্তি হবে সাতত্যযোগ অভ্যাসে।

ময়লা-আবর্জনার ব্যবহার

হস্তশিল্পের মাধ্যমে শিক্ষায় পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার উপর বিশেষ লক্ষ্য রাখতে হবে। কিন্তু অবশ্যম্ভাবী ময়লাকে কীভাবে কাজে লাগানো যেতে পারে সে সম্বন্ধেও চেষ্টা করতে হবে। আমাদের দেশ পৃথিবীর মধ্যে দরিদ্রতম দেশ। কিন্তু এখানকার অপচয় ও অপব্যয়ের তুলনা নেই। যে-ময়লা থেকে অমূল্য সার হতে পারে, তা আমরা অনায়াসে ফেলে দিই আর চারদিক ময়লা ফেলে রাখার দরুন রোগের প্রাদুর্ভাবকে ঠেকাতে পারিনে। মৃত পশু সম্পর্কেও ঐ একই কথা খাটে। সেগুলিকে কাজে লাগানো তো হয়ই না, উপরন্তু তা রোগের আকর হয়ে দাঁড়ায়। আমরা লেবু খাই, কিন্তু লেবুর মূল্যবান খোসা ফেলে দিই। এইরকম অপব্যয়ের অসংখ্য উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। এইসব অপব্যয় নিবারণের উপায় নির্ধারণ করবার জন্যে নানাদিক থেকে গভীর-ভাবে চিন্তা করে দেখা দরকার। যথা, কাপাস তুলার বীচি ছাড়ানোর যন্ত্রে যেসব বীচি লেগে থাকে সেগুলি পরে যন্ত্র পরিষ্কার করার সময় ফেলে না দিয়ে কাজে লাগানো যেতে পারে; দ্বিতীয়ত যে-চাটাইর উপর তুলা ধোনা হয় তার নীচে কিছুটা তুলা জমে,

সেই তুলা মোটা সূতা কাটার অথবা অন্য কোন কাজে লাগানো যেতে পারে। তৃতীয়ত চরকায় সূতা কাটতে শেখানোর সময় প্রথম-প্রথম অনেক সূতা ছিঁড়ে যায়, সেগুলি দিয়ে পিন-কুশন তৈরী করা যেতে পারে। এইভাবে প্রত্যেক হস্তশিল্পেই নানাভাবে অপচয় নিবারণ করা যায়।

সৌন্দর্যবোধ

ছোট ছেলেমেয়েদের পক্ষে সুন্দর এবং সুগঠিত জিনিস তৈরী করা সম্ভব নয় বলে অনেকে মনে করেন। এ বিষয়ে প্রায়ই লোকেরা প্রশ্নও করেন। ধীরভাবে চিন্তা করে দেখলে বোঝা যায় যে, এই ধারণা অমূলক। অভিজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রই জানেন যে, ছোট ছেলেরা উত্তম আর সমান (uniform) সূতা কাটতে পারে। তারা অনুকরণপ্রিয়, এই কারণে তারা সৌন্দর্যও অনুকরণ করতে পারে।

বাবাকে আস্ত-আস্ত রসগোল্লা-সন্দেশে থালা সাজিয়ে দিয়ে ছেলেকে সেইসব খাবারই অর্ধেক-অর্ধেক করে খেতে দিলে, ছেলে কিছুতেই তার থালা নিতে চায় না। কারণ সে খাবারগুলি আস্ত-আস্ত পেতে চায়। ছোট-ছোট অথচ আস্ত রসগোল্লা-সন্দেশে তার আপত্তি হয় না, কিন্তু বড়-বড় মণ্ডা টুকরো করে দিলে তার মন ওঠে না। কেজো লোকের হিসাবী বুদ্ধি ছোটদের পক্ষে গ্রহণ করা সহজ না হলেও, তারা অনায়াসেই সৌন্দর্যকে গ্রহণ করতে পারে।

কিন্তু নম্বর দেওয়ার সময় সৌন্দর্যের জন্যে ১০ নম্বর দেওয়া হয় আর অন্যান্য গুণের জন্যে ৯০। আমাদের মূল্য নিরূপণের এই ভ্রান্ত পদ্ধতি ত্যাগ করতে হবে। যে বস্তু সুন্দর নয়, তার কোন মূল্য না

থাকাই উচিত। সূতাকাটা সম্বন্ধে আর একটা উদাহরণ নেওয়া যাক। পাঁজগুলি সরু আর লম্বা হলে খুব সুন্দর দেখায়, তাই ছোটরা লম্বা-লম্বা পাঁজ পছন্দ করে। পাঁজগুলি বেশ লম্বা-লম্বা হলে ছোটরা যত খুশী হয়, বড়রা তত হয় না। বড়রা ভাবেন, পাঁজ লম্বায় কিছু কম হলে ক্ষতিটা কি ? তাতে তো আর সূতাকাটা সহজ হবে না ? তাছাড়া পাঁজ লম্বা করতে হলে বেশী মনোযোগ দিতে হয়, সময়ও বেশী লাগে অথচ লাভ বিশেষ কিছুই হয় না।—এঁদের কাছে সৌন্দর্যের কোন মূল্য নেই। এই জাতীয় সৌন্দর্যজ্ঞানহীন লোকদের উদ্দেশ্যেই হয়তো ধর্মশাস্ত্রে বলা হয়েছে—'সমান আকারের পাঁজের দ্বারা (অর্থাৎ সৌন্দর্যের দ্বারা) স্বর্গলাভ হয়।' অল্পবয়স্কদের শিক্ষায় কোন বস্তুর প্রয়োজনীয়তার উপর অতিরিক্ত জোর দেওয়া ঠিক নয়। কাজের পরিমাণ বেশী না হলেও চলে, কিন্তু কাজটা সুন্দর করে করবার দিকেই দৃষ্টি রাখতে হবে। তাৎপর্য এই যে, সৌন্দর্যের জন্যে কাজের পরিমাণ কম হলে ক্ষতি নেই ; কিন্তু আস্তে-আস্তে কাজ করার জন্যে যদি কাজের পরিমাণ কম হয়, তাহলে সেটা সমর্থন করা চলবে না।

সমবেত ভাবনা

শিক্ষার্থীদের মধ্যে সমবেতভাবে পরস্পরের সহযোগিতা করে কাজ করার মনোভাব সৃষ্টি করাই শিক্ষকের কর্তব্য। তা যদি তাঁরা না করতে পারেন, তাহলে কিছুই করা হল না। সমবেত-ভাবে কাজ করার মনোভাব আমাদের মধ্যে সাধারণত দেখাই যায় না। জাতীয় সংকটকালে আমরা অবশ্য ঐক্যবদ্ধ হই, কিন্তু

সাধারণত নিজ-নিজ পারিবারিক কর্তব্যের বাইরে জনসাধারণের কাজে আত্মনিয়োগ করতে আমরা অভ্যস্ত নই।

কৃষি ও শিল্পের মাধ্যমে সমষ্টি-মনোভাব সৃষ্টি করা শিক্ষার এক প্রধান উদ্দেশ্য বলে জানতে হবে। দৃষ্টান্তস্বরূপ সূতাকাটার কথা বলা যেতে পারে। মনে করুন কোন এক শিক্ষার্থী ধুনাই-এর কাজ করতে পারে না। এই অবস্থায় তার তুলোটা অন্যান্য সহকর্মিদের প্রসন্নচিত্তে ধুনে দেওয়া উচিত। নিজের তুলো যত ভাল করে ধুনি অন্যের তুলো তারচেয়েও ভাল করে ধুনব—এইরকম মনোভাব সকলের হওয়া চাই। ধুনাই, সূতাকাটা প্রভৃতির পর নিজ-নিজ আবর্জনাগুলি প্রত্যেকেরই পরিষ্কার করা উচিত। কিন্তু যদি দুই-একজন তা না করে, তা হলে অন্যদের সেই আবর্জনা পরিষ্কার করার ভার নিজেদের বলে মনে করতে হবে।

নিজের সূতা কাটার গতি বেশী হলেই আমি সন্তুষ্ট হব না, আমার ক্লাসের সকলের গড়পড়তা গতি বেশী হোক— এরকম মনোভাব প্রত্যেক শিক্ষার্থীর হওয়া চাই। এই মনোভাব গড়ে তুলবার জন্যে ব্যক্তিগত উন্নতির হিসাব ও সমষ্টিগত উন্নতির হিসাব একই সঙ্গে যাতে করা হয় এই বিষয়ে প্রত্যেক বিদ্যার্থীর দৃষ্টি রাখা দরকার।

প্রত্যেক শিক্ষার্থীরই নিজ-নিজ চরখার মালদড়ি তৈরী করতে শিখতে হবে, কিন্তু যদি কখনও ক্লাসের সকলের মালদড়ি তৈরী করার ভার একজনের উপর দেওয়া হয়, তাহলে সেই কাজ আনন্দের সঙ্গে ও সাবধানতা সহকারে করা উচিত।

প্রত্যেকের সূতার ভালমন্দ বিচারের জন্যে আলাদা-আলাদা বুনাই-এর প্রয়োজন আছে। সঙ্গে-সঙ্গে কিছু কাপড় ক্লাসের সকলের সূতা দিয়ে তৈরী করে বিদ্যালয়ের সংগ্রহালয়ে রাখা দরকার। 'এই কাপড় আমাদের ক্লাসের সূতার কাপড়'—এইরকম সপ্রেম ও সামূহিক চেতনা ছাত্রদের মধ্যে উৎপন্ন করতে হবে। ক্লাসের সূতায় যে-কাপড় হয়েছে, তার দোষ-গুণ সকলেরই দোষ-গুণ—একথা যেন শিক্ষার্থীরা ভাবতে শেখে। 'তুই সূতা কাটায় উন্নতি করতে পারছিস না, নিশ্চয়ই মনোযোগ দিচ্ছিস না, দেখতো অন্যান্য ছাত্রেরা এগিয়ে গেল, তোর লজ্জা হচ্ছেনা?'—শিক্ষকদের এইরকম বকাবকি করা কখনও উচিত নয়। বরং তাঁর একথা বলা উচিত, 'তুই এখন পর্যন্ত সূতাকাটার দিকে ভাল করে মনোযোগ দিচ্ছিস না, তাহলে তোর ক্লাসের উন্নতি কী করে হবে? ক্লাসের কাজের উৎকর্ষের জন্যে ক্লাসের প্রত্যেকেরই পুরাপুরি চেষ্টা করা চাই।' এইভাবে নানা উপায়ে শিক্ষার্থীদের মধ্যে সকলের প্রতি মৈত্রী ভাবনা উৎপন্ন করতে হবে।

সাধর্ম্য-বৈধর্ম্য-প্রক্রিয়া

কোন একটি হস্তশিল্পের ভিন্ন-ভিন্ন কার্যকলাপ, উপকরণ ও বর্ণনা সম্বন্ধে শিক্ষাদানের সময় সাধারণত সেইশিল্পের গণ্ডীর মধ্যে থাকা উচিত। কিন্তু তা বলে সেই সীমাদ্বারা সম্পূর্ণরূপে আবদ্ধ হওয়া ঠিক নয়। পাহাড়ের উপর বসে যেমন চারদিকের দৃশ্য দেখা যায়, তেমনি কোন বিশেষ শিল্পের গণ্ডীতে পা রেখে আশেপাশের নানা বিষয়ের জ্ঞান আহরণ করা উচিত। শিল্পের মাধ্যমে বিশ্ব-প্রকৃতির নানাবিষয় নিরীক্ষণ করার পদ্ধতিকে সাধর্ম্য-বৈধর্ম্যপ্রক্রিয়া

বলা হয়। এই প্রক্রিয়াদ্বারা বিশেষ শিল্পের বিশদ আলোচনা করা হলেও, সেই শিল্পের গণ্ডীর বাইরে একপা-ও যাওয়া যাবেনা, এমন ভাব জন্মায় না।

চরখার টেকো ও তকলী clockwise ঘোরানো হয়ে থাকে। clockwise কথাটা বোঝাবার জন্যে অবশ্য চরখা ও তকলী ঘুরিয়ে দেখাতে হবে—টেকো কিম্বা তকলী কোনদিকে ঘুরছে। কিন্তু এই প্রসঙ্গ এখানেই শেষ না করে নানা উদাহরণ দিয়ে clockwise আর anti-clockwise (সোজা আর উল্টা) গতির ব্যাখ্যা করে 'সাধর্ম্য' আর 'বৈধর্ম্যে'র মর্ম ছেলেদের বুঝিয়ে দেওয়া দরকার। নীচে সাধর্ম্য ও বৈধর্ম্যের কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া হল :—

সাধর্ম্যের উদাহরণ

(১) ঘড়ীর কাঁটা কোন দিকে ঘোরে ?

(২) কুয়োতে বালতী ফেলবার সময় কপিকলের চাকা কোন দিকে ঘোরে ?

(৩) প্যাঁচ কষবার সময় কোন দিকে ঘোরাতে হয় ?

(৪) কোন দিকে ঘুরে আরতি করা হয় ?

(৫) মন্দির প্রদক্ষিণ করার সময় কোন দিকে ঘোরা হয় ?

(৬) তালা বন্ধ করার সময় চাবী কোন দিকে ঘোরাতে হয় ?

(৭) সলাঈ-ওটনী (তুলা থেকে বীচি ছাড়ানোর যন্ত্র) কোন দিকে ঘোরানো হয় ?

(৮) হাত-ওটনী (তুলার বীচি ছাড়ানোর যন্ত্র বা চরকী) কী ভাবে ঘোরানো হয় ?

(৯) তেলীর ঘানি কোন দিকে ঘোরে ?

(১০) লাট্টু কোন দিকে ঘোরানো হয় ?

বৈধর্ম্যের উদাহরণ

(১) কুয়ো থেকে জল তোলার সময়।

(২) প্যাঁচ খোলার সময়।

(৩) তালা খোলার সময়।

(৪) চাকীতে গম ভাঙ্গবার সময়।

(৫) সপ্তর্ষিমণ্ডল অথবা ধ্রুব-মৎস্য মণ্ডল দেখবার সময় ইত্যাদি।

এইসব সোজা ও উল্টা গতির দৃষ্টান্ত প্রত্যক্ষভাবে দেখানো দরকার, তাতে যতই সময় লাগুক না-কেন।

বৈজ্ঞানিক ও কবি ভিন্ন-ভিন্ন উদ্দেশ্যে সাধর্ম্য-বৈধর্ম্য-প্রক্রিয়ার প্রয়োগ করে থাকেন। এই দুইরকমেই এর প্রয়োগ আমাদের করতে হবে—কাজকর্মের মধ্যে এই প্রক্রিয়া লক্ষ্য করে আমাদের জ্ঞান স্পষ্ট করার জন্যে আর ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমণের আনন্দ অনুভব করার জন্যে।

ভাষাদ্বারা প্রকাশ

একজন লোক খুব ভাল সূতা কাটেন, কিন্তু তিনি সূতাকাটার প্রক্রিয়াটি ভাল করে বোঝাতে পারেন না। এরকম হলে একথা নিশ্চয় করে বলা যায় যে, তিনি সূতাকাটার প্রক্রিয়াটি নিজে ভাল করে বোঝেননি। ভাষায় ব্যক্ত করার শক্তির অভাবে যে তিনি বুঝাতে পারছেন না, তা নয়। একটা হাতের কাজ যেসব বিভিন্ন সূক্ষ্ম প্রক্রিয়াগুলির সমাবেশে গড়ে ওঠে, সেই ভিন্ন-ভিন্ন ক্রিয়াগুলির স্বরূপ তাঁর কাছে স্পষ্ট না হওয়ায় তিনি ব্যাপারটি সম্যকরূপে ব্যক্ত

করতে পারেন না। অথবা বলা যেতে পারে যে, তাঁর কাজ করার ক্ষমতা আয়ত্ত হয়েছে কিন্তু বিশ্লেষণ করার শক্তি হয়নি।

আমাদের দেশের প্রায় সকল কারিগরই এই শ্রেণীর। তাঁদের কাছে কাজ শিখতে চাইলে তারা বলেন,'ভাই কাজ দেখতে দেখতেই শিখে যাবে। কী করে কাজ করছি দেখ, তাহলেই শিখে যাবে।' তিনি কাঠের র‍্যাঁদা করে বলবেন, 'আমি যেভাবে র‍্যাঁদা মারলাম, ঠিক সেইভাবেই র‍্যাঁদা মার।' এখন তাঁর 'এইভাবে' কথার শ্রোতা যতটুকু বুঝতে পারবেন, ততটুকুই তাঁকে বুঝতে হবে।

হাতের কাজ শেখানোর এই পদ্ধতি আমাদের বদলাতে হবে। বুদ্ধি আর হাত—এই দুই বস্তুকে যে মিলায়, তাকেই বলা হয় 'বাণী'। এইজন্যে হাতের কাজের ক্রিয়াসমূহ এবং সেগুলি ভাষায় ব্যক্ত করার শক্তি যতক্ষণ না বিদ্যার্থীর আয়ত্ত হচ্ছে, ততক্ষণ বুঝতে হবে যে, উদ্যোগশিক্ষা সম্পূর্ণ হয়নি।

বাণী বলতে বুঝতে হবে—'যথাযথ ও স্পষ্ট বাণী'। আশা করি নিম্নলিখিত দৃষ্টান্ত থেকে একথার অর্থ পরিষ্কার হবে একটা পেন্সিলকে perpendicular (লম্ব) ভাবে দাঁড় করানো যেতে পারে, আবার হেলিয়েও দাঁড় করানো যেতে পারে। অধিকাংশ লোক লম্বভাবে দাঁড়ানো অবস্থাকে 'সোজা' আর অন্যভাবে দাঁড়ানোকে 'বাঁকা' বলবে। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে পেন্সিলটা দুই-ভাবেই সোজা ছিল। প্রথম অবস্থা হচ্ছে খাড়া আর দ্বিতীয় অবস্থা হচ্ছে হেলানো বা তেরছা। কিছুদিন আগে শিক্ষাবিভাগ থেকে প্রকাশিত এক বই-এ শিক্ষকদের নিম্নলিখিত নির্দেশ দেওয়া হয়েছে

—'অমুক শ্রেণীর ছেলেমেয়েদের যোগ শেখাতে হলে পঞ্চাশের ঊর্ধ্ব সংখ্যা যেন লওয়া না হয়।' কিন্তু বলা উচিত ছিল—'যোগ শেখানোর সময় এমন সব সংখ্যা নির্বাচন করতে হবে, যাদের যোগফল পঞ্চাশের বেশী হবে না।' এক কথায় আরেক কথা বোঝা গেলে তাকে বাণী বলা চলে না।

যথাযথ প্রকাশ-শক্তি মাতৃভাষা শিক্ষাকালেই আয়ত্ত করতে হবে। এইজন্যে মাতৃভাষার অনুশীলনের সময় এই বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন। আমার মতে প্রকাশ-শক্তি ব্যতীত হাতের কাজ শেখানো যথাযথ হয় না। তাই কেবলমাত্র হাতের কাজ শেখাবার বিদ্যালয়গুলিতেও ভাষার অনুশীলন ত্যাগ করা যায় না।

তাত্ত্বিক জ্ঞান

হস্তশিল্পের মাধ্যমে যাঁরা শিক্ষালাভ করবেন তাঁদের সঙ্গে-সঙ্গে তাত্ত্বিক জ্ঞানের উত্তম বিকাশ হওয়া দরকার। নিম্নলিখিত বিষয়গুলি তাত্ত্বিকজ্ঞানের অন্তর্গত ঃ—

(১) পৃথককরণ—কোন বিষয় বা বস্তুর বিশ্লেষণ অর্থাৎ বিষয়টির বিভিন্ন অংশ আলাদা-আলাদা করা।

(২) একীকরণ—পৃথককরণের বিপরীত। অর্থাৎ কোন বিষয় বা বস্তুর বিভিন্ন অংশ সংযুক্ত করা।

(৩) বর্গীকরণ—ভিন্ন-ভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করা।

(৪) অনুক্রম—ক্রমানুসারে সাজানো।

(৫) সাহচর্য—কোন বিষয় বা বস্তুর অন্য কোন্ বিষয় বা বস্তুর সঙ্গে মিল আছে, তা নির্ণয় করা।

(৬) কার্যকারণভাব— কার্য থেকে পরিণামে পৌঁছা এবং পরিণাম বিচার করে তার কারণ নির্ণয় করা।

(৭) ইন্দ্রিয় প্রামাণ্য—বাইরের রূপ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়াদির জ্ঞান থেকে কোন কিছুর পরিচয় অনুমান করা।

(৮) ইন্দ্রিয়ভ্রম—ইন্দ্রিয়াদির ভ্রমে না পড়া। অর্থাৎ বাইরের পরিচয় থেকে ভ্রান্তিতে না পড়া।

(৯) মহত্বমাপন বা তারতম্য—বিভিন্ন বস্তুর আকার-প্রকারের তুলনামূলক আলোচনা।

(১০) সংশয়—সন্দেহ দূর করা।

(১১) নিশ্চয়—নিশ্চিত পরিণাম বা শেষ ফলে উপনীত হওয়া।

উপরোক্ত প্রত্যেকটির উদাহরণ দিলে এই আলোচনা অত্যন্ত দীর্ঘ হয়ে যাবে। সংক্ষেপে মোট কথা হচ্ছে এই যে, হাতের কাজ শেখার সময় অন্বেষণের অর্থাৎ রহস্য উদ্ঘাটন করার শক্তি জাগা চাই। যান্ত্রিকভাবে (mechanically) কাজ করলে উদ্যোগে বাস্তবতা এবং সজীবতা উভয়েরই অভাব হবে। কারণ না জেনে চোখ বুজে কেবল বিধি-নিষেধ পালন করে গেলে উদ্যোগের উন্নতি হতে পারে না। বিধি-নিষেধ প্রয়োগের সময়েই যে কারণ নির্দেশ করতে হবে, তা নয়। এ প্রয়োজন বুঝে আগে-পরেও বলা যায়, সঙ্গে-সঙ্গেও বলা যায়; তবে কারণটা অবশ্যি বুঝিয়ে দিতে হবে। এমনভাবে শেখাতে হবে যাতে ছাত্রদের মনে নিরন্তর জিজ্ঞাসার উদয় হয়—আর তার সমাধানের জন্যে তারা শিক্ষকদের কাছে

বারবার প্রশ্নগুলি উপস্থিত করে। আবার শিক্ষকও মধ্যে-মধ্যে প্রশ্নাদি করবেন এবং ছাত্রেরা সেসব নিয়ে আলোচনা করবে।

যেসব প্রশ্ন সাধারণত কেউ জিজ্ঞাসা করে না, কিছু-কিছু সে-জাতীয় প্রশ্নও তোলা যেতে পারে। যথা, চরখার চক্র চার খুঁটির উপর বসানো হয় না কেন ? এরকম প্রশ্ন মামুলী নয়। এ জাতীয় প্রশ্ন কদাচিৎ করা হয় আর যদি কেউ করেও, তবে তাকে লোকে মূর্খ ঠাওরায়। আমি কিন্তু তাকে চতুর বলি। আমি তো নিজেই এই জাতীয় প্রশ্ন উপস্থিত করে তার যুক্তিসঙ্গত উত্তর বিচারাদির দ্বারা নির্ণয় করব।

পরিশ্রম-নিষ্ঠা

পরিশ্রম ও পরিশ্রম-নিষ্ঠা অর্থাৎ শ্রমের প্রতি শ্রদ্ধা বিভিন্ন বস্তু। সংসারে অনেক লোকই শ্রম করে, কিন্তু তারা প্রায়ই বাধ্য হয়ে শ্রম করে। তারা যদি মেহনতের কাজ থেকে কোন রকমে বাঁচতে পারে, তবে তৎক্ষণাৎ বাঁচতে চাইবে। কিছুলোক তো শরীরশ্রমের কাজগুলি অন্যের ঘাড়ে ফেলেই নিজেরা ভদ্রলোক হয়ে সমাজে প্রতিষ্ঠালাভ করেছেন। এর থেকেই সাম্রাজ্যবাদ, পুঁজীবাদ, যুদ্ধ, উচ্চ-নীচ ভেদ প্রভৃতির উৎপত্তি হয়েছে। এ সকলের একটিই সমাধান আছে, কোনপ্রকার শরীরশ্রম ব্যতীত অন্ন গ্রহণ করলে সমাজের প্রতি অপরাধ করা হয়—ছাত্রদের মনে এই ধারণা বদ্ধমূল করে দেওয়া।

আমাদের শিক্ষাপ্রণালীর দ্বারা শিক্ষিত লোকদের মনে এই ধারণা দৃঢ় ও স্পষ্ট হওয়া দরকার। দেশের এমন দুরবস্থা হয়েছে যে, শিশুদের পাঠশালায় পাঠানোর পর তারা গোবর ধরতে ইতঃস্তত করে,

কিন্তু দুধ খেতে খুব ভালবাসে। আমাদের প্রণালীতে যেসব শিশুরা শিক্ষা লাভ করছে—তাদের শিক্ষা এমন হবে যে, তারা গোবর ধরতে আর দুধ খেতে সমানভাবেই ভালবাসবে। তবে অন্যেরা যদি দুধ খেতে না পায় তাহলে তারা দুধ খেতে সংকোচ বোধ করবে।

এইজন্যে শিক্ষকগণ ছাত্রদের সঙ্গে-সঙ্গে যথাশক্তি শারীরিক শ্রমে অংশ গ্রহণ করবেন। বিদ্যালয়ে তাঁরা যে শারীরিক শ্রম করবেন, তাকে তো বিদ্যালয়ের কাজ বলেই মনে করা হবে। এইজন্যে শিক্ষক ও তাঁর পরিবারবর্গ অন্য সময়েও গ্রামীণ মজুরদের মতো প্রসন্নচিত্তে শরীরশ্রম করে ছাত্রদের সম্মুখে শরীরশ্রমের শ্রেষ্ঠতার আদর্শ তুলে ধরবেন।

গ্রামের আবর্জনা পরিষ্কার করা প্রভৃতি সার্বজনিক কাজ তো শিক্ষক ও ছাত্রেরা একযোগে করবেনই, উপরন্তু বিদ্যালয়-গৃহ ঝাঁট দেওয়া, আঙ্গিনা পরিষ্কার করা এবং আঙ্গিনা গোবর দিয়ে নিকানো প্রভৃতি কাজও ছাত্রদের সঙ্গে শিক্ষকেরা করবেন। এরকম এক নিয়ম হওয়া দরকার। যেসকল কাজ হেয় মনে করা হয়, সেসকল কাজের ভার কেবলমাত্র ছাত্রদের উপর দেওয়া উচিত নয়। সেগুলি শিক্ষকেরা নিজেরা করবেন এবং ছাত্রদের দিয়ে করিয়ে নেবেন। এ না-হলে ছাত্রদের মধ্যে পরিশ্রম-নিষ্ঠা দেখা দেবে না।

জাতীয় পতাকায় অঙ্কিত চরখা শরীরশ্রমের অর্থাৎ অহিংসার প্রতীক। বিদ্যালয়ের উদ্যোগিক পরিবেশ থেকে এই বোধ যেন নিরন্তর ছাত্রেরা আত্মস্থ করতে পারে।

—('মূল উদ্যোগ কাতাই' থেকে)

একরের বর্গফল

স্কুলে গণিত সম্পর্কে নানাপ্রকারের আর্যা শেখানো হয়। ছোটবেলায় গুরুমহাশয় মুখস্থ করানো আর বেত—এই দুই হাতিয়ারের সাহায্যে আমাদের মাথায় আর্যাগুলি কোনরকমে ঢুকিয়েছিলেন। অবশ্য ঐ উপায়ে বহু ছেলের মাথায় আর্যা মোটেই ঢোকেনি। না-বোঝার প্রথম কারণ হচ্ছে বোঝানোর হাতিয়ার দুটি, আর দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে প্রায় আর্যাই ছিল কাল্পনিক হিসাব। জীবনে সেগুলির প্রয়োগ ছিল না। আসলে আর্যা যদি এমন বস্তুর হয় যা জীবনধারণের জন্যে প্রয়োজন, তাহলে যারা বাঁচতে চায় তাদের সেটা শিখতে আনন্দই হবে। আর তা এমনভাবে শেখানো দরকার যাতে শিক্ষার্থীর ভাল লাগে। এই সম্পর্কে একটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।

'একর'-শব্দের ব্যাখ্যা

জীবনের প্রধান ভিত্তি কৃষিক্ষেত্র আর ক্ষেত মাপা হয় একরে। এইজন্যে ছেলেদের একরের আর্যা শেখানো দরকার। কি করে তা শেখানো উচিত সেসম্বন্ধে আলোচনা করা যাক। 'একর' একটি ইংরেজী শব্দ। যেহেতু এই শব্দ এদেশে প্রচলিত হয়ে গেছে, সেজন্যে একে ক্ষেতের পরিমাপ হিসাবে সকলেই জানে। ভারতবর্ষে গড়ে মাথাপিছু এক একর জমি আছে। এইজন্যে বর্তমান অবস্থায় বলা যেতে পারে ভারতবর্ষে মালিকানাস্বত্বের যে-জমি তার নাম

'একর'। এইভাবে এক কথায় একর শব্দের ভিন্ন ব্যাখ্যা করা দরকার, যাতে ছেলেরা সহজে ঐ কথাটি হৃদয়ঙ্গম করতে পারে।

১১ ফুট × ১১ ফুটের ৩৬০ টুকরা = ১ একর

৪৮৪০ বর্গগজে এক একর হয়। এত বড় সংখ্যা মনে রাখা সোজা নয়। এর দুটি বৃহত্তম অবয়ব হল ১২১ আর ৪০। অর্থাৎ ৪৮৪০ বর্গগজ = ১২১ গজ × ৪০ গজ। ১২১ বর্গগজে এক গুণ্ঠা ধরে ৪০ গুণ্ঠায় এক একর ধরা হয়। এখন গজকে ফুটে পরিণত করে এবং গুণ্ঠাকে আরও ছোট করে নেওয়া যাক। ১২১ বর্গগজে এক গুণ্ঠা = ১১ গজ × ১১ গজ এক টুকরা স্কোয়ার [চৌরস] জমি। এই জমিকে ১১ ফুট লম্বা আর ১১ ফুট চওড়া এই রকম ৯ টুকরা করা যায়। এই রকম ১২১ বর্গফুট জমি এক গুণ্ঠায় ৯ টুকরা অর্থাৎ একরে ৩৬০ টুকরা।

১১ ফুট × ১১ ফুট = ১ ঘণ্টা

মোটামুটি ৩৬০ দিনে এক বছর ধরা যায়। যদি কেউ প্রতিদিন ১২১ বর্গফুট জমি খুঁড়তে পারে তাহলে সেইব্যক্তি এক বছরে এক একর জমি খুঁড়তে পারবে। অভিজ্ঞতা থেকে বলা যেতে পারে (বর্ষাকালেও সমানভাবে জমি খোঁড়া হবে ধরে নিয়ে) যে, শারীরিক শক্তি, জমির প্রকার, যন্ত্রপাতির ভালমন্দ, ঋতুকাল প্রভৃতির তারতম্য অনুসারে এইকাজে একজনের ৪০ থেকে ৮০ মিনিট সময় লাগতে পারে। মোটামুটি ধরা যাক ১ ঘণ্টা সময় লাগবে। যেহেতু এক ঘণ্টায় ১২১ বর্গফুট জমি খোঁড়া যায়, সেইজন্যে এই মাপের জমিকে ১ ঘণ্টা বলা যেতে পারে। এটা মনে রাখা খুব কঠিন হবেনা।

১-এর পিঠে ১ যে ১১, একথা ছোট ছেলেও জানে। তাই ১১ ফুট লম্বা একটি বাঁশের সাহায্যে একটি ১১ ফুট লম্বা আর ১১ ফুট চওড়া জমি দাগ দিয়ে—এইরূপ ১ ঘণ্টায় কতটা জমি তা ছেলেদের প্রত্যক্ষভাবে দেখানো যায়। এখন এইরূপ ৩৬০ ঘণ্টায় যে এক-একর—এর থেকে বর্গফলের এই সোজা হিসাব মিলে গেল। (এখানে ঘণ্টার অর্থ যে ১১ ফুট × ১১ ফুটের সমতল জমি না-হয়ে ১২১ বর্গফুট, কেবল এই কথাটি ভাল করে ছেলেদের বুঝিয়ে দিতে হবে। তাদের বলতে হবে যে, ১২১ বর্গফুট জমি নানাভাবে হতে পারে, শুধু সুবিধার জন্যে ১১ ফুট × ১১ ফুট নেওয়া হয়েছে।) ক্ষেত করার জন্যে ছেলেদের মধ্যে ঘণ্টা হিসাবে জমি ভাগ করে দিতে হবে। কাউকে '১ ঘণ্টা জমি' আর কাউকে '২ ঘণ্টা জমি' দেওয়া হবে। নিজেদের জমি থেকে যে-ফসল হবে, সেই হিসাব ধরে ছেলেরা সহজেই একরে কত ফসল হবে তার হিসাব করে নিতে পারবে।

১ ফার্লঙ্গ × ১ ফার্লঙ্গ = ১০ একর = আগর

এতক্ষণ ১ একরের কম জমির মাপে একরের মাপ করা হয়েছে। এখন ১ একরের বেশী জমি মাপা যাক। এক ফার্লঙ্গ সমান চৌকা জমিতে ৪৮,৪০০ বর্গগজ অর্থাৎ ১০ একর হয়। সাধারণত ১০ একরে এক টুকরা জমি ধরা হয়। মধ্যপ্রদেশে যে-কৃষকের ১০ একরের কম জমি আছে, গভর্ণমেণ্ট তার খাজনা টাকায় ১ আনা বাদ দিয়ে দিয়েছে। সেখানে শিক্ষকেরা ছেলেদের একথা বুঝিয়ে দিয়েছেন। এদ্বারা শিক্ষকেরা ছেলেদের মনে এই ধারণা জন্মিয়েছেন যে, সাধারণত এক-একটি ক্ষেত্র ১০ একরের হয়। আগেই বলা হয়েছে ভারতবর্ষে

মাথাপিছু গড়পড়তা এক একর জমি আছে। যে-ব্যক্তির পরিবারে সবশুদ্ধ পাঁচজন আছে, তিনি ৫ একর পাবেন। বর্তমানে ভারতে শতকরা ৭৫ জন কৃষক। ৪০ বছর আগে ছিল শতকরা ৭০ জন। দেশে শিল্পকার্য হ্রাস পাওয়াতে ৪০ বছরে ক্রমেই অধিক থেকে অধিকতর সংখ্যক লোকের ভার জমির উপর পড়েছে। ফলে এখন কৃষকের অনুপাত শতকরা ৭০ থেকে বেড়ে ৭৫ জনে পরিণত হয়েছে। যখন শতকরা ৫০জন কৃষিকার্যে রত থাকে তখনই দেশের অর্থ-নৈতিক অবস্থা ভাল বলা যেতে পারে। আমাদের দেশে যদি অর্থ নৈতিক অবস্থা ভাল হত, তাহলে প্রত্যেক কৃষক পরিবারবর্গসহ ১০ একর করে জমি পেত। একজোড়া বলদের জন্যে ২০ একর জমির খড়-বিচালি দরকার হয়। তবে যদি বাগান আর চাষের ক্ষেত মিলিয়ে ১০ একর পাওয়া যায়, তাহলে একজোড়া বলদের খোরাক কম পড়বে না। সবসমেত জনসাধারণের জন্যে পরিবার প্রতি ১০ একর জমি যথেষ্ট বলা যেতে পারে। এই পরিমাণ জমিকে 'আগর' (সমূহ) বলা যায়। শেখাবার সময় শিশুদের '১০ একরে এক আগর', এই কথা শেখাতে হবে।

৬৪০ একর = ১ বর্গমাইল

এক আগর যদি সমান চৌকা (square) হয়, তবে ১ ফার্লঙ্গ লম্বা আর ১ ফার্লঙ্গ চওড়া হবে। এখন এক বর্গমাইলে কত আগর হয় দেখা যাক। এক টাকায় যত পয়সা তত, অর্থাৎ ৬৪ আগর হবে। ১০ একর = ১ আগর, আর ৬৪ আগর = ১ বর্গ-মাইল, সুতরাং ৬৪০ একর = এক বর্গমাইল। যারা সূতা কাটে

তাদের কাছে ৬৪০ এর হিসাবটি সুপরিচিত, তাই ছেলেদের কাছে এই আর্যার হিসাব মনে রাখা সহজ হবে। দুইদিক থেকেই একরের আর্যা ধরা যেতে পারে—৩৬০ ঘণ্টায় এক একর আর এক বর্গ-মাইলের ৬৪০ ভাগের একভাগ হচ্ছে এক একর।

সবাই হয়তো জানেন তবু বলছি, এক গুণ্ডী সূতায় ৬৪০ তার সূতা থাকে, আর এক বর্গমাইলে ৬৪০ একর জমি থাকে। এই উপমা দিয়ে ছেলেদের আর্যা শেখানো আর মূল উদ্যোগের সহায়তায় সমবায় সাধনা করা এক নয়। মূল উদ্যোগের মধ্য থেকে একরের আর্যার প্রয়োজনীয়তা উৎপন্ন হওয়াই সমবায় (এখানে মূল উদ্যোগ হচ্ছে কৃষি)। উপমা দিয়ে কোন বিষয়কে স্পষ্ট করা শিক্ষকের কৌশল। এই কলা বা কৌশল যদিও সমবায়ের বিরোধী নয়, তথাপি এটি নিজে সমবায় নয়।

একরের আর্যা (বা সূত্র বা কোষ্ঠক)

১২১ বর্গফুট = ১ ঘণ্টা	১০ একর = ১ আগর
৯ ঘণ্টা = ১ গুণ্ঠা	৬৪ আগর = ১ বর্গমাইল
৪০ গুণ্ঠা = ১ একর	৬৪০ একর = ১ বর্গমাইল
৩৬০ ঘণ্টা = ১ একর	

—('গ্রামসেবা-বৃত্ত', সেপ্টেম্বর ১৯৪০)

হাস্যাস্পদ সমবায়

আমি এই বিদ্যালয়ের বিভিন্ন শ্রেণী ঘুরে-ঘুরে পরিদর্শন করে এলাম। উদ্যোগের মাধ্যমে শিক্ষাদানের যে-চেষ্টা এখানে চলছে, তাতে আমি সন্তুষ্ট হইনি। এতে শিক্ষকদের বিশেষ দোষ দেওয়া যায় না, কারণ সম্পূর্ণ শিক্ষাপদ্ধতিটিই অভিনব।

এক শ্রেণীতে এক শিক্ষক গল্প বলছিলেন। গল্প শেষ করে তিনি গল্পের বিষয়ের সঙ্গে তকলীর প্রসঙ্গ জুড়ে দিয়ে তকলীর গুণগান আরম্ভ করলেন। কিন্তু আমার কাছে এই উপায় কৃত্রিম মনে হল। তকলী সম্বন্ধে কবিতা পড়ানো আর তকলীর মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়া এক কথা নয়। সেইরূপ ছেলেদের প্রত্যেককে ১৫।১৬টা পাঁজ দিয়ে তকলী কাটতে সুরু করিয়ে, তারপর মধ্যে-মধ্যে সেই পাঁজগুলির সাহায্যে যোগ-বিয়োগ শেখালেই তকলীর সাহায্যে গণিত শেখানো হয় না। এতে বরং পাঁজগুলি খারাপ হয়ে যায়। এর পরিবর্তে তো নুড়ী বা পাথরের টুকরা দিয়ে যোগ-বিয়োগ শেখালেও হয়। বস্তুত উদ্যোগের মধ্যে উপযুক্ত প্রসঙ্গে গণিত শেখাতে হবে। আবার এমন অনেক উদ্যোগ আছে যার পদে-পদে গণিতের প্রয়োজন হয়।

প্রসঙ্গ উল্লেখ করা আবশ্যক

এখানে শিশুদের এক শ্রেণীতে পড়ানো মন্দ হচ্ছে না। তবু সেখানেও আমার পুরাপুরি সন্তুষ্টি হয়নি। অবশ্য শিক্ষক উদ্যোগের

দ্বারা কি-কি শেখানো হয়েছে তার একটি তালিকা প্রস্তুত করেছেন। কিন্তু শুধু তাতেই শিক্ষা প্রণালীটি স্পষ্ট হয় না। কোন্ প্রসঙ্গে কি শিখিয়েছেন সেটাও লেখা উচিত ছিল। সমাজ-সম্বন্ধীয় শিক্ষা সম্পর্কে বলা হয়েছে—'অমুক-অমুক বিষয়ের উল্লেখ করা হয়েছে' ; কিন্তু মাত্র এটুকু উল্লেখ করা পর্যাপ্ত নয়। ঐ সকল প্রসঙ্গ কিভাবে কোন সুযোগে বলা হয়েছে, তা-ও বিস্তৃতভাবে বলা উচিত ছিল। সব সময় একথা মনে রাখা দরকার যে, প্রাসঙ্গিক জ্ঞান দিতে হবে। অপ্রাসঙ্গিকভাবে কিছু শেখানো ঠিক নয়।

সমবায়ের উদাহরণ

সামাজিক বিষয়ের শিক্ষা সম্পর্কে ধারণা জন্মেছে যে, সব বিষয়ই উদ্যোগের মাধ্যমে শেখানো যায়। কিন্তু এই ধারণা ঠিক নয়। চাবি দিয়ে যেমন তালা খুলতে হয়, তেমনি উদ্যোগের দ্বারা জীবন খুলতে হয়। মনে করুন খুব বৃষ্টি হচ্ছে। ক্লাসে এসে প্রথমে ছেলেদের জিজ্ঞাসা করুন যে, তারা শৌচ, মুখধোয়া প্রভৃতি কাজ ভাল ভাবে করে এসেছে কি-না। এইদিন এই প্রশ্নের দরকার কেন ? কারণ বৃষ্টির দিনে ছেলেরা শৌচাদি কাজ করতে চায় না, তাদের আলস্য হয়।

জানালা-দরজা সম্বন্ধে ছেলেদের শেখাতে হলে আমি তাদের প্রথমে জিজ্ঞাসা করব, 'জানালার কী প্রয়োজন ?' ছেলেরা বলবে, 'জানালা দিয়ে আলো-বাতাস ঘরে আসবে।' আবার আমি প্রশ্ন করব, 'ছাতে জানালা বসিয়ে দিলেও তো আলো-বাতাস ভিতরে আসতে পারে, তাহলে অন্য জানালা দিয়ে কি কাজ হবে ?'

তারা বলবে, 'না, বাইরের দৃশ্যও দেখা যাওয়া চাই।' আবার প্রশ্ন করব, 'আচ্ছা ধর, যেমন দরকার তেমন জানালা বানিয়ে দিলাম, তাতেই কি কাজ চলবে?' তারা বলবে, 'না, ভিতরে-বাইরে যাওয়া-আসার ব্যবস্থাও রাখতে হবে। এইজন্যে দরজা দরকার।' এইভাবে জানালার কি প্রয়োজন আর দরজারই-বা কি প্রয়োজন তা যখন তারা বুঝতে পারবে, তখন তাদের জিজ্ঞাসা করব, 'আচ্ছা বল তো শরীরে এমনিধারা দরজা-জানালা আছে কি-না এবং থাকলে তাদের নাম বল।' সংস্কৃতে চোখ, নাক, কান, মুখ প্রভৃতিকে 'দ্বার' বলা হয়েছে। গীতাতে উক্ত হয়েছে, 'সর্বদ্বারাণি সংযম্য'—দরজার নিয়মন করে সমস্ত জানালা-দরজায় পাহারা রাখা দরকার। 'নবদ্বারে পুরে দেহী'—নয় দরজা বিশিষ্ট এই নগরে আত্মা বাস করেন। সম্ভবত মানুষের চোখ দেখে ঘরে জানালা রাখার পরিকল্পনা করা হয়েছিল। কিন্তু মানুষের চোখ ছোট আর গরুর চোখ বড়। এইজন্যে মানুষ গরুর চোখের মতো জানালা বানাতে লাগল। সংস্কৃতে জানালার নাম হচ্ছে—'গবাক্ষ'। গবাক্ষ অর্থ গরুর চোখ। আমি ছেলেদের বলব, 'গরুর চোখের মতো জানালা এঁকে দেখাও।' ছেলেরা যদি গরুর চোখ আঁকতে শেখে তো তারা চিত্রকলা শিখল। তখন তাদের জিজ্ঞাসা করা হবে যে, পরে মানুষ জানালার আকৃতি সম্পর্কে কি রকম অদল-বদল করেছে। এইভাবে ইতিহাস এসে যাবে। 'গবাক্ষ'র মতো জানালা আজকাল কোথায় দেখতে পাওয়া যায় সেই আলোচনা করতে গিয়ে আমি তাদের ল্যাপল্যাণ্ডের কথা বলব এবং সেইপ্রসঙ্গে সেখানকার অধিবাসীদের জীবন সম্বন্ধে বিভিন্ন

জ্ঞাতব্য বর্ণনা করব। সারাংশ ঃ এইরকম করে প্রাসঙ্গিকভাবে বিদেশের লোকদের সম্বন্ধে শেখাতে হবে।

চীনদেশ আমাদের দেশের মতোই প্রাচীন ও ঘনবসতি সম্পন্ন। সেদেশেও এদেশের মতো বহু বিস্তৃত কৃষিক্ষেত্র আছে। কিন্তু চীন এদেশ থেকে অনেক বেশী উর্বরা কী করে হল? জমির উর্বরতা বজায় রাখার জন্যে কি করা দরকার—এই প্রসঙ্গে আমি ছেলেদের জমির সার সম্বন্ধে নানা কথা বলব। মল থেকে উৎপন্ন সারের (স্বর্ণ-সার) প্রয়োগবিধি সম্বন্ধে চীনের লোকদের কাছ থেকে বিশেষভাবে শেখবার আছে। চীনে এই সারের বহুল ব্যবহার প্রচলিত আছে। এতে ওদের জমি দীর্ঘকাল চাষের পরও এত উর্বরা রয়েছে। এই কথা ছেলেদের বুঝিয়ে দেব।

'চার হাজার বছরের কৃষক' এই নামে একটি বই একজন আমেরিকান লিখেছেন। এই পুস্তকে তিনি লিখেছেন, 'আমেরিকানরা খুব খরচে। প্রত্যেক লোকেরই ১৫।২০ একর জমি আছে। আমাদের জমি মাত্র ৪ শ' বছর ধরে চাষ হয়েছে। এই চারশ' বছরেই এর উর্বরাশক্তির জন্যে আমরা চিন্তিত হয়ে পড়েছি এবং নানা রাসায়নিক সার দিয়ে জমির সর্বনাশ করছি। স্বর্ণ-সারের মতো উৎকৃষ্ট সার আমরা বৃথা নষ্ট করি।' শিক্ষকদের এই বইটি অবশ্য পড়া উচিত।

যেদিন খুব বেশী বৃষ্টি হবে সেদিন ছেলেদের ছুটি দিয়ে দেওয়া চাই। বর্ষায় ছেলেরা খেলাধূলা করবে, আনন্দ করবে। আর তাদের সঙ্গে শিক্ষকেরাও কাপড় খুলে রেখে লেংটি পরে তাদের খেলাবেন এবং বলবেন—'বর্ষা পরমাত্মার কৃপা'। আমাদের এখানে

বৃষ্টি হলে ছুটি হয় আর ইংল্যাণ্ডে রোদ হলে। এরকম কেন হয়? তার কারণ সেখানে অধিকাংশ সময়ই মেঘে ঢাকা আকাশ, বর্ষনোন্মুখ দিন। এইজন্যে সেখানে সূর্য উঠলেই ছুটি দেওয়া হয়। ছুটি পেয়ে ছেলেরা মনের আনন্দে খেলে, বেড়িয়ে কাটায়। এভাবে আমি ছেলেদের ইংল্যাণ্ডের জলবায়ুর কথা শেখাব।

স্বাধর্ম্য-বৈধর্ম্য জ্ঞান

ইতিহাস, ভূগোল, নাগরিক-শাস্ত্র প্রভৃতি সামাজিক শিক্ষার অন্তর্গত। ইতিহাস আর ভূগোল শেখানোর তাৎপর্য হচ্ছে ছেলেদের দেশ ও কাল সম্বন্ধে পরিচয় দেওয়া। কাল ও দেশ দুটি এত একরকমের বস্তু যে, কোন-কোন ভাষায় কালবাচক শব্দ স্থলবাচক শব্দ হিসাবে ব্যবহৃত হয়। "এই প্রশ্নের জবাব আপনাদের 'পিছে' দেব"—এখানে 'পিছে' শব্দ কালবাচক। কিন্তু "ঐ ব্যক্তি তার 'পিছে' চলতে লাগল"—এখানে 'পিছে' স্থলবাচক। আমাদের কাছে ইতিহাস ও ভূগোল পড়ানোর অর্থ প্রাচীনকালের আর দূরদেশের লোকদের সম্বন্ধে জ্ঞান দেওয়া। নিকটের লোকদের কথা হলেও যদি তা পুরাকালের হয়, তা হলে সেকথা হবে ইতিহাস। আর যদি বর্তমান কালের কিন্তু দূরদেশের লোকদের কথা হয়, তা হলে সে কথা হবে ভূগোল।

একদল লোক বলেন যে, ছোট ছেলেদের দূরদেশের আর প্রাচীনকালের লোকদের কথা আগে বলা দরকার। আর একদল বলেন, আজ থেকে আরম্ভ করে ক্রমশ প্রাচীনকালের দিকে নিয়ে গেলে ভাল হয়।

উপরোক্ত মত দুইটি আপাতদৃষ্টিতে পরস্পর বিরোধী বলে মনে হলেও আসলে তা নয়। একজন বলছেন, অতি প্রাচীনের কথা বল। আরেকজন বলছেন, অতি অর্বাচীনের কথা বল। কিন্তু কেউ একথা বলেন না যে, মাঝামাঝি যা (প্রাচীন-অর্বাচীন উভয়ই) তাই বল, আর সেরকম বলাই তো ঠিক। জ্ঞানের জন্যে তুলনা দরকার আর তুলনার জন্যে নিকটের বস্তু ধরা হয় কিম্বা অনেক দূরের। দূর ও নিকট এই দুই-এর সম্বন্ধে জ্ঞানকে 'স্বাধর্ম্য-বৈধর্ম্য' জ্ঞান বলা হয়েছে। গান্ধীজীর অহিংসার সঙ্গে একদিকে যেমন সমাজতন্ত্রবাদের তুলনা করা যায় আবার অন্যদিকে সাম্রাজ্যবাদেরও তুলনা করা যায়।

কিন্তু এই স্বাধর্ম্য-বৈধর্ম্য জ্ঞান কখনও অপ্রাসঙ্গিকভাবে দেওয়া উচিত নয়। শিক্ষক যদি উঠে দাঁড়িয়ে প্রথমেই ল্যাপল্যাণ্ডের কথা বলতে আরম্ভ করেন, তবে তাতে কাজ হবে না। প্রসঙ্গ উপস্থিত করে এবং সেটা বুঝিয়ে দিয়ে তবেই সে-সম্বন্ধে জ্ঞানদান করা উচিত। আর এইরূপ প্রসঙ্গ উত্থাপন করা মোটেই কঠিন কাজ নয়।

—(একটি আলোচনা থেকে)

ছোট ছেলেদের জন্যে কবিতা

(একটি চিঠি থেকে)

ছোট ছেলেদের পক্ষে উপযুক্ত কোন কবিতার ভাবার্থ বুঝালেই যথেষ্ট। সেইসঙ্গে প্রতিটি শব্দের অর্থও তাদের বুঝা দরকার—এরূপ আশা করা উচিত নয়।

ছোট-ছোট ছেলেমেয়েদের গান শেখাবার একটা হিড়িক এসেছে। কিন্তু আমি দেখেছি তারা অধ্যাত্ম-বিদ্যা, সাম্যযোগ, ভক্তিমার্গ প্রভৃতির ভাব বেশ ভালভাবে গ্রহণ করতে পারে। জ্ঞানেশ্বরী, জ্ঞানদেবের অভঙ্গ, একনাথ, নামদেব আর তুকারামের বাছা-বাছা অভঙ্গ, সমর্থকৃত (রামদাস কৃত) শ্লোক, দাসবোধের উপদেশপাঠ, গীতাঈ, বামনপণ্ডিতের নীতিশতক* প্রভৃতি অমূল্য সাহিত্য বালকদের কণ্ঠস্থ করিয়ে দেওয়া চাই।

ছোটদের স্মৃতিশক্তি তীক্ষ্ণ হয়ে থাকে। এই স্মৃতিশক্তির সুযোগ নিয়ে ধর্মকথা তাদের মনে গেঁথে দিতে হবে। রাস্কিন ৫।৬ বছর বয়সেই বাইবেল কণ্ঠস্থ করে ফেলেছিলেন। আমার নিজের অভিজ্ঞতা আগেই বলেছি।

গভীর অধ্যয়নের সূত্র

সমাধিযুক্ত অধ্যয়ন

লম্বা-চওড়া অধ্যয়নের মধ্যে কোন গুরুত্ব নেই। গুরুত্ব গভীরতার। আমি বহুক্ষণ ঘণ্টার পর ঘণ্টা নানাবিষয়ে অধ্যয়নে ব্যস্ত থাকাকেই লম্বা-চওড়া অধ্যয়ন বলি। আর সমাধিস্থ হয়ে প্রতিদিন অল্পসময় কোনও নির্ধারিত বিষয়ের অধ্যয়নকে বলি গভীর অধ্যয়ন। এপাশ-ওপাশ করে এবং নানা স্বপ্ন দেখে ১০।১২ ঘণ্টা

* এই বইগুলি সবই মারাঠীতে লেখা।

ধরে ঘুমালে শরীরের ক্লান্তি দূর হয় না। ৫।৬ ঘণ্টা ঘুমালে এবং নিদ্রা গাঢ় হলে তাতেই পূর্ণ বিশ্রাম হতে পারে। অধ্যয়নের বেলাও ঠিক এই কথা। অধ্যয়নেব প্রধান তত্ত্বই হচ্ছে 'সমাধি'।

বুদ্ধিতে নব উন্মেষ

সমাধিযুক্ত গভীর অধ্যয়ন ছাড়া জ্ঞান হয় না। লম্বা-চওড়া অধ্যয়ন বেশীর ভাগই বৃথা হয়ে যায়। এতে শক্তিরও অপব্যয় হয়। অনেক বিষয়ে পড়া করতে-করতে নানা বিষয়ের বোচকা বাঁধতে থাকলে, তা আর আত্মস্থ করা যায় না। অধ্যয়নের দ্বারা প্রজ্ঞা, বুদ্ধি, স্বাধীন ও প্রতিভাবান হওয়া চাই। প্রতিভার অর্থ হচ্ছে, বুদ্ধিতে নতুন-নতুন অঙ্কুরের উদ্গম হতে থাকা। নতুন কল্পনা, নবীন উৎসাহ, নতুন অন্বেষণ, নব তেজ—এসব প্রতিভার লক্ষণ। লম্বা-চওড়া পড়ার চাপে এই প্রতিভা পিষ্ট হয়ে মরে যায়।

কর্মযোগের স্থান

বর্তমান জীবনে আবশ্যকীয় কর্মযোগের স্থান রেখেই সমস্ত অধ্যয়ন করতে হবে। অন্যথায় ভবিষ্যৎ জীবনের আশায় বর্তমান কালেই মৃত্যুবরণ করে নেওয়ার মতো কাজ হয়ে যাবে। শরীরের উপর কতটুকু বিশ্বাস রাখা সম্ভব তাতো সকলেই জানেন। আমাদের প্রত্যেকেরই যে কোন-না-কোন ত্রুটি আছে, অভাব আছে, তা ভগবানের দয়া বলতে হবে। তাঁর ইচ্ছা এই যে, আমরা যেন এই ত্রুটি সম্বন্ধে সচেতন হয়ে সতর্ক থাকি।

নিশ্চিত লক্ষ্য

দুইটি বিন্দুর দ্বারা একটি সরলরেখা নির্দিষ্ট হয়। জীবনের পথও

দুইটি বিন্দুর দ্বারা নির্ধারিত হয়। প্রথম বিন্দু হচ্ছে আমরা যেখানে আছি সেই স্থান, আর দ্বিতীয় বিন্দু হচ্ছে আমাদের গন্তব্য স্থান। এই দুই বিন্দুকে ঠিক করে নেওয়াই জীবনপথের দিক নির্ণয় করা। এই নির্দিষ্ট দিকে অবিচলিতভাবে লক্ষ্য স্থির রেখে না চললে, এদিক-ওদিক ঘুরলে জীবনের পথ অনির্ণিতই থেকে যায়।

সারাংশ ঃ গভীর অধ্যয়নের সংকেত হচ্ছে—'অল্পমাত্রা, সাতত্য, সমাধি, কর্মাবকাশ, নিশ্চিত লক্ষ্য'। —('জীবন-দৃষ্টি' থেকে)

রেখাঙ্কনের উপকরণ

'ড্রইং' ওরফে 'রেখাঙ্কন' মূলোদ্যোগী পাঠ্যতালিকাভুক্ত একটি বিষয় এবং তা একটি প্রধান বা মুখ্য বিষয়। কারণ উদ্যোগের সঙ্গে ড্রইং-এর নিকট সম্বন্ধ। কিন্তু যখন ড্রইং-এর বিবিধ উপকরণের তালিকা দেখলাম, তখন আমি চিন্তিত হয়ে পড়লাম। রং, ব্রাশ, ড্রইং-কাগজ প্রভৃতি ক্ষয়িষ্ণু উপকরণ প্রত্যেক ছাত্রের জন্যে কে কিনবে? ছেলেদের কিনতে হলে গরীব ছাত্রদের পক্ষে তা সম্ভব নয়। আর সরকার যদি কিনে দেয় তাহলে পরিকল্পনা ব্যয়বহুল হয়ে পড়বে। তাহলে কি করা যায়? অবশেষে বলে দিতে হল যে, সরকার কিম্বা ছাত্রেরা কোন পক্ষই এই জাতীয় সামগ্রী কিনবে না। তখন সমস্যা হল 'ড্রইং' শিক্ষা (যা পরিকল্পনায় আছে) কি করে দেওয়া যায়।

চিত্রকলা কার্যোপযোগী হোক

এই কথা ভাল করে বুঝে নেওয়া দরকার। চিত্রকলা দুই রকমের—(এক) সৌন্দর্য প্রকাশের জন্যে, আর (দুই) উদ্যোগের জন্যে। প্রথম ভক্তির জন্যে আর দ্বিতীয় কর্মযোগের জন্যে। পাঠ্য-তালিকায় দুই-ই আছে। দেখলাম এর মধ্যেও তারতম্য করা হয়েছে। একথা ভোলা যায় না যে, জীবনে ও শিক্ষায় কর্মযোগই প্রধান। ভক্তি সেই কর্মযোগের শোভা আর জ্ঞান কর্মযোগের প্রভা। সাধারণত মূলোদ্যোগের এ-ই বিচার ধারা আর ড্রইং-এর বেলায়ও তা-ই প্রযোজ্য।

সূতাকাটা, বুনাই, ছুতারের কাজ প্রভৃতিতে যে-ড্রইং প্রয়োজন, তাকেই প্রধানত কর্মোপযোগী রেখাঙ্কন বলা যায়। বিভিন্ন লাইন স্কেচ (আলেখ) করা, নক্সা থেকে কয়েক গুণ বড় করে নক্সা তৈরী করা, কোন নতুন মডেল চোখে পড়লে প্রত্যক্ষ বা স্মৃতি থেকে তার ড্রইং করা, কিম্বা তা থেকে উদ্ভূত অন্য কোন পরিকল্পনার নক্সা করা প্রভৃতি লিখিত, রেখাঙ্কিত, দৃষ্ট, স্মৃত ও কল্পিত সবই এই কর্মোপযোগী রেখাঙ্কনের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ে।

শ্লেট-পেন্সিল আদি উপকরণ

এই কার্যোপযোগী ড্রইং-এর জন্যে বিশেষ কোন উপকরণের প্রয়োজন হয় না। সাধারণ শ্লেট-পেন্সিলেই অধিকাংশ ড্রইং-এর কাজ চলতে পারে। যেগুলিতে কাগজের দরকার হয় তাতে যথাসম্ভব কম কাগজ প্রয়োগ করতে হবে। এতে ড্রইং-পেপারের প্রয়োজন হয় না বললেই চলে। পরিষ্কার করে ড্রইং করলে রবারের

দরকার হয় না, কাজেই রবার কেনার দরকার যাতে না হয় তেমন ভাবে কাজ করতে হবে। আর তা করতে হলে প্রথমে শ্লেটে ভাল করে আঁকা অভ্যাস করে তারপর কাগজে আঁকতে হবে। আলেখের (লাইন স্কেচ) জন্যে রুলকরা কাগজ (গ্রাফ পেপার) আর ছবির জন্যে ড্রইং পেপার দরকার হয়। রুলকরা কাগজ না কিনে ছেলেরা নিজেরা রুল কেটে নিতে পারে। এতে ড্রইং শেখার সহায়তা হবে। এইভাবে অগ্রসর হলে একাধারে উদ্যোগ (শিল্প) কলা, জ্ঞান, আনন্দ ও স্বাবলম্বন সাধিত হয়ে যাবে এবং বহু উপকরণের জঞ্জালেও জড়াতে হবে না।

রঙীন চিত্রকলা (পেন্টিং)

কার্যোপযোগী ড্রইংকে প্রধান স্থান দিলেও সেইসঙ্গে সুন্দর চিত্রকলার আবশ্যকতাকে স্বীকার করতে হবে। কর্মযোগকে আনন্দময় করবার জন্যে এর প্রয়োজন আছে আর তার জন্যে নানা উপকরণের দরকার তো হবেই। সেইসব উপকরণ সম্বন্ধে কি করা যায় তাই হল প্রশ্ন। আর তার জন্যেই প্রবন্ধের অবতারণা এবং এই আলোচনাই এখন করব। উভয়বিধ চিত্রকলার তুলনা করবার জন্যে প্রথমে উপরোক্ত আলোচনা করা হয়েছে।

রংপঞ্চমীর দৃষ্টান্ত

অন্যান্য গ্রামের মতন আমাদের পওনারেও 'রং পঞ্চমী' উৎসবের অনুষ্ঠান হত। আমাদের পরিশ্রমালয়ের ছেলেরা গ্রামের সকলের মতো এতে যোগ দিয়েছে। বাজার থেকে রং কিনে এনে পরস্পরের গায়ে রং দিয়ে কাপড়-চোপড় নষ্ট করে দিয়েছে। তারপর বাজার

থেকেই সাবান কিনে সেই সাবান দিয়ে কাপড় ধুয়ে ফেলতে হয়েছে। তাতেও রং-এর দাগ যায় নি। গ্রামের অন্যান্য লোকেরা কাপড় ধোয়ার জন্যে ব্যস্ত হয়নি, কারণ পরিশ্রমালয়ের ছেলেদের মতো পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার বোধ তাদের ছিল না। আমি ছেলেদের বললাম, 'রং খেলেছ বলে আমি তোমাদের কিছু বলছি নে। কিন্তু রং আর সাবানে পয়সা খরচ করতে গেলে কেন ? এত খরচ করে প্রতিদানে কি পেলে ? সত্যিকারের আনন্দ তো পাও নি। কেবল मुफ्त का चन्दन घिस मेरे लल्लु সেই অবস্থা হয়েছে। তার বদলে কাজকর্ম সেরে সন্ধ্যাবেলা নদীর পারে-পারে মাইল দুই বেড়াতে-বেড়াতে যদি যেতে, তাহলে পুষ্পভারাবনত নয়নানন্দ সারি-সারি পলাশ গাছ তোমাদের চোখে পড়ত। সেই ফুল এনে তা থেকে রং বানাতে পারতে। পলাশ ফুলের রং কেনা রং থেকে সুন্দর আর সুদৃশ্য হত। আর সেই রং ধুয়ে ফেলতে এত বেগও পেতে হত না। এখন বল তো তোমাদের রং খেলার চেয়ে সেই রং খেলা অনেকবেশী মজার হত না কি ? ছেলেরা একবাক্যে আমার প্রস্তাবকে সাধুবাদ দিল।

প্রকৃতিকে গুরু বানাও

রংপঞ্চমীর এই কাহিনী থেকে সৌন্দর্য-চিত্রণ সম্পর্কে যে-প্রশ্ন উঠেছে তার সমাধান পাওয়া যাবে। ছাত্রদের চারদিক প্রকৃতি ঘিরে রয়েছে। এই প্রকৃতির সঙ্গে একাত্মক হয়ে আনন্দ উপলব্ধির এবং বিশুদ্ধ রসবোধের সাধনায় সিদ্ধ হওয়াই সুন্দর চিত্রকলার উদ্দেশ্য। তাদের চতুর্দিকের যে-প্রকৃতি এই সুন্দর চিত্রকলার বিষয়বস্তুর জোগান দেবে, সেই প্রকৃতিই যদি এই সৌন্দর্যসাধনার

উপকরণ না যোগাতে পারে, তাহলে ভগবানের রচিত অতুল সৌন্দর্য আর রইল কোথায়? শিশুর ক্ষুধার উদ্রেক হওয়া মাত্র মাতৃস্তন্যে পীযূষপ্রবাহের আয়োজনের কথা আমরা ভুলে যাই কেন? আশপাশের বৃক্ষাদি থেকে ব্রাশ আর রং স্বচ্ছন্দে পাওয়া যেতে পারে। চিত্রকলার বিষয়বস্তুও এসব তরুলতাতে ওতপ্রোত হয়ে আছে। প্রকৃতি কামধেনুর মতো। দুধ তো দেয়ই, দুধ পান করার জন্যে পাত্রও দেয়। কেবল হাত পেতে নেওয়ার অপেক্ষা।

'আনন্দ-প্রাপ্তি' ও 'আনন্দ-শুদ্ধি'—এই দ্বিবিধ উদ্দেশ্যের কথা মনে রাখতে হবে। আনন্দ তো সকল প্রাণীই পেতে পারে। আনন্দ আত্মার স্বরূপ। আসল প্রশ্ন হচ্ছে আনন্দকে বিশুদ্ধ করা।

ছোটবেলায় দেখা দীপালী উৎসব

কঙ্কন প্রদেশের পাহাড়ঘেরা এক গ্রামে আমার ছেলেবেলা কেটেছে। প্রত্যেক দীপালী উৎসবেই সেখানে কি ভাবে দীপ জ্বালানো হত সে-কথা আমার মনে পড়ে। বন থেকে গোল-গোল কোরাঙ্গটী ফল পেড়ে এনে সেগুলিকে অর্ধেক করে কেটে ভেতর থেকে শাঁসগুলি বের করে নিয়ে সুন্দর বাটির মতো করে নেওয়া হত। সেগুলির তলা মারোয়াড়ী ঘটির মতো গোল বলে বালির উপর বসানো হত। দেওয়ালের উপর বালি দিয়ে সারি-সারি ওগুলি বসিয়ে দিয়ে তাতে কঙ্কনের স্বদেশী খাঁটি নারিকেল তেল ভরে দেওয়া হত। কঙ্কনে কাপাস দুর্লভ, তাই দেবকাপাস (শিমুল?) দিয়ে সলতে করা হত। পরে প্রদীপ জ্বালানো হত।

প্রদীপগুলি চারকোনা, তিনকোনা, গোল প্রভৃতি নানাভাবে সাজিয়ে দেওয়া হত। এইভাবেই আমাদের দেওয়ালী হত। দেওয়ালীর রাত্রি হল চারমাস বর্ষার পর প্রথম মেঘমুক্ত অমাবস্যা-রাত্রি রজনীদেবী আপন পূর্ণ ঐশ্বর্য নিয়ে প্রকাশিত। চন্দ্রদেবের আধিপত্যের অবসানে সৌন্দর্যসৃষ্টির ভার নিয়েছে উর্ধে ছোট-বড় অসংখ্য তারার দীপাবলী আর নীচে তাদেরই প্রতিকৃতি অগণন প্রদীপের সারি। তখন মনে হয় নি কিন্তু এখন মনে হচ্ছে, যদি কেবলমাত্র আমাদের দীপাবলী দিয়েই রাত্রিকে সাজাতে পারতাম, তাহলে অন্ধকার আরও বর্ণাঢ্য হত।

দেওয়ালীর আরেক দৃশ্য

এ তো গেল চল্লিশ বছর আগেকার গ্রামের কথা। বর্তমান কালের গ্রামের সংশোধিত দীপালীর কথাও স্মরণে আসছে। খাদিকার্য পরিদর্শনের জন্যে আমি একবার মাওলী গিয়েছিলাম। সেদিন দেওয়ালী ছিল। মাওলীর ছেলেরা কাঁচের চিমনী ছাড়া কেরোসিন তেলে দস্তার কুপি সারি বেঁধে জ্বালিয়ে দেওয়ালী করেছিল। কলের চিমনী দিয়ে কিম্বা সিগারেটপায়ীর মুখ থেকে যেমন অনর্গল ধোঁয়া বেরোয়, তেমনি করে কুপিগুলি থেকে অনর্গল ধোঁয়া বেরুচ্ছিল। ছেলেদের তাতে দেওয়ালীর আনন্দের অভাব হয়নি। ওদের কোন দোষ ছিল না। ইংরেজের উন্নতির রসায়ন তো আর মামুলী জিনিস নয়। কথায় বলে, 'দেবতার কীর্তি গাছের আগায় জল আর ইংরেজের কীর্তি কলের মুখে জল!'

সত্যকারের সমন্বয়

কিন্তু শিক্ষকেরা বলেন, 'আনন্দ-শুদ্ধির উদ্দেশ্য তো ঠিকই, তবে আপনার কথা মতো ব্রাশ তৈরী করলে এবং ফুল আর পাতা থেকে রং প্রস্তুত করলে কাজ অনেক বেড়ে যাবে। তাহলে অন্যান্য লেখাপড়ার কি ব্যবস্থা হবে ?' এই ধরণের আক্ষেপ তাঁরাই করেন, যাঁরা সমবায়-পদ্ধতির অর্থ ঠিক বুঝতে পারেন না। এই প্রশ্ন ঠিক সেরকম—বেশী শস্য হলে ক্ষুধার কি উপায় হবে ? এর উত্তর এত সহজ যে, উত্তর দেওয়ারও প্রয়োজন নেই। আবার এটা এত কঠিন সমস্যা যে, প্রত্যক্ষভাবে ঐরকম পাঠশালা চালাতে হবে।

এখানে মূলোদ্যোগের পাঠ্যক্রমের দুই উদ্দেশ্য উদ্যোগ-সিদ্ধি আর আনন্দ-শুদ্ধি সম্বন্ধে বলার ইচ্ছা ছিল। উপকরণের আলোচনা প্রসঙ্গে সেই কথাই বললাম।

—('সিংহাবলোকন' থেকে)

চিত্রকলার দৃষ্টিভঙ্গী

সঙ্গীত ও চিত্রকলার উদ্দেশ্য

বালকোবা কিছুদিন আগে জিজ্ঞাসা করেছিল—'সঙ্গীত ও চিত্রকলার উদ্দেশ্য কি ?' আমি উত্তরে বলেছিলাম, 'এই সংসারে ভগবান শুধু তাঁর নাম এবং রূপ প্রকাশ করেছেন, তাছাড়া তিনি তো অব্যক্ত হয়েই আছেন। সঙ্গীতের দ্বারা তাঁর নাম গান করা আর চিত্রকলার দ্বারা তাঁর রূপ চিত্রিত করা যায়।'

আমাদের পাঠ্যক্রমে সর্বনিম্ন শ্রেণী থেকে চিত্রকলা শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছে। উদ্যোগ দ্বারা শিক্ষা বলতে আমরা যা বুঝি, তাতে চিত্রকলা ছাড়া কাজ চলতে পারে না। কিন্তু চিত্রকলা ও চিত্রকলার দৃষ্টিভঙ্গী ভিন্ন বস্তু। যে এই দৃষ্টিলাভ করেছে, সে ব্যবহারিক জীবনে কোন অসুন্দর কাজ করবে না। ছাত্রদের মধ্যে চিত্রকলার এই দৃষ্টিভঙ্গী ফুটিয়ে তুলতে হবে। ছবি আঁকার হাত হওয়াই চিত্রকরের পক্ষে যথেষ্ট নয়, ছবি আঁকার চোখও হওয়া চাই। সোজা হয়ে বসার মধ্যে, ড্রিলের সময় সমানান্তরে দাঁড়াবার মধ্যে, খাওয়ার সময় পংক্তিবদ্ধ হয়ে বসার মধ্যে চিত্রকলার দৃষ্টি দরকার।

লেবু কাটার ঢং-এর মধ্যেও চিত্রকলার দৃষ্টি দরকার। লেবু আড়াআড়িভাবে কাটলে বীচি আর রস সহজে বার করা যায়। কমলালেবু খাওয়ার সময় চোকলা দুটো বাটির আকারে ছুলে নেওয়া উচিত, কারণ তাতে ছিবড়াগুলি রাখা যায়। পেপেও লম্বালম্বি না কেটে আড়াআড়ি করে দুটো বাটির আকারে কাটলে সুবিধা হয়। কলা অল্প-অল্প করে ছুলে খাওয়া উচিত, তাহলে হাত নোংরা হয় না। এরকম আরও অনেক উদাহরণ দেওয়া যায় যাতে বোঝা যাবে যে, পরিপাটিভাবে কাজ করা আর সৌন্দর্যদৃষ্টি চিত্রকলারই বিষয়।

আজকাল অনেকে কাল টুপি পরেন। এমনিতেই ভারতবাসীদের গায়ের রং কাল, চুল কাল, তার উপর আবার কাল টুপি—ঠিক কাকের মতো দেখতে হয়। নানা রং মেলালে সুন্দর হয়—বিভিন্ন রংয়ে বিভিন্ন ভাব ব্যক্ত হয়। সাদা রং পবিত্রতার এবং লাল ও গোলাপী রং প্রেমের ভাব প্রকাশ করে। ঈষৎ রক্তবর্ণ উষাকাল

পরমেশ্বরের প্রেম ব্যক্ত করে আর উজ্জ্বল শুভ্রবর্ণ প্রভাতকাল যেন মায়ের মতো স্নেহস্পর্শ দিয়ে সন্তানদের জাগিয়ে তোলে। উষাকালের দ্বারা উদ্বোধিত না হলে কোন কবি বা চিত্রকরের চলে না।

আর এই অনন্ত আকাশ! এছাড়া চিত্রকলা তো ব্যর্থ। রাত্রির শুকতারা কি উজ্জ্বল! দেখতে দেখতে মন পবিত্রভাবে পূর্ণ হয়ে যায়। শুক্র (শুক) শব্দের উৎপত্তি 'শুচি' শব্দ থেকে। ডুবুরীরা সমুদ্রতল থেকে যে মুক্তারাজি আহরণ করে আনে সে-সবও এই তারার কাছে তুচ্ছ। তুলসীদাস রামরাজ্যের বর্ণনাচ্ছলে বলেছেন যে, সেরাজ্যে সমুদ্র স্বয়ং বালুতটে মুক্তা বিছিয়ে রাখত। তুলসীদাস আরও দুই লাইন যোগ করলে পারতেন—সমুদ্রবেলায় কুড়িয়ে পাওয়া সেই মুক্তা নিয়ে ছেলেরা খেলত আর খেলাচ্ছলে সে-সব আবার সমুদ্রকেই ফিরিয়ে দিত। এতে মুক্তার প্রকৃত মূল্য দেখানো হত। নিটোল মুক্তা পেলে আমরা বহু মূল্যে তাকে কিনি, কিন্তু অর্থের দ্বারা সৌন্দর্য নিরূপণ নিছক গ্রাম্যতা ছাড়া আর কি?

প্রকৃতিদর্শন ব্যতীত চিত্রকলা সম্ভব নয়। মনু বলেছেন যে, রাত্রিশেষে জেগে উঠে হাতমুখ না ধুয়ে পবিত্র নক্ষত্ররাজির দিকে তাকানো অন্যায়। কারণ অশুচি চোখে এত শুদ্ধবস্তু কি করে দেখা যায়!

রংবল্লী বা রাঙ্গোটীর পরিকল্পনা নক্ষত্রখচিত আকাশ থেকেই নেওয়া হয়েছে। অনেকগুলি ফুটকি এঁকে অভীষ্ট ছক তৈরী করে রংবল্লী বানানো হয়। আকাশের চিত্র নীচে আঁকাই তো দীপালীরও উদ্দেশ্য। দীপালীর তাৎপর্য হচ্ছে বর্ষাধৌত আকাশের প্রথম অমাবস্যা

আর কোজাগরী পূর্ণিমা হচ্ছে বর্ষাস্নিগ্ধ আকাশের প্রথম পূর্ণিমা। এই দুইটি দিনে উৎসবের অনুষ্ঠান করার উদ্দেশ্য হচ্ছে আকাশ দর্শনের দিকে লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করা। এইজন্যে দীপালীতে নক্ষত্রের আকারের ছোট-বড় নানারকমের উজ্জ্বল দীপাবলী দিয়ে সাজানো উচিত।

ব্যবর্তক চিত্রকলা

চিত্রকলাদ্বারা প্রত্যেক বস্তুর সার্বজনীন ও বিশেষ গুণ প্রকট করা চাই। সামান্য বিশেষ থেকে গৌণ ও মুখ্যের ভিন্নতা স্পষ্ট হয়। মানুষের মুখ আঁকলেই বোঝা যায় এটি মানুষের ছবি আর হাতীর শুঁড় আকলেই হাতী বোঝানো যায়। একেই শাস্ত্র 'ব্যবর্তক ব্যাখ্যা' বলেছেন। ব্যবর্তকের অর্থ অন্য বস্তুসমূহ থেকে কোন বস্তুকে পৃথক করা। তাঁরা ষাঁড়ের সংজ্ঞা দিয়েছেন 'বিষাণ কুকুভ্যাম'— শৃঙ্গ ও ককুদওয়ালা জীব। বস্তুত সংসারে ষাঁড় ছাড়া আর কোন প্রাণীরই একসঙ্গে এ দুইটি নেই।

স্মৃতি থেকে চিত্রাঙ্কন

দ্বিতীয় বক্তব্য হচ্ছে—'মেমরী ড্রইং'। স্মৃতি থেকে চিত্রাঙ্কন করতে অভ্যস্ত হতে হবে। কোন যন্ত্র কিম্বা অট্টালিকা দেখে এসে ঠিক-ঠিক তার ছবি আঁকা শিখতে হবে। বাস্তবজীবনে জিনিসগুলি যেরকম দেখায় সেরকমই আঁকতে হবে, তা যদি দৃষ্টিভ্রমজনিত হয় তাহলেও। রেল-লাইনের ছবি আঁকতে হলে দুইটি সমানান্তরাল লম্বা পাত এঁকে দিলে হবেনা। দূরে গিয়ে লাইন দুটো যেন মিশে গেছে এমনিভাবে আঁকতে হবে। দুইটি নক্ষত্রের ব্যবধান উদয়কালে

বেশী দেখায় আর মাথার উপর কম দেখায়। তেমনি, উদয়কালে সূর্য বড় দেখায়, ক্রমেই যত উপরে ওঠে তত ছোট দেখায়, অস্ত যাওয়ার সময় আবার বড় দেখায়। এরকম আশ্চর্য তারতম্য দৃষ্টি ভ্রমের দরুন দেখা যায়। ছবিতেও অবিকল এরকমই আঁকতে হবে।

সাংকেতিক চিত্রকলা

সাংকেতিক চিত্রকলাও শিখতে হবে। উদ্যানে বৃক্ষ-লতা-গুল্ম প্রভৃতি শ্রেণীবদ্ধভাবে সাজানো থাকে। সারিবদ্ধ গুল্মের উপরটা ছাঁটা থাকে। সব ছিমছাম পরিপাটি। এইসব দেখে আমাদের আনন্দ হয়। আবার বনে নানা আকারের উঁচুনীচু গাছপালা দেখতে পাওয়া যায়, সেখানকার নিসর্গশোভা দেখেও আমাদের আনন্দ হয়। সাজানো বাগান আর নিরঙ্কুশ বনশ্রী, দুই-ই নয়নাভি-রাম। এর কারণ হচ্ছে উদ্যানে ঈশ্বরের পারিপাট্য গুণ প্রকাশিত আর বনে তাঁর নির্মলতা। চিত্রকরকে এই দুই-এর তাৎপর্য অনুধাবন করতে হবে, তাহলেই প্রত্যেক বস্তুর আসল রূপটি তিনি চিত্রে ফুটিয়ে তুলতে সক্ষম হবেন।

পাশ্চাত্য দেশে ন্যায়-দেবতার প্রতীক চিত্র হচ্ছে একজন অন্ধ নারী। তিনি তুলাদণ্ড সমানভাবে ধরে বসে আছেন। তাঁর তুলাদণ্ড কোনদিকে ঝোঁকে না। কেউ-কেউ জিজ্ঞাসা করতে পারেন, ন্যায়-দেবতাকে অন্ধ করা হল কেন? আর তিনি নারী হলেন কেন, পুরুষও তো হতে পারতেন? তাছাড়া তুলাদণ্ড দুই দিকেই যদি প্রথম থেকে সমান ওজন থাকে, তাহলে বিচারকের প্রয়োজন কি?' এসবের উত্তর হচ্ছে: অন্ধ ছোট-বড় ভেদ করতে পারে না,

বিচারেও এই ভেদ করা হবে না। তাৎপর্য : অন্ধতা পক্ষপাতশূন্যতার প্রতীক। ন্যায়-দেবতাকে স্ত্রীরূপ দেওয়ার অর্থ মেয়েরা সাধারণত দয়ালু হয়। বিচারক দয়ার্দ্রহৃদয়ে বিচার করবেন। আর তুলাদণ্ডের সমানতার অর্থ ন্যায় অবিমিশ্র হওয়া চাই। এই সাংকেতিক চিত্রে ন্যায়ের তিনটি দিক দেখানো হয়েছে—(১) পক্ষপাতশূন্যতা, (২) দয়ালুতা, (৩) শুদ্ধতা।

দত্তাত্রেয়ের মূর্তিতে তাঁর তিন মুখই একরকম দেখতে। শাস্ত্রানুসারে তিন মুখ তিন রকমের হবে। প্রথম মুখ সাত্ত্বিকভাব প্রকাশক অর্থাৎ পরিচ্ছন্ন, সুন্দর আর পবিত্র; দ্বিতীয় মুখ হবে তামসিক অর্থাৎ কদর্য ও নিদ্রাচ্ছন্ন; তৃতীয় মুখ হবে উৎসাহ, আবেগ ও পরাক্রম প্রভৃতি রজোগুণযুক্ত। তাহলেই তাঁর প্রকৃত মূর্তি হবে আর তিন মুখ তিনগুণের প্রতীক হবে। হিন্দুদের মূর্তিপূজা প্রতীক চিত্রকলার দৃষ্টান্তে ভরা।

উৎসব-অনুষ্ঠানে পূর্ণকলস দরজার কাছে রেখে স্বাগত জানানো হয়। প্রেমপূর্ণ হৃদয়ের প্রতীকরূপেই পূর্ণকুম্ভ স্থাপন করা হয়। মাটি কিম্বা সোণা, এছাড়া অন্য কোন ধাতুর তৈরী কলস হলে চলবেনা। সোণা বৈভবের প্রতীক আর মাটি বৈরাগ্যের। স্বাগত করার সময় আপন বৈভব ব্যক্ত করতে হবে কিম্বা বৈরাগ্য।

ভাব-নির্দশক সংকেত

ইংরেজরা টুপি উঠিয়ে অভিবাদন করেন। এদেশের লোকেরা টুপি পরে স্বাগত জানান। এর অর্থ কি? ইংরেজদের দেশ শীত-প্রধান, তাই টুপি খুলে অতিথির জন্যে কষ্ট স্বীকার করতে প্রস্তুত—

এইভাবটি প্রকাশ করা হয়। এদেশ গ্রীষ্মপ্রধান, আমরা টুপি পরে কষ্ট করার স্বীকৃতি প্রকাশ করি। তুলসীদাস রাম ও ভরতের মিলন দৃশ্য বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন রাম তীর-ধনুক ফেলেই ভরতকে স্বাগত করার জন্যে দাঁড়িয়ে উঠলেন। 'কঁহু পট কহুঁ নিষঙ্গ ধনুতীরা' একথা বলে তুলসীদাস ভরতের জন্যে রামের আকুলতা প্রকাশ করেছেন।

সুসম ও অসমান চিত্র

কতকগুলি বস্তু আছে যা সুসম আর কতকগুলি অসমান। ছবিতে এগুলি যথাযথ দেখাতে শিখতে হবে। বস্তুর মধ্যভাগের দিকে তাকিয়ে সুসম কি-না বুঝতে হয়। চতুষ্কোণের (চৌরস) ৪ বাহুই সমান, এ চারদিক থেকে সুসম। আর লপেটার দুই বাহু সমান অর্থাৎ দুই দিক দিয়ে সুসম। একটি বর্তুল সবদিক থেকেই সুসম, কারণ সবদিক থেকেই বর্তুলকে সমানভাগে ভাগ করা যায়। বস্তুর বিভিন্ন সুসম (symmetrical) আকৃতি গড়তে শিখতে হবে। কোন symmetrical চিত্র অঙ্কন করতে হলে অর্ধেক দেখে পুরাটা আঁকতে হয়। সাধারণত ডান-দিক দেখে বাঁ-দিক আঁকা হয়। এর উল্টো বাঁ-দিক দেখে ডান-দিকও আঁকতে শিখতে হবে। ডান হাত ও বাঁ-হাতে সমানভাবে যাতে ছবি আঁকতে পারে এমন করে শিক্ষা দিতে হবে। —(মহিলাশ্রমের শিক্ষকদের নিকট প্রদত্ত বক্তৃতা)

এক বেসিক ট্রেনিং কলেজের কথা

(আলোচনা)

[বিনোবাজী এক কলেজ পরিদর্শনে গিয়েছিলেন। সেখানে সূতা কাটা, তুলা ধোনা, তুনাই করা চলছিল। বিনোবা সূতা কাটতে বসে গেলেন। কেবল বলার পরিবর্তে এরকম প্রত্যক্ষভাবে উপদেশ দিতে তাঁর বেশী আনন্দ হয়। কিন্তু তিনি যখন সূতা কাটছিলেন তখন লোকেরা 'উপন্যাসে'র দাবী করল। তেলেগুতে বক্তৃতাকে 'উপন্যাস' বলে। বিনোবাজী বললেন, 'আপনারা নিজেদের ক্লাস নিন, আমি দেখব।' ট্রেনিং নেওয়ার জন্যে তা ছিল শিক্ষক-ছাত্রদের ক্লাস।

বিনোবাজী ক্লাসের কাজ দেখলেন। পাঁজ দিয়ে কি করে গণনা শেখানো যাবে সে-কথা বলা হচ্ছিল। সাধারণত শিক্ষকেরা যেভাবে বলে থাকেন, সেভাবেই বলা হচ্ছিল। বিনোবাজী তাঁদের বললেন, 'আপনারা পাঁজ দিয়ে গণনা শেখান কেন? এভাবে শেখাতে হলে নুড়ি দিয়ে শেখানোই ভাল, নাহলে পাঁজগুলি খারাপ হয়ে যায়। উদ্যোগের কাজ হচ্ছে সবরকম শিক্ষার সুযোগ করে দেওয়া। বাকীটা তো নিজ-নিজ ঢং-এ হবে। সূতাকাটার সময় নিজ-নিজ পাঁজ গুনে নিয়ে বসার নির্দেশই যথার্থ নির্দেশ।'

শিক্ষকেরা পাঠ্যপুস্তক ভাল পাওয়া যায় না এই অভিযোগ করলেন। কিন্তু জিজ্ঞাসা করে জানা গেল যে, কৃষ্ণদাসভাই-এর 'কতাই-গণিত' বইটির কথা এঁরা জানেন না। বিনোবাজী বললেন,

'হয় আপনারা তাড়াতাড়ি হিন্দী শিখে এই বইটি পড়ে নিন, আর নইলে এর অনুবাদ করিয়ে নিন। বুনিয়াদী-সাহিত্যের সঙ্গে পরিচিত না হলে বুনিয়াদী-শিক্ষালয়ে শিক্ষকতা কি করে সম্ভব হবে?' এরপর কলেজের শিক্ষকদের সঙ্গে আলোচনা হয়। তাঁরা তাঁদের আশঙ্কা ও বাধাবিঘ্নের কথা তাঁকে জানান।]

প্রশ্ন—অনুবন্ধ-পদ্ধতির কোন বই নেই। এ কি করে পড়ানো হবে?

বিনোবা—ঠিক প্রশ্ন করেছেন। এর বই অভিজ্ঞতা থেকে আস্তে-আস্তে হবে। কিন্তু যেসব বই লেখা হয়েছে, আপনারা সেসব পড়েন না। অনুবন্ধ-পদ্ধতির প্রধান কথা এখন তো এইটুকু মাত্র জেনে রাখুন যে, যা কাজের সঙ্গে-সঙ্গে শেখানো যায় না, সেসব শিক্ষার লোভ ছাড়তে হবে।

প্রশ্ন—তাহলে বিজ্ঞান শিক্ষা কি করে হবে?

উত্তর—নিশ্চয় হবে। ছেলে কৃষি করবে, কাপড় বুনবে, আহার করবে, অসুস্থ হবে—এসবই তাঁর জ্ঞানলাভের উপায়। এতেই তো সমস্ত বিজ্ঞান এসে যাবে।

প্রশ্ন—বুনিয়াদী পরিকল্পনা কি ডাল্টন, কিণ্ডারগার্টেন, মণ্টেসরী প্রভৃতি পদ্ধতির সংশোধিত রূপ, না কোন ভিন্ন পরিকল্পনা?

উত্তর—বুনিয়াদী পরিকল্পনা কোন পরিকল্পনার সংশোধিত রূপ নয়। এ একটি ভিন্ন ও বিশিষ্ট পরিকল্পনা। অন্য পরিকল্পনায় ছাত্রদের কোন উৎপাদক শিল্প বা কাজ শেখানো হয় না। নঈ-তালীম দেশের উৎপাদন বাড়াচ্ছে, ছাত্রকে স্বাবলম্বী করে গড়ে

তুলছে আর জ্ঞানদানও করছে। এতে ভারতবর্ষের অবস্থানুসারে যা সর্বোত্তম ও উপযোগী সেইরকম শিক্ষাপদ্ধতিই গ্রহণ করা হয়েছে এবং একেই নঈ-তালীম বলা হয়। উদ্যোগের মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন এ কথা স্বীকার করেও অন্যান্য পদ্ধতির কোন পদ্ধতিই জীবিকা উপার্জনের মাধ্যমে শিক্ষাদানকে গ্রহণ করেনি।

প্রশ্ন—আমাদের দেশের প্রাচীন শিক্ষাপদ্ধতি সম্বন্ধে জ্ঞান থাকা কি শিক্ষকদের পক্ষে প্রয়োজন ?

উত্তর—আবশ্যক নেই, তবে জেনে নিলে উপকার হতে পারে। গণিত শেখানোর সময় কি আমরা ভাস্করাচার্যের 'লীলাবতী' পড়াই ? 'লীলাবতী' পড়লে শিক্ষকের গণিতের ঐতিহাসিক বিকাশ সম্বন্ধে জ্ঞান হবে।

প্রশ্ন—ইতিহাস শিক্ষায় ঘটনাপর্যায়ের প্রাধান্য কি আপনি স্বীকার করেন ?

উত্তর—ঘটনাপর্যায়ের জ্ঞান যথাসময়ে হবে। প্রথম ছেলেদের ঐতিহাসিক মূলতত্ত্ব সম্বন্ধে জানতে হবে। ইতিহাসের সাধারণ জ্ঞান আগে হবে, পরে বিশদ জ্ঞান। বুনিয়াদী শিক্ষাপদ্ধতির সঙ্গে প্রচলিত শিক্ষার যে মৌলিক পার্থক্য আছে, তা আমাদের বুঝে নিতে হবে। ইতিহাস, গণিত, ব্যাকরণ প্রভৃতি শেখাতে হবে না, শেখাতে হবে জীবন। অর্থাৎ জীবনকে কার্যক্ষম করে তোলাই আমাদের শিক্ষার উদ্দেশ্য। শিবাজী কি ব্যাকরণ পড়েছিলেন, না শঙ্করাচার্য ইতিহাস পড়েছিলেন ? শিষ্যকে পুরুষার্থশীল করাই গুরুর উদ্দেশ্য। এরপর ধীরে-ধীরে সবই এসে পড়বে।

প্রশ্ন—দেশে যখন শিল্পের যন্ত্রীকরণ হবে, তখন যেসব হাতের কাজ অল্পবয়সে ছেলেরা শিখবে সেগুলি কোন কাজে লাগবে কি? ছেলেরা বড় হয়ে কি তা দিয়ে তখন রোজগার করতে পারবে?

উত্তর—আপনার প্রশ্ন শিক্ষাবিষয়ক নয়, অর্থবিষয়ক। এসম্বন্ধে ভাবনার দরকার নেই। রাশিয়াতে যন্ত্রীকরণ হওয়া সত্ত্বেও প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে ছোট-ছোট হাতের কাজের মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়া হয়। ছেলেদের সাধ্যানুসারে এমন শিক্ষা দেওয়া হবে যাতে তাদের শক্তির বিকাশ হতে পারে। এই উদ্দেশ্যে সমস্ত অবস্থায় হাতের কাজের মাধ্যমে শিক্ষাই শ্রেয়।

প্রশ্ন—শ্রেণী অনুসারে শিক্ষাদান কি আপনি পছন্দ করেন?

উত্তর—প্রথমে স্থূলজ্ঞান, পরে সূক্ষ্মজ্ঞান—এরকম ক্রমে আমার পছন্দ। প্রথমে কোন বিষয়ের এক অংশ পরে অন্য অংশ—এরকম ক্রম আমার পছন্দ হয় না। আপনাদের পাঠ্যতালিকায় তৃতীয় শ্রেণীতে মাদ্রাজ প্রদেশের ভূগোল আর চতুর্থ শ্রেণীতে ভারতবর্ষের ভূগোল রাখা হয়েছে। কিন্তু ইতোমধ্যে যদি বিহারে ভূমিকম্প হয়, তাহলে তৃতীয় শ্রেণীর ছেলেদের বিহার কোথায় তা বলা হবে, না মাদ্রাজের ভূগোলই শেখানো হবে?

প্রশ্ন—কিন্তু সামান্য শিক্ষকদের এতটা বোধ আছে কি?

উত্তর—যদি বোধই না থাকে, তবে শিক্ষক হওয়া কেন?

প্রশ্ন—নঈ-তালীমে কবিতার স্থান থাকবে কি-না?

উত্তর—যথাসময়ে হবে। গান্ধীজয়ন্তী অনুষ্ঠানের সময় 'বৈষ্ণব-জন' গান হবে। প্রহ্লাদের জীবনী কবিতায় শেখানো যায়।

প্রশ্ন—নঈ-তালীমের মাধ্যম কি মাতৃভাষা হবে, না রাষ্ট্রভাষা ?

উত্তর—তালীমের জন্যে দুই ভাষার জ্ঞানই প্রয়োজন হবে। তবে লেখাপড়ার মাধ্যম প্রাদেশিক ভাষা হবে।

প্রশ্ন—প্রত্যেক বিষয়ে উপযুক্ত সুযোগ উপস্থিত হলে তবে শিক্ষা দিতে হবে—একথা আপনি বলেছেন। ছেলে যদি কোনদিন অনুপস্থিত থাকে, তাহলে তো সে সেইদিনের শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হবে।

উত্তর—সাত-আট বছর বয়সীদের শ্রেণীতে এমন কোন্ প্রসঙ্গ আলোচনা হবে, যা একাধিকবার আসবে না ?

['কুমারবোলু' আশ্রমে ছোটমেয়েরা বিনোবাজীর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল। তারা একেবারেই হিন্দী জানত না। আধঘণ্টা তিনি ওদের সঙ্গে কথা বলেন। এই সময়ের মধ্যে হিন্দীতে ১০ পর্যন্ত গণা, নিজের নাম বলা আর অন্যের নাম জিজ্ঞাসা করা তাদেয় শিখিয়ে দিয়েছিলেন।]

এই শিক্ষা কবে সফল হবে ?

বীরবর্ম বিনোবাজীকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'যে-গতিতে নঈ-তালীম চলছে, আপনি কি মনে করেন তাতে প্রলয়কাল পর্যন্তও এই শিক্ষা সম্পূর্ণ হবে ?'

বিনোবাজী উত্তরে বললেন : প্রশ্নের পশ্চাতে এই মনোভাব রয়েছে যে, ব্যাপক কাজ এক সরকারই করতে পারে। আমিও একথা স্বীকার করি যে, ব্যাপক কাজ সরকার করে থাকে। কিন্তু সমস্ত শিক্ষার ভার সরকারের হাতে ছেড়ে দিতে আমি প্রস্তুত নই।

তাছাড়া সরকারী পাঠশালা সব এক ছাঁচে হয়। কিন্তু বুনিয়াদী বিদ্যালয় হবে স্বতন্ত্র, সেখানে স্বাধীনভাবে প্রয়োগ চলবে। আমি নম্রতার সঙ্গে বলছি যে, কল্পনা অনুযায়ী কোন বিদ্যালয় এখনও আমার চোখে পড়েনি। নঈ-তালীমের তাত্ত্বিক জ্ঞান আমার যথেষ্ট আছে। কিন্তু আমি তো এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়াই। কোন স্কুল পরিচালনা করি নে। অন্যদেরও একই অবস্থা। তবে একাজ কি করে হবে ? যিনি বেসিক শিক্ষা সম্বন্ধে ভাল করে জানেন, তিনি যদি এরকম একটি স্কুল চালাতে আরম্ভ করেন এবং আদর্শ বিদ্যালয় গড়ে তোলেন, তাহলে নঈ-তালীমের যথার্থ স্বরূপ প্রকাশিত হবে। নিজের সম্বন্ধে শুধু এইটুকু বলতে পারি যে, আমি বেসিক শিক্ষার কিছু প্রয়োগ করেছি এবং ভাল ফলও পেয়েছি। তবে তা ছোট-ছোট ছেলেদের বিদ্যালয় ছিল না। তাকে উত্তরবুনিয়াদী-শিক্ষার প্রয়োগশালা বলা যেতে পারে। সেই বিদ্যালয়ে শিক্ষাপ্রাপ্ত ছেলেরাই এখন আমার সঙ্গে কাজ করছে। সেবার জেল থেকে বেরিয়ে এসে ভেবে দেখলাম যে, আমার জন্যে একটি কাজই রয়েছে এবং তা বুনিয়াদী-শিক্ষার কাজ। কিন্তু ভগবানের ইচ্ছা অন্যরকম ছিল। এরপর যদি আবার কখনও কোথাও বসবাস করবার সুযোগ ঘটে, তাহলে ফের এই নঈ-তালীমের কাজেই লেগে যাব। কিছুক্ষণ আগে কুমারবোলু গিয়েছিলাম। সেখানে আধঘণ্টা মেয়েদের পড়ালাম। তাতে এমন মগ্ন হয়ে গিয়েছিলাম যে, আমার সময়ের জ্ঞান ছিল না। অন্যকাজে ডেকে নেওয়াতে শিক্ষাদান বন্ধ করতে হল।

আপনাদের মধ্যে যাঁরা শিক্ষা দিতে ভালবাসেন, তাঁরা এই শিক্ষা-

কার্যে জীবন দিন। আমরা একথা প্রমাণ করতে পারি যে, বুনিয়াদী বিদ্যালয় খুব কম সাহায্যে চলে। আমি বেসিক স্কুল চালালে বাড়ী-ঘর, উপকরণের ব্যয় বাদে আর সব টাকা ফিরিয়ে দেব। বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের ছাত্রেরা অন্যান্য বিদ্যালয়ের ছাত্রদের অপেক্ষা অনেক বেশী জ্ঞানবান ও প্রাণবান হবে। এরকম যদি একটি বিদ্যালয়ও আমরা চালিয়ে দেখাতে পারি, তাহলে তা দেখবার জন্যে সারা দুনিয়ার লোক আসবে। যাঁরা শিক্ষার প্রয়োগ করেছেন, তাঁরা কয়েকজন ছাত্র নিয়েই আরম্ভ করেছেন আর দুনিয়া তাঁদের পদ্ধতি স্বীকার করেছে।

পূর্ব-বুনিয়াদী সম্বন্ধে আলোচনা

[বোম্বাই-এর 'শিশু-বিহার-গৃহে'র কয়েকজন শিক্ষক ও ছাত্র প্রত্যেক বছর ভ্রমণে বেরোন্। এইবার তাঁরা ওয়ার্ধা, সেবাগ্রাম, পওনার দেখতে এসেছিলেন। বালওয়াড়ী (শিশুশিক্ষা) সম্বন্ধে তাঁদের সঙ্গে নিম্নলিখিত আলোচনা হয়েছিল।]

প্রশ্ন—আজ আমরা সেবাগ্রামে যে-শিক্ষাপদ্ধতি দেখে এলাম, তা গ্রামের ছেলেমেয়েদের জন্যে উপযুক্ত। শহরের ছেলেমেয়েদের জন্যে এই পদ্ধতিতে আপনি কী পরিবর্তন প্রয়োজন মনে করেন?

বিনোবা—আপনাদের কী রকম পরিবর্তন হওয়া প্রয়োজন বলে মনে হচ্ছে? শহর আর গ্রামে কী পার্থক্য? দুই জায়গাতেই একই

সূর্য-চন্দ্র ওঠে। দুই জায়গাতেই ছেলেমেয়েরা পিতামাতার সঙ্গে পারিবারিক পরিবেশে লালিত-পালিত হয়। তবে, এক জায়গায় আছে প্রদীপ, অন্য জায়গায় বৈদ্যুতিক আলো। আর বিশেষ কি পার্থক্য আছে ?

শহর ও গ্রামের পার্থক্য

প্রশ্ন—শহরে যান্ত্রিক পরিবেশ বর্তমান।

বিনোবা—তাতে পার্থক্য হল কি করে ? এক ছেলে মোটর-গাড়ীতে চড়ে আর অন্য ছেলে গরুর গাড়ীতে। প্রথমটি ইঞ্জিন ও পেট্রোল সম্বন্ধে সব শিখবে আর দ্বিতীয়টি গাড়ীর চাকা ও বলদ সম্বন্ধে জ্ঞান আহরণ করবে। মোটকথা চতুর্দিকের পরিবেশের মাধ্যমে বালকের বিকাশ হবে। তাছাড়া পরিবেশের পার্থক্য তো গ্রামে-গ্রামেও আছে। এখানকার ছেলেরা জোয়ারের ক্ষেত দেখে তো কঙ্কনের ছেলেরা ধানের। এই দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে শহর আর গ্রামের পার্থক্য বুঝতে হবে।

প্রশ্ন—গ্রামের ছেলেরা স্বাবলম্বী হবে, শহরের ছেলেরা তা হবে না।

বিনোবা—কেন হবে না ? ধরুন, শহরে একটি হোটেল আছে। সেখানে ছেলেদের রান্নাসম্বন্ধে যাবতীয় শিক্ষা দেওয়া যায়। পরিবেশ অনুসারে শিক্ষা হবে—সে শহরই হোক আর গ্রামই হোক। গ্রামে রান্না শেখাতে হলে কাঠের আগুনে রান্না করা শেখাতে হবে আর শহরে কয়লার আগুনে। এই মাত্র তফাত। এতে রান্না শেখানোর মধ্যে কি পার্থক্য রয়েছে ?

প্রশ্ন—একেবারে ছোট ছেলেমেয়েদের জন্যে শহরে কি কাজ আরম্ভ করা হবে ?

বিনোবা—এতে তো কোন অসুবিধা দেখছিনে। দুই জায়গাতেই জল, বাতাস, আলো আছে। দুই জায়গার ছেলেমেয়েরাই চোখ দিয়ে দেখে, কান দিয়ে শোনে, হাত দিয়ে স্পর্শ করে। দুই জায়গাতেই উঁচুতে উঠতে হয় আর উঁচু থেকে নীচে নামতে হয়। গ্রামে ছেলেমেয়েরা টিলাতে উঠবে, টিলা থেকে নামবে। শহরের ছেলেমেয়েরা চারতলা বাড়ীর ছাদে উঠবে, সেখান থেকে নামবে। এতটুকুই তো তফাত, নয় কি ?

প্রশ্ন—দুই জায়গার back ground (ভূমিকা) একই—এ কী করে মনে করা যাবে ?

বিনোবা—যদি আপনারা দুই জায়গাতেই কল্যাণকর্ম শিক্ষা দিতে ইচ্ছুক হন, তাহলে দুই জায়গার পৃষ্ঠভূমিই দেখতে পাবেন এক। ঐজায়গায়ই শহর আর গ্রামের মিল অর্থাৎ কল্যাণকর্ম দুই জায়গাতেই এক। ক্ষুধার্তের মুখে অন্ন তুলে দেবার শিক্ষা দুই জায়গায়ই পাওয়া চাই। কিন্তু শিক্ষা যদি এমন হয় যে, গ্রামের লোকেরা শ্রমের কদর করে আর শহরবাসীরা শ্রম করার কথা চিন্তাই করে না, তাহলে বুঝতে হবে দুইজন দুইদিকে যাচ্ছে।

প্রশ্ন—আপনি গ্রামবাসীদের চরখা চালাতে বলেন, কিন্তু শহরবাসীরা তো এর কোন উপকারিতাই অনুধাবন করতে পারে না।

বিনোবা—তাহলে শহরবাসীদের সে অনুরোধ করব কেন ?

গ্রামের লোকদের কাপড় পরতে হবে, তাই তাদের বলি—সূতা কাটো।

প্রশ্ন—কাপড় তো আমাদেরও পড়তে হয় ?

বিনোবা—তাহলে আপনাদেরও সূতা কাটতে হবে।

নানা পদ্ধতি

প্রশ্ন—শিশুশিক্ষার প্রচলিত পদ্ধতিগুলির মধ্যে আপনার কোন্‌টা ঠিক বলে মনে হয় ?

বিনোবা—আপনারা কোন্-কোন্ পদ্ধতির কথা জানেন ?

প্রশ্ন—সেবাগ্রামে নঈ-তালীম পদ্ধতি চলছে, বোম্বাই-এ মণ্টেসরী আর কোথাও-কোথাও কিণ্ডারগার্টেনও চলছে।

বিনোবা—এ সকলের পার্থক্য বুঝিয়ে দিন।

প্রশ্ন—আপনি তো সবই জানেন।

বিনোবা—আমি তো জানি সেবাগ্রাম-পদ্ধতি, পওনার-পদ্ধতি, ওয়ার্ধা-পদ্ধতি, নাগপুর-পদ্ধতি ইত্যাদি।

প্রশ্ন—আমাদের পদ্ধতিতে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা বারণ। আর আপনি তো প্রার্থনার সময় ছেলেদের প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে ওদের খুব সহজেই শিক্ষা দিলেন।

বিনোবা—তাহলে আপনাদের আরেকটি পদ্ধতি জানা হল—প্রশ্ন জিজ্ঞাসা দ্বারা শিক্ষা দেওয়া। আপনারা দেখলেন যে, প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেও শেখানো যায়, তাতেও বেশ ভাল শিক্ষা হয়।

প্রশ্ন—কিণ্ডারগার্টেন শিক্ষাপদ্ধতিতে শিশুদের মধ্যে আকর্ষণ উৎপন্ন করার জন্যে নানা পন্থা অবলম্বন করা হয়।

বিনোবা—আপনারা আকর্ষণ উৎপন্ন করান না?

কৃত্রিমতা ও শাস্ত্রীয়তা

প্রশ্ন—কিন্তু সেখানে কৃত্রিম আকর্ষণ প্রস্তুত করা হয়।

বিনোবা—এতক্ষণে 'কৃত্রিম' কথাটি এসেছে! আচ্ছা বলুন তো, আপনারা কি ছেলেদের মিঠাই খেতে দেন?

প্রশ্ন—হাঁ, দিই বৈকি। তবে তা শিক্ষার জন্যে দিই না।

বিনোবা—কেন নয়? যা প্রত্যক্ষ তা দিয়েই তো শিক্ষা দিতে হবে।

প্রশ্ন—যা বলতে চাইছি তার অর্থ হচ্ছে, আমরা ছেলেদের লোভ দেখাই না।

বিনোবা—এখানে প্রশ্ন হচ্ছে কি করে বুদ্ধির বিকাশ হবে। শিক্ষাপদ্ধতিগুলির মধ্যে সাধারণত কোন মৌলিক পার্থক্য থাকে না। পরিস্থিতির তারতম্য অনুসারে বস্তু-দর্শনের তারতম্য হয়ে পড়ে। লোভ বাড়ানোর জন্যে যে-কোনরকমের পরিবেশ সৃষ্টি করার বা কোন জিনিস দেওয়ার কথা ওঁরাও স্বীকার করবেন না।

প্রশ্ন—আমাদের বিদ্যালয়ে কিম্বা সেবাগ্রামে দেখা যায়—শিক্ষা স্বাধীনভাবে বিকশিত হয়ে ওঠে। কিন্তু কিণ্ডারগার্টেনে সেই স্বাধীনতা নেই বলে মনে হয়।

বিনোবা—কিন্তু আপনারা কিণ্ডারগার্টেন-পন্থীদের যদি একথা বলেন, তাহলে দেখবেন তাঁরা একথা মানেন না।

প্রশ্ন—আমাদের ওখানে ইন্দ্রিয়-বিকাশের (sense development) জন্যে যে-উপায় অবলম্বন করা হয়, সেবাগ্রামের পদ্ধতি তা

থেকে কিছু ভিন্ন। আমাদের কার্যক্রম অধিকতর বৈজ্ঞানিক মনে হয়। উপকরণ যত ব্যবস্থিত হবে, বিকাশও তত যথার্থ হবে। কিন্তু এইসব বিজ্ঞানসম্মত উপকরণ বিদেশী বলে নিষিদ্ধ হয়েছে।

বিনোবা—তবে কি শিশুদের শিক্ষার জন্যে বিদেশী উপকরণের প্রয়োজন হয়?

প্রশ্ন—উপকরণ বিদেশী নয়, পরিকল্পনা বিদেশী।

বিনোবা—পরিকল্পনাও কি কখন স্বদেশী-বিদেশী হয়? আমাদের বুঝতে হবে যে, স্থান-কাল-পাত্র অনুসারে যদি কোন উপকরণ সহজ লভ্য হয়, তাহলে বিজ্ঞানের দোহাই দিয়ে অপরিচিত ও কৃত্রিম উপকরণ সংগ্রহ করার জন্যে ব্যস্ত হওয়া উচিত নয়। যে-গ্রামে নদী আছে, সেখানে সাঁতার শিখিয়ে ছেলেদের বিকাশ সাধন করা হবে না কেন? ইন্দ্রিয়-বিকাশের জন্যে কি গ্রামের স্বাভাবিক পরিবেশ অনুকূল নয়? গোবর কুড়ানো, কুল কুড়ানো প্রভৃতি উপায় কি গ্রহণ-যোগ্য নয়? এইসব কাজের মাধ্যমে কি শিক্ষা দেওয়া যায় না?

প্রশ্ন—এসবে আমাদের বিরোধ নেই। তবে কোন-কোন উপায় আমাদের বেশী পছন্দ হয়। তাতে জোর দিলে ছেলেরা বড় হয়ে আরো ভাল কাজ করতে পারবে।

বিনোবা—আমি আপনাদের একটি প্রশ্ন করছি। উপকরণ বা উপায়হীন কোন গ্রামে যদি আপনাদের পাঠানো হয়, তবে আপনারা কি সেখানে কাজ করতে পারবেন না?

এক ভগ্নী—হ্যাঁ, পারব।

বিনোবা—তাহলে আমার কিছু বলার নেই। সবরকম জ্ঞান

একদিনেই দেওয়ার কোন প্রয়োজন নেই। যে-শিক্ষা আমরা দিতে চাই তা ছেলেদের প্রয়োজন আছে বলেই দেওয়া, আমরা চাই বলে নয়। চোখের জন্যে ছেলেদের আলোর দরকার, জিভের জন্যে স্বাদের আর কানের জন্যে স্বরের। এইরকম প্রয়োজন অনুযায়ী উপযুক্ত জ্ঞান দেওয়া যেতে পারে।

প্রশ্ন—কিন্তু সূক্ষ্ম জ্ঞানের জন্যে বিজ্ঞানসম্মত উপকরণের দরকার আছে।

বিনোবা—তা ঠিক। তবে বিজ্ঞানসম্মত উপকরণের নামে কৃত্রিমতা এসে না পড়ে সেদিকে দৃষ্টি রাখতে হবে। হার্মোনিয়মের সাহায্যে স্বরের সূক্ষ্ম জ্ঞান হয়—এই দাবী কেউ করতে পারে না। তবু হার্মোনিয়ম চলছে। চিনি ছাড়া দুধ খাওয়ার অভ্যাস যার নেই, সে দুধের সত্যিকারের স্বাদ কি করে জানবে? তাই কোন বস্তুর স্বাদ কি তা জানতে হলে, অন্য কোন কিছুর সঙ্গে না মিশিয়ে তা খেতে হবে। এভাবে আপনারা যদি চিন্তা করেন, তবে সমস্ত প্রশ্নের সমাধান হয়ে যাবে।

অভিরুচির পরিশুদ্ধিকরণ

ইন্দ্রিয়-বিকাশ তো পশুদেরও হয়। তারা কি কিছু মণ্টেসরীতে শেখে? বাঘের ঘ্রানেন্দ্রিয় অন্যান্য জন্তুদের চাইতে অনেক বেশী তীক্ষ্ণ। বাধা যেখানে যত বেশী ইন্দ্রিয়-বিকাশও সেখানে তত অধিক হয়। তাই ইন্দ্রিয়-বিকাশ শিক্ষার মুখ্য উদ্দেশ্য নয়, প্রকৃতিই এই বিকাশ সাধন করে। শিক্ষার বাহ্য উপকরণ মুখ্য নয়, মুখ্য হচ্ছে ইন্দ্রিয়গুলিকে শান্ত ও সংযত করা এবং অভিরুচি পরিশুদ্ধ

করা। কৃত্রিমতায় ইন্দ্রিয়শুদ্ধি হয় না, ইন্দ্রিয়গুলি বিগড়ে যায়। শহর ও গ্রাম উভয় স্থানেই ইন্দ্রিয়বিকৃতি ঘটছে। খাদ্যে অতিরিক্ত মসলা ব্যবহার দুই জায়গায়ই চলছে। এইরকম বহু দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে।

প্রশ্ন—মসলা তো প্রকৃতিরই অবদান।

বিনোবা—গোবরও প্রকৃতির অবদান, কিন্তু তা কেউ খায় না। তেমনি শিশু স্বেচ্ছায় লঙ্কা খায় না, কিন্তু মিষ্টি খেতে ভালবাসে। ইন্দ্রিয়শক্তির বিকাশসাধন আর যোগ্য হওয়া একই কথা।

নঈ-তালীম ও স্বাবলম্বন

বেড়ছী থেকে শ্রীনারায়ণ দেশাই লিখেছেন :—

"পওনারে আপনার সঙ্গে স্বাবলম্বন সম্বন্ধে অনেক কথা হয়েছে। স্বাবলম্বন, উপায় ও উপকরণের উন্নতি, সমবায় তথা নঈ-তালীমের জীবনাদর্শ প্রভৃতি সম্বন্ধে সবসময়ই চিন্তা চলছে। বেড়ছীতে আপনার সঙ্গেও কিছু আলোচনা হয়েছিল।

"বাপুর বিচারধারা থেকে মনে হয় যে, ছাত্রদের উপার্জনেই তাদের শিক্ষার ব্যয় নির্বাহ হওয়া উচিত। বর্তমান অর্থনীতি শরীরশ্রমের খুব কম মূল্য দেয় এবং আবশ্যকীয় সামগ্রী অপেক্ষা বিলাসোপকরণে বেশী খরচ করে। অন্যদিকে সর্বসাধারণের অর্থনৈতিক দুরবস্থার কথা বিবেচনা করে স্পষ্ট দেখছি যে, যদি

নিজ-নিজ শ্রমদ্বারা ছাত্রেরা শিক্ষার ব্যয় নির্বাহ করতে পারে, তাহলেই তারা জীবনসংগ্রামে টিকে থাকতে পারবে, নইলে নয়।

"নানাদিক থেকে হিসাব করলে দেখা যায় প্রতি ৩০জন ছাত্রের জন্যে একজন শিক্ষক দরকার; সাধারণ শিক্ষকের বেতন এরথেকে নির্ধারিত হবে। প্রত্যেক শিক্ষার্থী তিন ঘণ্টা শ্রম করে উপার্জন করতে পারে। 'জাকির হোসেন সমিতি' দৈনিক শ্রমের জন্যে ৩ ঘণ্টা ২০ মিনিট ধার্য করেছে। আমার মনে হয় ছোটদের পক্ষে এ কিছু বেশী। তাই বড়রা কিছু বেশী আর ছোটরা কিছু কম সময় খাটবে—এভাবে গড়ে প্রত্যেকের দৈনিক তিন ঘণ্টা করে শ্রমের জন্যে রাখা হয়েছে। সমস্ত বিদ্যালয়ে গড়ে যতদিন ছেলেরা উপস্থিত থাকে (বছরে ২৪০ দিন কাজ হয়, তার মধ্যে শতকরা ৭৫ দিন সকলে উপস্থিত হলে কাজের জন্যে বছরে ১৮০ দিন পাওয়া যায়), সে-হিসাবে ছাত্রদের আয় ধার্য করলে বস্ত্র-বিদ্যাদ্বারা পূর্ণভাবে স্বাবলম্বী হওয়ার পথে নিম্নলিখিত অন্তরায়গুলি উপস্থিত হয়:—

(১) তুলা তুনাই করে পাঁজ করতে হলে অনেক সময় লেগে যায়।

(২) সূতা দোহারা করতে অনেক সময় লেগে যায়। সূতা কাটার সঙ্গে-সঙ্গে দোহারা করার প্রক্রিয়া বেশ নটখটে রয়েছে, এতে ছোটদের পক্ষে সঙ্গে-সঙ্গে দোহারা করতে অসুবিধা হয়। তাই তাদের সূতা কাটবার পর দোহারা করে নিতে হয়।

(৩) 'জাকির হোসেন সমিতি'র মত হচ্ছে যে, উৎপাদিত খাদি সরকার কিনে নেবে। আমাদের এখানে খুব ভাল খাদি

হয়, কিন্তু নানারকমের হয় না। এইজন্যে সরকার ছাড়া অন্য কোথাও বিক্রী করা সহজ নয়।

"আমরা ছেলেদের খাদি দিয়ে দিই। সুতরাং আমাদের পক্ষে নিম্নলিখিত দুইটি প্রশ্ন গুরুত্বপূর্ণ :—

(১) ধুনকীর (তুলা ধুনবার বড় ধনুক) ব্যবহার উচিত কি-না ?

(২) অনেক রীলযুক্ত দোহারা করার যন্ত্র কি ব্যবহার করব ?

"ক্ষেতের কাজে এবং অন্যান্য কাজে ভাল মজুরী পাওয়া যায়, কিন্তু সমস্ত শিক্ষার্থীর জন্যে ঐ জাতীয় কাজ গ্রামে সারা-বছর পাওয়া যায় না।"

[পত্রের উত্তর]

তোমার চিঠি পেয়েছি। শেষ প্রশ্ন দুইটির উত্তর প্রথমে দিচ্ছি। অনেক রীলের যে-যন্ত্রের কথা লিখেছ, তা ব্যবহার করতে পার। কিন্তু ছোট ধনুক দিয়ে ধুনানীর কাজ না-করে বড় ধনুক দিয়ে কাজ করা উচিত হবে না।

টাকা-পয়সা দিয়ে কাজের বিচার করা ঠিক নয়। এবারকার 'সর্বোদয়' পত্রিকায় (সেপ্টেম্বর ১৯৫০) পয়সার বদমাশির এক দৃষ্টান্ত দিয়েছি। প্রবন্ধের নাম 'সর্বোদয় দৃষ্টি'। নঈ-তালীম বিদ্যালয়ে শিক্ষক ও ছাত্রদের প্রয়োজনীয় বস্ত্রের জন্যে সমস্ত সূতা কেটে নেওয়া চাই। জমি থেকে অন্ন উৎপাদন হবে। কুয়া থেকে জল পাওয়া যাবে। কুয়া থেকে কাপড়, কাতাই থেকে অন্ন আর ক্ষেত থেকে জল পাওয়ার আশা করা ঠিক নয়। আমি তো

নঈ-তালীমের শিক্ষকদের সব ব্যাপারে স্বাধীন করে দিয়েছি। নির্দিষ্ট কোন পাঠ্যক্রমের বন্ধন স্বীকার করার দরকার নেই।

ভগবান কাজের জন্যে বছরে ৩৬৫ দিন দিয়েছেন। যতদিন খাওয়ার জন্যে ততদিন কাজের জন্যে—এরকম ভাবাও ভুল হবে। কেননা কখনও-কখনও খাওয়া বাদ দেওয়া যেতে পারে, কিন্তু শরীরধারীদের পক্ষে কর্মযোগ ছাড়ার কোন কথাই উঠতে পারে না। কাজ করতে-করতে ১০০-বছর বাঁচতে হবে। কর্ম থেকে ব্যায়াম, কর্ম থেকে জ্ঞান, কর্ম থেকে আনন্দ, কর্মই সব, কর্মই খেলা। একেই সমবায় বলা হয়।

স্কুল দিনে, রাতে, উষায়, সন্ধ্যায় সবসময় চলবে। তখন স্বাবলম্বনযুক্ত শিক্ষার প্রক্রিয়া কি রকম তা অনুভূতিতে আসবে। ছাত্রেরা আমার কাছে এভাবেই শেখে। আমার নিজের শিক্ষাও গত ৩৪-বছর ধরে এভাবেই চলেছে। একদিনও কর্মহীন অবস্থায় কাটে না। আর প্রত্যহ জ্ঞানের নতুন-নতুন শাখা প্রকাশিত হয়েই চলেছে।

নঈ-তালীমের ফুসফুস

(এক পত্র থেকে)

শিক্ষক হবেন ছাত্রানুরাগী, ছাত্র শিক্ষকানুরাগী, উভয়ে জ্ঞানানুরাগী ও জ্ঞান সেবাপরায়ণ— এই আমাদের বিদ্যালয়ের

পরিকল্পনা। আমরা যেন নতুন সমাজ রচনা করার উপযুক্ত শিক্ষা দিই। প্রচলিত শিক্ষা দেবার জন্যে অন্য বহু বিদ্যালয় রয়েছে। নিজেদের সন্তান এবং আত্মীয় প্রতিবেশীদের সন্তানেরা আমাদের ক্ষেত্র। সন্তানদের সম্বন্ধে নিজেদের তো স্বাবলম্বী হতেই হয়। আমার কাছে স্বাবলম্বনের সমস্যা কখনও কঠিন হয়ে দেখা দেয়নি। সমান মূল্যই সর্বোদয়-সমাজের ভিত্তি।

পাশ্চাত্য শিক্ষায় পুরুষার্থহীনতা-দোষ নেই। কিন্তু ওতেই নঈ-তালীম হয়ে যায় না। লুণ্ঠনকারীকেও তো উদ্যোগশীলই হতে হয়। সাম্যযোগ ও স্বাবলম্বন, এই দুই গুণ যদি লাভ না হয়, তাহলে আমাদের শিক্ষার দুইটি ফুসফুসই নষ্ট হয়ে গেছে বলে বুঝতে হবে।

পাঠশালার খাদি

জাজুজীর আশঙ্কা

জাজুজী লিখেছেন— "৩০-১-৪৯ থেকে ১১-২-৪৯ পর্যন্ত সেবাগ্রামে ছেলেরা প্রত্যহ সমস্তদিনব্যাপী সূতাকাটা ও বুনাই-এর কাজ করেছে। তার ফলে ২৪১০ ঘণ্টায় ৮০ বর্গগজ কাপড় তৈরী হয়েছে। এর দাম টা. ১৪১৮৵৹। এর থেকে তুলা প্রভৃতির দাম টা. ৪৩৸৹ বাদ দিলে শ্রমের দরুন আয় দাঁড়ায় ৯৮ টাকা। এতে দেখা যাচ্ছে যে, ঘণ্টায় মাত্র ৮ পাই আয় হয়। কাজের ঘাটতি

বাদ দিলে ১ ঘণ্টার আয় দাঁড়ায় ৬ পাইয়ে। যদি কোন বিদ্যালয়ে একশ' ছাত্র দিন ২ ঘণ্টা করে সূতাকাটা ও বুনাই-এর কাজ করে, তাহলে একদিনে টা. ৬।০ আয় হয়। মাসে ২৪ দিন কাজ করলে মাসিক আয় ১৫০ টাকা হতে পারে। তা দিয়ে উপর ক্লাসের তিনজন শিক্ষকের বেতন চলতে পারে।

"উপরোক্ত হিসাবে চরখা-সংঘ সূতাকাটা ও বুনাই-এর দর ঠিক করে দিয়েছে। খাদির দৃষ্টিতে হিসাব ঠিকই হয়েছে। তবে সাধারণত বাজারে যে-কাপড় পাওয়া যায় তার দরের সঙ্গে উপরে লিখিত কাপড়ের দর মিলবেনা। উপরে ৮০ বর্গগজ খাদির মূল্য টা. ১৪১৸০ ধরা হয়েছে। কিন্তু ঐপরিমাণ মিলের কাপড়ের দাম ৪০-৫০ টাকা হবে। তূলা প্রভৃতির দাম টা. ৪৩৸০ বাদ দিলে আয় খুব সামান্যই হবে। ঘাটতি হওয়াও অসম্ভব নয়। আমাদের চিন্তা করে দেখতে হবে যে, যে-প্রচলিত আর্থিক অবস্থায় অধ্যাপকদের বেতন নগদ দিতে হয়, সেখানে খাদির বিশেষ দর অনুসারে এই হিসাব করা হয়েছে। যদি তৈরী কাপড় শুধু শিক্ষক ও ছাত্রদের কাপড়ের সমস্যা মেটায়, তাহলে পাঠশালার চালু ব্যয় বহনে সহায়তা কি করে পাওয়া যাবে ?

"এখন পর্যন্ত বুনিয়াদী শিক্ষাদানের উপযুক্ত পাঠশালার সংখ্যা নগণ্য। এইসব বিদ্যালয়ে প্রস্তুত খাদি বিক্রী হতে আজকাল তো কোন অসুবিধা নেই। বুনিয়াদী-শিক্ষা আরও ব্যাপক হলে লক্ষ-লক্ষ বিদ্যালয়ে এই শিক্ষা প্রচলিত হবে। এইসব বিদ্যালয়ে যে বিপুল পরিমাণ খাদি উৎপন্ন হবে, সে সকল কি করে বিক্রয় হবে ?

যদি দেশের বর্তমান অর্থ নৈতিক ব্যবস্থা পরিবর্তিত হয়ে বিকেন্দ্রিত গ্রামোদ্যোগমূলক অর্থনীতি প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহলে অসুবিধা হবে না। কিন্তু যদি না হয় তখন কি হবে?

"বুনিয়াদী বিদ্যালয়সমূহে প্রস্তুত খাদি গভর্ণমেণ্টের শিক্ষাবিভাগ যদি কিনে নেয়, তাহলে গভর্ণমেণ্ট কাপড়ে যে-টাকা খরচ করে, সেই টাকার অঙ্ক বেড়ে যাবে। গভর্ণমেণ্ট যদি বাজার দরে এসব খাদি বিক্রয় করে ফেলে তাহলে গভর্ণমেণ্টের ক্ষতি হবে। একদিকে বিদ্যালয়গুলিতে আয় দেখানো হবে, আর অন্যদিকে গভর্ণমেণ্টের তরফে ততটা বেশী ব্যয় দেখানো হবে।

"এইজন্যে আমার মতে সূতাকাটা ও বুনাই মূল হস্তশিল্পরূপে গ্রহণ করলে টাকার হিসাবে আয় না ধরে, কত গজ সূতা তৈরী হল আর কত খাদি প্রস্তুত হল সেই অনুসারে আয় ধরে সন্তুষ্ট থাকতে হবে।"

যত্নের সঙ্গে কাজ করলে অবস্থা বদলে যায়

শ্রীজাজুর দীর্ঘ প্রবন্ধের সারাংশ উপরে লিখিত হল। তাঁর যুক্তি খুব প্রাঞ্জল এবং সেইদিক থেকেই এই প্রবন্ধের মূল্য নিরূপণ করতে হবে। তবে তিনি কোন নতুন কথা বলেন নি। খাদির বিশেষ একটা মূল্য আছে এবং তার উপরই সূতাকাটা ও বুনাই-এর দ্বারা বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের খরচ নির্বাহের পরিকল্পনা রচিত হয়েছে। খাদির এই মুল্যমান অনেকটা অবাস্তব হওয়াতে ব্যয়নির্বাহের পরিকল্পনাও বাস্তবতাবর্জিত হয়ে পড়েছে। এই জাতীয় বিরুদ্ধ সমালোচনা ১২-বছর আগে নঈ-তালীম পরিকল্পনার সূচনাতে

অধ্যাপক কে. টি. শাহ উপস্থিত করেছিলেন। সে-সময়ে এই সমালোচনার উত্তরও দেওয়া হয়েছিল। এই প্রসঙ্গে দেখা যাচ্ছে যে, পুরুষার্থ প্রয়োগের উপরই বাস্তব-অবাস্তবের পার্থক্য নির্ভর করছে। অর্থাৎ আজ যা কাল্পনিক মনে হচ্ছে, কাল তা পুরুষার্থের দ্বারা বাস্তবে রূপান্তরিত হতে পারে। এইপ্রকার পুরুষার্থ অর্থাৎ কর্ম-প্রচেষ্টা চরখা-সংঘ করেছেন এবং এদ্বারাই খাদির চাহিদা হয়েছে। আজ খাদির বাজার সীমাবদ্ধ কারণ আমাদের প্রচেষ্টাও সীমাবদ্ধ। একে ব্যাপক করে দেওয়ার কাজ নঈ-তালীমের মাধ্যমে হবে।

চেতনার বিষয়

নঈ-তালীম হচ্ছে কীলক (গোঁজ) আর অহিংসা বা স্বরাজ্যক্ষমতা হচ্ছে হাতুড়ী। এই দুই-এর যোগে প্রচলিত অনিষ্টকর অর্থ নৈতিক অব্যবস্থা বিদীর্ণ হবে ও উপযুক্ত অর্থ নৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হবে। লক্ষ-লক্ষ বিদ্যালয়ে উৎপাদিত খাদি নিয়ে কি করা যাবে, সে কথা চিন্তা করার কোন প্রয়োজন নেই। কেননা তখন তো সমাজ পরিবর্তন সম্পূর্ণ হয়ে যাবে। এইরকম পরিবর্তনই তো আমাদের লক্ষ্য। এইকারণে এ চিন্তার বিষয় নয়, বরং এদ্বারা পরিবর্তনের স্পষ্ট ধারণা করা সহজ হবে।

অপ্রতিষ্ঠিত (ভিত্তিহীন) টাকার দরুন ভ্রান্তি

চরখা-সংঘ খাদির যে-দর বেঁধে দিয়েছেন, সেই দর অনুসারে আমরা বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের উৎপাদনের আয়-ব্যয়ের হিসাব প্রস্তুত করেছি। একথা কারো অজানা নেই এবং এতে ভুল বোঝার কোন কারণ নেই। এই উৎপাদনের মূল্য টাকাদ্বারা নিরূপণ করা অর্থহীন।

এর কারণ এ নয় যে, খাদির দরের কোন বাস্তব ভিত্তি নেই। এর কারণ হচ্ছে এই যে, টাকার কোন ভিত্তি নেই। টাকার ভিত্তিহীনতা এতভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, তার বিশদ ব্যাখ্যার দরকার দেখছি নে। বিভ্রান্ত পৃথিবীর প্রয়োজনের জন্যে ভ্রান্তিকেই অবলম্বন করা হয়েছে। স্বপ্নে রোগ হলে স্বপ্নেই তার চিকিৎসা হয়। জেগে উঠবার পর রোগও থাকে না, ওষুধও থাকে না।

সত্য দর্শন হোক

যদি বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে উৎপাদিত বস্তু গভর্ণমেণ্ট বিক্রয় করেন বা অন্যকাজে লাগান, তাহলে শিক্ষা-বিভাগের আয় হয়েছে মনে করা হবে আর সঙ্গে-সঙ্গে অন্য বিভাগের ব্যয়ে হয়েছে বলে দেখা যাবে। আমার মতে এরকমই হওয়া উচিত। যদি শিক্ষা-বিভাগ রোজগার করে থাকে, তাহলে শিক্ষা-বিভাগের আয় নিশ্চয়ই দেখাতে হবে। আর অন্য বিভাগগুলি যারা জনসাধারণের উপর ভারস্বরূপ হয়ে আছে তাদেরও প্রকৃত রূপ স্পষ্ট হওয়া উচিত। যার যা দায়িত্ব, তার তো তা পালন করতেই হবে। তাহলেই সত্য রক্ষিত হবে।

—('সর্বোদয়' অক্টোবর ১৯৪৯)

ধর্মশিক্ষার ব্যাখ্যা

একটি প্রশ্ন

আপ্তে গুরুজী লিখছেন: ছোট ছেলেদের বিদ্যালয়ে কী ভাবে ধর্মশিক্ষা দিতে হবে। এই প্রশ্ন অনেকবার করা হয়েছে।

বহুলোকের এই সম্বন্ধে সঠিক ধারণা নেই। সন্তবাণী কণ্ঠস্থ করানো সম্বন্ধে অবশ্য সকলে একমত, কিন্তু প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ধর্মশিক্ষা কি রকম হবে তা স্পষ্ট হওয়া দরকার। এ সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত-ভাবে (সূত্ররূপ) বর্ণনা করলেও চলবে।

ধর্মশিক্ষার যথার্থ আয়োজন

ধর্মশিক্ষার বিষয়টি যে খুবই চিত্তাকর্ষক সে-সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু আজকাল ধর্মশব্দ বড়ই সংকীর্ণ ও ভেদভাবদ্যোতক হয়ে পড়েছে। এইকারণে চিন্তাশীল লোকদের মতে বিদ্যালয়ে ধর্মশিক্ষা দেওয়া ঠিক নয়। আমার মতে প্রকৃত ধর্মশিক্ষা শাস্ত্রের বিষয়ই নয়। চরিত্রগঠন, ঈশ্বরে ভক্তি এবং দেহ ও আত্মার পার্থক্যবোধ ধর্মের সার, আর এই সারধর্ম সাধুপুরুষদের সঙ্গ করলে লাভ হয়। এইজন্যে ধর্মশিক্ষার আয়োজন করতে হলে চরিত্রনিষ্ঠ ও শীলসম্পন্ন শিক্ষকের প্রয়োজন।

‘সন্ত-বাঙ্‌ময়’ কথার অর্থ

সাধুদের বাণী কণ্ঠস্থ করালে খুব উপকার হয়। কিন্তু একে আমি ধর্মশিক্ষা বলব না। এ তো বিশুদ্ধ বাণী আহরণের শিক্ষা। এসব বাণী থেকে শ্রেষ্ঠ বাণীসমূহ বেছে নেওয়ার জন্যে গভীর অন্তর্দৃষ্টি প্রয়োজন। এর আগে ‘প্রার্থনা সম্বন্ধীয় বিবেক’ বিষয়ে যা বলেছি, সেসব যুক্তিও এখানে প্রযোজ্য।

সর্ব ধর্মে সমভাব

সর্বধর্মসমন্বয়ের দৃষ্টি থেকে প্রত্যেক ধর্মের সাধুসন্তদের জীবনী, তাঁদের পালনীয় চিত্তশুদ্ধিকারক ব্রত-উৎসবাদি সম্বন্ধে তথ্যসমূহ

জ্ঞাপন করা যেতে পারে। কিন্তু এসবকেও আমি ধর্মশিক্ষা আখ্যা দেব না। একে ইতিহাস ও সমাজ সম্বন্ধে অধ্যয়ন বলা যায়।

অভিজ্ঞতামূলক শিক্ষা

চিত্তশুদ্ধির বিন্দুমাত্র ভাবনা না-করে কিছু শাস্ত্রীয় আচার ও ক্রিয়া-কলাপের দ্বারা সরাসরি পুণ্যলাভের যে-ধারণা সমস্ত প্রচলিত ধর্মে বদ্ধমূল হয়ে আছে, সে-সকল ভ্রান্তসংস্কার দূর করা নিতান্ত দরকার। প্রতিটি কথা অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধির কষ্টিপাথরে যাচাই করার অভ্যাস শিশুকাল থেকেই মজ্জাগত করে দিতে হবে। যদি তা সফল করে তোলা যায়, তাহলে বলব ধর্মশিক্ষা সার্থক হয়েছে।

—('মারাঠী হরিজন', ৯ই মার্চ ১৯৪৭)

মূলশক্তি

বাপু সমগ্র গঠনমূলক কার্যের মধ্যে চরখাকে সূর্য ও অন্যান্য কার্যকে গ্রহসমূহের সঙ্গে তুলনা করেছেন। এই রূপকে নঈ-তালীমের স্থান কোথায়, একথা ভাবতাম। নঈ-তালীমকে একটি গ্রহমাত্র মনে করা আমার সঙ্গত বলে মনে হয়নি। যে-শক্তির দ্বারা সূর্য ও গ্রহসমূহ পরস্পরের সঙ্গে আবদ্ধ হয়ে ঘূর্ণায়মান হয়ে রয়েছে, এই রূপকের মধ্যে নঈ-তালীমকে সেই মাধ্যাকর্ষণ-শক্তির সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। নঈ-তালীম আমাদের সমস্ত গঠনমূলক কার্যগুলির মধ্যে পারস্পরিক যোগসূত্র স্থাপনকারী হিসাবে মাধ্যাকর্ষণ-শক্তির সঙ্গে তুলনীয়। পৌরাণিক উপমা দিতে গিয়ে আমি একে

শেষনাগ বলেছিলাম। এই শেষনাগকে সমস্ত পৃথিবী ও সৃষ্টির আধাররূপে গণ্য করা হয়। সৃষ্টির আধারকে বুঝাবার জন্যে কোথা থেকে শব্দ আনা যাবে? কারণ শব্দও তো সৃষ্টিরই অন্তর্গত। এই-জন্যেই বলা হয়েছে, সৃষ্টির শেষের আধার। অর্থাৎ 'যা কিছু অবশিষ্ট রইল' তার আধার সৃষ্টির। শেষের অর্থ হচ্ছে অবশিষ্ট বস্তু, যা বাঁচল। এই শেষের বা অবশিষ্ট বস্তুর সহস্র মুখ কল্পনা করা হয়েছে, কারণ এই (শব্দ) শক্তি জগতের সমস্তকিছুকে আকৃষ্ট করে এবং সহস্র-সহস্র দিকে কাজ করে। তাই আমাদের সকল গঠনমূলক কাজের মধ্যে নঈ-তালীম শেষনাগ। আমাদের কর্মীরা স্বীয়-স্বীয় কার্যে দক্ষতা লাভ করার সঙ্গে-সঙ্গে যদি নঈ-তালীমের দৃষ্টিভঙ্গী আয়ত্ত্ব করেন, তবে সর্বত্র নিপুণ সেবক হতে পারবেন এবং আদৃত হবেন।

কীলক (গোঁজ)

নঈ-তালীম কীলকের সঙ্গে তুলনীয়। কিন্তু এ এমন কীলক যা সকল স্থানে ব্যবহৃত হতে পারে। এর সাহায্যে আমাদের কাজ সব জায়গায় বিস্তৃত হতে পারবে। নঈ-তালীমরূপ কীলক দ্বারা আমরা সহজেই অন্য কার্যরূপ কাষ্ঠে প্রবেশ করে তাকে আয়ত্ত্ব করতে পারব। যাঁরা আমাদের অন্যান্য কার্যক্রম গ্রহণ করতে রাজী নন, তাঁরাও নঈ-তালীমকে স্বীকার করেন। নঈ-তালীম সর্বজনগ্রাহ্য ও সহজবোধ্য বস্তু।

দুইটি সীমা

আমি একথা বলি না যে, সকলের শিক্ষক হওয়া উচিত বা সকলেই শিক্ষক হওয়ার যোগ্য। কারণ এরজন্যে এক বিশেষ

যোগ্যতার প্রয়োজন। কিন্তু এই যোগ্যতার পশ্চাতে যে-দৃষ্টিভঙ্গী রয়েছে, সে-সম্বন্ধে সকলেরই অবহিত হওয়া উচিত। সেই দৃষ্টিভঙ্গী হচ্ছে—আমাদের জীবনের সঙ্গে যে-জ্ঞান যুক্ত রয়েছে তাকে গ্রহণ করা আর যে-জ্ঞান আমাদের জীবনের সঙ্গে যুক্ত নয়, তাকে বর্জন করা। মাত্র এইটুকু বিধি-নিষেধের সীমা আমাদের জন্যে রয়েছে। কি ছাড়তে হবে আর কি রাখতে হবে, এই দুই সীমা যদি আমরা রক্ষা করতে পারি, তাহলে যে-উদ্যোগই আমরা করি না-কেন, তার দ্বারাই আমরা আমাদের জীবন ও কর্ম পরিপূর্ণ করতে পারব। অন্যথায় হয় আমরা জড়তা প্রাপ্ত হব, নয়তো এক জায়গায় অকর্মণ্য থেকে অন্য জায়গায় অতিরিক্ত চাঞ্চল্য প্রকাশ করব। কিন্তু আমাদের কর্তব্য অস্থির না-হওয়া বা জড়তাগ্রস্ত না-হওয়া। নির্দিষ্ট কোন লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার জন্যে আমাদের অবিচলিতভাবে প্রয়াস করে যেতে হবে। নঈ-তালীমেই এই প্রয়াস সম্ভব।

সমাধান, সামঞ্জস্য ও আনন্দ

নঈ-তালীমে একদিকে প্রত্যেকটি কাজ পরস্পরের সঙ্গে সম্বন্ধ-যুক্তভাবে করতে হবে এবং অন্যদিকে জীবনযাত্রার সঙ্গে সকল কাজকে মিলিয়ে নিতে হবে। তবেই জীবন আনন্দময়, সামঞ্জস্যপূর্ণ ও সার্থক হয়ে উঠবে। আমি প্রায়ই দেখি যে, কর্মীরা কিছুদিন কাজে লেগে থাকেন, তারপর সেইকাজে আর তাঁদের মন বসাতে পারেন না, অন্য সেবার ক্ষেত্র খুঁজে বেড়ান। এক ভাই কুড়ি বছর চরখাদ্বারা গঠন-মূলক কাজ চালাবার পর এখন গো-সেবার কাজ গ্রহণ করবেন বলে মনস্থ করেছিলেন। কারণ চরখার কাজে আর তিনি সার্থকতা খুঁজে

পাচ্ছেন না। তিনি আমার পরামর্শ গ্রহণ করেছেন। আমি তাঁকে বলেছি, 'এরকম ইচ্ছা ঠিক নয়। কারণ এক কাজে যে-অভিজ্ঞতা সঞ্চিত হয়েছে, সেই অভিজ্ঞতার জায়গায় অন্যকাজের অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে আরম্ভ করলে এবং এক কাজ আয়ত্ত্ব করবার জন্যে যে-দীর্ঘ তপস্যা করা হয়েছে, সেই তপস্যার জায়গায় অন্য তপস্যা আরম্ভ করলে জীবন ব্যর্থ হয়ে যায়।' কিন্তু নঈ-তালীমের অনুশীলনের দ্বারা কর্মীরা বুঝতে পারবেন যে, দীর্ঘকাল যে-কাজ করে আসছেন, সে-কাজ ছেড়ে না-দিয়েই অন্যকাজ গ্রহণ করা যায়, তাতে ব্যর্থতার ভয় থাকে না। —('সেবক', জানুয়ারী ১৯৪৯)

চরখার অভ্যাস

আজকাল অনেকেই সূতাকাটার ব্যাপক প্রচলনের জাতীয় গুরুত্ব অনুভব করছেন এবং সেই কারণে বিদ্যালয়সমূহে চরখা-শিক্ষা প্রবর্তনের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করছেন। কিন্তু চরখা-শিক্ষা তো নিয়ম মাফিক হওয়া চাই। নির্দিষ্ট সময়ে যেমন-তেমন করে সূতাকাটাই যথেষ্ট নয়। যেকোন কাজে ফল নিতে হলে সে কাজ বিধিপূর্বক করা দরকার। চরখা অভ্যাসের জন্যে নিম্নলিখিত প্রণালী অবলম্বন করা ঠিক হবে।

১। তুলা থেকে বীচি ছাড়ানো, তুলা ধুনাই করা, পাঁজ তৈরী করা প্রভৃতি কাজ উত্তমরূপে ও দ্রুতগতিতে করতে শিখতে হবে।

২। খুব সরু সূতাকাটা, ডান ও বাম দুই হাতেই সূতাকাটা তন্তুগুলি সমান্তরাল হয় এমনভাবে ধুনাই করা, পাঁজ না বানিয়ে সূতাকাটা প্রভৃতি কলাতে পারদর্শী হতে হবে।

(৩) রেচা, ধুনকী, চরখা, টেকো প্রভৃতি ঠিক করার জন্যে ছুতোরের কাজ, কামারের কাজ প্রভৃতি যতটা জানা প্রয়োজন ততটা শিখতে হবে।

(৪) যন্ত্রশাস্ত্রের জ্ঞান—রেচা, ধুনকী আর চরখার কাজ কি করে হয় তা বোঝার মতো যন্ত্রশাস্ত্রের জ্ঞান থাকা দরকার। friction কাকে বলে, কি করে তা কমানো যায়, চক্র ও টেকোর সঙ্গে কি সম্বন্ধ এবং টেকো লাফায় কেন প্রভৃতি জানা দরকার।

(৫) চরখার অর্থনৈতিক জ্ঞান—গ্রাম-সংগঠন, সম্পত্তি-বিভাজন, বেকার-সমস্যা, বিদেশী বস্ত্র বর্জন, সারা দুনিয়ায় কার্পাস উৎপাদনে ভারতের অংশ, স্বাবলম্বন, স্বাধীনতা প্রভৃতি কি ভাবে সূতাকাটার দ্বারা নিয়মিত হয় সে সম্বন্ধে অনুসন্ধান।

(৬) সূতাকাটার ইতিহাস—সূতাকাটার উদ্ভব ও বিকাশ কি করে হল, ভারতবর্ষে এই শিল্প কেন লুপ্ত হল প্রভৃতির ইতিহাস।

(৭) সূতাকাটার নৈতিক দিক—হিন্দু, বৌদ্ধ, মুসলমান ও খৃষ্ট ধর্মের সূতাকাটা সম্বন্ধে ব্যখ্যা, স্বদেশী ধর্ম, অবিরোধময় জীবন, আড়ম্বরহীনতা, দরিদ্রদের সম্মান করা, শ্রমের মর্যাদা, অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ, নারীজাতির সম্মান প্রভৃতি।

উপরোক্ত কয়েকটি কথা সম্বন্ধে মনোযোগ দেওয়া দরকার। এইসব বিষয়ে পূর্ণ জ্ঞান হওয়া চাই। সূতাকাটার সঙ্গে একদিকে

কৃষির অন্যদিকে বস্ত্রশিল্পের সম্পর্ক আছে। এইজন্যে সূতাকাটা শিক্ষার মধ্যে কৃষি ও বুনাই-এর সাধারণ জ্ঞানও থাকবে।

('মধুকর' থেকে)

গ্রাম ও শহরের শিক্ষা

আজকাল শিক্ষাসম্বন্ধে নানা আলোচনা হচ্ছে, চিন্তাশীল লোকেরা নানা চিন্তা করছেন। কিন্তু শিক্ষাসমস্যা খুবই সহজ। এদেশে অধিকাংশ লোক গ্রামের অধিবাসী। সুতরাং জন-সাধারণের শিক্ষা গ্রামের উপযুক্ত হওয়া দরকার। এতে গ্রামের উন্নতি হবে। শহরবাসীদের মনোভাব গ্রামোন্মুখ যাতে হয় এবং গ্রাম ও শহরের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগ যাতে ভাল করে হতে পারে এমন ভাবে শহরবাসীদের শিক্ষা দিতে হবে। গ্রাম ও শহরের শিক্ষা বিভিন্ন প্রকারের ও পরস্পর বিরোধী হলে দেশ বিপদাপন্ন হবে।

দুই-এর মধ্যে সাম্য

শহরের জীবনই হোক আর গ্রামের জীবনই হোক, অনেক ব্যাপারেই এই দুই-এর মধ্যে মিল আছে। পঞ্চভূতের পরিণাম শহরবাসী ও গ্রামবাসীর মধ্যে একই ভাবে হয়, কোন পার্থক্য দেখা যায় না। উভয়েরই পরিষ্কার হাওয়ার সমভাবে প্রয়োজন, প্রকৃতির সঙ্গে যোগ উভয়ের পক্ষেই লাভদায়ক। যদিও প্রকৃতির সঙ্গে

সহযোগ স্থাপন করা শহরবাসীদের পক্ষে কিছুটা কঠিন, তবুও সেই ব্যবস্থা হওয়া বাঞ্ছনীয়। স্বাস্থ্যনীতির প্রয়োজন উভয়েরই আছে। হয়তো গ্রামবাসীদের জন্যে স্বাস্থ্যরক্ষার ব্যবস্থা একরকম হবে, শহরবাসীদের জন্যে আর একরকম। কিন্তু স্বাস্থ্য উভয়ের জন্যেই প্রয়োজন। পরস্পরের প্রতি সহানুভূতি, প্রেম, ত্যাগভাবনা প্রভৃতি নৈতিকবোধ উভয়েরই উন্নত জীবনের জন্যে প্রয়োজন রয়েছে। তফাত কোথায় হবে? উৎপাদন ক্ষেত্রে কিছুটা তফাত দেখা যাবে। গ্রামে মানুষের মৌলিক প্রয়োজনের বস্তু উৎপাদিত হবে, সেজন্যে গ্রামীন ছেলেদের শিক্ষা সোজাসুজি হবে। আর শহরে গৌণ বস্তু উৎপাদিত হবে, সেজন্যে সেখানকার শিক্ষা ঐসব গৌণ বস্তুর উপর প্রতিষ্ঠিত হবে বলে সেই শিক্ষায় কিছু গৌণতা আসবে। যে গৌণতা শহরের জীবনে আছে সেই গৌণতা শিক্ষায়ও আসবে। এইজন্যে যতদিন আমরা শহরগুলিকে গ্রামে রূপায়িত করতে না পারছি, ততদিন শিক্ষায় এই গৌণতা (অভাব) দূর করা যাবে না।

আমরা স্বীকার করছি যে, শহরের শিক্ষায় কিছুটা গৌণতা থেকে যাবে। যদি শহরের মুখ গ্রামের দিকে ফিরানো থাকে আর শহরে বিদেশের জ্ঞান যথেষ্ট পরিমান থাকে, তবেই এই অভাব কিছুটা পূর্ণ হতে পারে। শহরের লোকেরা বিদেশী ভাষা চর্চা করবেন—এই আশা তাঁদের কাছে করা হবে। বিদেশী ভাষা থেকে নব-নব জ্ঞান আহরণ করে নিজেদের ভাষাকে পুষ্ট করার দায়িত্ব শহরবাসীদের থাকবে। আর তাঁরা যদি গ্রামোন্মুখ হন, তাহলে গ্রামবাসীদের সেবা করা তাঁদের ধর্ম হবে। আমি এই সূত্র

বানিয়েছি—গ্রামবাসীরা হবেন প্রকৃতি আর পরমেশ্বরের সেবক এবং শহরের লোকেরা হবেন গ্রামের সেবক।

প্রত্যেক গ্রামে বিদ্যাপীঠ

আমার পরিকল্পনা অনুসারে গ্রামের শিক্ষা পরিপূর্ণ শিক্ষা হওয়া প্রয়োজন। ইউনিভার্সিটি বা বিদ্যাপীঠ প্রত্যেক গ্রামে প্রতিষ্ঠিত হবে। কেন না, যতই ছোট হোক না কেন গ্রামই সমগ্র জগতের প্রতিনিধি স্থানীয়। জগতের সমস্ত কিছু সেখানে মজুদ রয়েছে। এইজন্যে গ্রামে পূর্ণ শিক্ষা হওয়া চাই। প্রত্যেক গ্রামে প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ বিদ্যমান, এইজন্যে সর্বপ্রকারের প্রাকৃতিক বিজ্ঞান ওখানেই দেখা যেতে পারে। নানা প্রকারের পশু, পক্ষী, কীট-পতঙ্গ আদি বিবিধ প্রাণীর সঙ্গে গ্রামে প্রত্যক্ষ সংযোগ হতে পারে, এইজন্য প্রাণিবিদ্যা শিক্ষার যথেষ্ট সুবিধা ওখানে পাওয়া যাবে। গ্রামে কৃষি হবে, কাপড় বোনা হবে, রাস্তা তৈরী হবে, গ্রামোদ্যোগ প্রতিষ্ঠিত হবে। এই সকলের মারফত নানা জ্ঞান গ্রামেই প্রাপ্ত হওয়া যাবে এবং তা হওয়াও চাই। গ্রামীন জীবন বহু প্রাচীনকাল থেকে চলে এসেছে, এইজন্যে গ্রামই ইতিহাস ও সমাজ-বিজ্ঞান শিক্ষার প্রশস্ত ক্ষেত্র। শহর অপেক্ষা গ্রামে পারস্পরিক সম্পর্ক নিকটতর হয়। এইজন্যে ওখানে নৈতিকবোধ ও ধর্মবোধ বিকশিত হওয়ার বেশী সুযোগ রয়েছে। আত্মার ব্যাপকতা, পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিমূলক প্রবৃত্তি, সত্য-নিষ্ঠা প্রভৃতি নীতি-ধর্ম গ্রামেই খুব স্পষ্টভাবে দেখা যায়। সেখানে গ্রহনক্ষত্রাদি আকাশে উজ্জ্বল হয়ে দেখা দেয়, শহরে অতটা উজ্জ্বল

দেখায় না। এইজন্যে গ্রামে কাব্য ও সাহিত্যের যতটা বিকাশ হওয়া সম্ভব, শহরে ততটা নয়।

সজ্জনেরা গ্রামের প্রতি প্রীতি বাড়ান

আজকালকার শহরের পরিবেশে ব্যাস বাল্মীকিকে কল্পনা করা সম্ভব নয়, গ্রামীন পরিবেশে তাঁদের সম্বন্ধে ধারণা করা যেতে পারে। বীর ও ত্যাগী পুরুষদের জন্ম গ্রামেই সম্ভব; অরণ্যের হিংস্র শ্বাপদের সঙ্গে যাঁরা লড়াই করতে সক্ষম, সেইসব সাহসী পুরুষেরা তো নিকটবর্তী গ্রামেই আবির্ভূত হবেন। এইজন্যে বীর্যবান মানুষেরা দেশকে যে সহায়তা দেন, তা গ্রাম থেকেই প্রবাহিত হয়। এইকারণে রাজ্যের সৈন্যবল বরাবর গ্রাম থেকেই গঠিত হয়েছে। এতই যখন গ্রামে সম্ভব, তাহলে গ্রামীন শিক্ষার জন্যে যেসমস্ত সরঞ্জাম দরকার, সেসব গ্রামেই প্রস্তুত করে নেওয়া কেন সম্ভব হবে না? এর উত্তরে বলব যে, গ্রামের সামগ্রী থেকে কিছু সরঞ্জাম গ্রামেই প্রস্তুত করা যেতে পারে! তবে সরঞ্জামের বাহুল্য নিষ্প্রয়োজন। নিরীক্ষণ (observation) ও প্রয়োগই (application) মুখ্য হওয়া চাই। এইজন্যে কখনও কখনও গ্রামের ছেলেদের শহরের ইউনিভার্সিটিতে গিয়ে অনেক কিছু দেখবার সুযোগ গ্রহণ করতে হবে এবং শহরের ছেলেদেরও গ্রামে গিয়ে অনেক কিছু জানবার সুযোগ নিতে হবে। কিন্তু এ সকলের মধ্যে আমার মতে সজ্জনদের ও বিদ্বানদের স্বেচ্ছায় গ্রামে গিয়ে বসবাস করাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। সাধুপুরুষেরা যদি মানুষকে গ্রামনিষ্ঠ করে তুলতে পারেন, তাহলেই সবচেয়ে বড় কাজ হবে।

অন্যকিছুতেই তেমন হবে না। সজ্জন ও চিন্তাশীল ব্যক্তিরা গ্রামে-গ্রামে বাস করলেই তো গ্রামে-গ্রামে ইউনিভার্সিটি হওয়া সম্ভব হবে। এইভাবে প্রত্যেক গ্রামে একজন করে সজ্জন ও চিন্তাশীল লোক গিয়ে বাস করতে আরম্ভ করলে গ্রামের শিক্ষা সম্বন্ধে ব্যবস্থা করা মোটেই কঠিন হবে না।

সন্ন্যাসী তথা ভ্রাম্যমান বিদ্যালয়

এতদ্ব্যতীত যেসব বিভিন্ন জ্ঞান গ্রামের লোকেরা কিম্বা গ্রামের সজ্জন ব্যক্তিও প্রাপ্ত হন নি, সেসব জ্ঞান যাতে গ্রামের লোকেরা লাভ করতে পারেন, সেইরকম এক আয়োজন আমাদের পূর্ব-পুরুষেরা করেছিলেন। আমাদেরও সেইব্যবস্থা পুনরায় প্রবর্তন করতে হবে। পরিব্রাজক সন্ন্যাসীরাই এইভাবে গ্রামে-গ্রামে জ্ঞান বিতরণ করতেন। তাঁরা গ্রামে-গ্রামে ভ্রমণ করবেন এবং ২-৪ মাস করে এক-এক জায়গায় বাস করে শিক্ষা দেবেন। এতে গ্রামবাসীরা যথেষ্ট উপকৃত হবেন। সন্ন্যাসীরা সমস্ত জগতের জ্ঞান ও পারমার্থিক জ্ঞান সবাইকে দেবেন। সন্ন্যাসী অর্থাৎ যেন এক ভ্রাম্যমান ইউনিভার্সিটি গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে যাবেন, যাতে প্রত্যেক গ্রামই তাঁর উপস্থিতিতে লাভবান হতে পারে। তিনি স্বয়ং ছাত্রদের কাছে উপস্থিত হয়ে বিনা ব্যয়ে শিক্ষা দেবেন। গ্রামবাসিগণ তাঁর জন্যে সাত্ত্বিক ও পরিষ্কার আহার্য পানীয় যোগাবেন (এ ছাড়া তাঁর আর কিছুর প্রয়োজনই নেই) আর তাঁর কাছ থেকে জ্ঞান আহরণ করবেন। জ্ঞানলাভ করবার জন্যে অর্থব্যয় করার চেয়ে দুঃখের ব্যাপার আর কিছুই হতে পারে না। জ্ঞানবান মানুষের অন্যকে

জ্ঞানদান করবার পিপাসা হয়। সন্তানের স্তন্যপানের যতটা ইচ্ছা হয়, মাতার স্তন্যদানেরও ততটা ইচ্ছা হয়। কেন-না মাতার স্তনে ভগবানই যে দুধ ভরে দিয়েছেন। এই স্তন্যদুগ্ধ যদি আগামী কাল থেকে বিনামূল্যে না মেলে, তবে এই সংসারের কি ভয়ঙ্কর অবস্থাই না হবে?

বাণপ্রস্থাবলম্বী শিক্ষক

উচ্চশিক্ষা লাভের জন্যে এখন শহরে ইউনিভার্সিটিতে পড়তে যেতে হয়। সেখানে শত-শত টাকা খরচ না করে কিছুই পাওয়া যায় না। এটা ভাল করে বুঝে দেখা দরকার যে, পয়সা খরচ করে যে-জ্ঞান পাওয়া যায়, তা জ্ঞান নামের যোগ্য কি-না। আসলে এইরকম জ্ঞান অজ্ঞানেরই সামিল। প্রেম ও সেবা দিয়ে জ্ঞানলাভ করা যেতে পারে। পয়সা খরচ করে জ্ঞান পাওয়াই যায় না। এইজন্যে জ্ঞানী পুরুষ গ্রামে-গ্রামে ঘুরে জ্ঞানদান করেন। যে-গ্রামে তিনি উপস্থিত হন সেই গ্রামবাসীরা সহৃদয় অভ্যর্থনায় তাঁকে স্বাগত জানান ও তাঁকে গ্রামে ২৪-দিন রেখে দেন। ভক্তির সঙ্গে তাঁর কাছে সমুপস্থিত হয়ে জ্ঞান আহরণ করেন। এই ব্যবস্থাই জ্ঞানদানের সহজ উপায়। নদী যেমন স্বয়ং সকলের সেবার জন্যে গ্রামে-গ্রামে দ্রুত ধাবিত হয়, গাভীরা যেমন আহার্য-পানীয় গ্রহণের দ্বারা আপন-আপন স্তন দুগ্ধপূর্ণ করে বৎসদের স্তন্যপান করানোর জন্যে দৌড়ে চলে আসে, তেমনি জ্ঞানবান পুরুষও জ্ঞান নিয়ে গ্রামে-গ্রামে ছুটে যাবেন। এই পরিব্রাজক সংস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হলে গ্রামে-গ্রামে ইউনিভার্সিটি হতে পারবে এবং

জগতের নানা জ্ঞান প্রত্যেক গ্রামে সুলভ হবে। কাজেই বানপ্রস্থ-আশ্রমকে আবার শক্তিশালী করে তুলতে হবে। এতে প্রত্যেক গ্রামেই শিক্ষক সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হওয়া যাবে এবং শিক্ষকের জন্যে বিশেষ খরচও হবে না। প্রত্যেক বানপ্রস্থাবলম্বী ব্যক্তিই শিক্ষক এবং প্রত্যেক পরিব্রাজক সন্ন্যাসীই এক-একটি ইউনিভার্সিটি। গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশের পূর্বাবস্থায় অল্পবয়স্কেরা তো শিক্ষার্থী আছেই, তাছাড়া গ্রামে-গ্রামে এমন বহু গৃহস্থ আছেন যাঁরা ২।১ ঘণ্টা বিদ্যাশিক্ষা করবেন আর দিনের বাকী সময় কাজকর্ম করবেন। সুতরাং দেখা যাচ্ছে প্রাচীনকালে যে চতুরাশ্রমের আয়োজন করা হয়েছিল, সেটি একটি জীবনব্যাপী (জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত) শিক্ষার আয়োজন—প্রথম ২ আশ্রমের লোক শিক্ষার্থী ও শেষের ২ আশ্রমের লোকেরা শিক্ষক।

সর্বোদয়ের দৃষ্টি

গ্রামের সমস্ত লোক নিজেদের জীবনের সকল সমস্যা আত্মনির্ভর হয়ে সমাধান করবে, এটাই হল সর্বোদয়ের দৃষ্টিভঙ্গী বা আদর্শ। এইজন্যে গ্রামের সমস্ত সম্পদের মালিক ব্যক্তিবিশেষ না হয়ে সমগ্র গ্রামই হওয়া উচিত। এবং তাহলে গ্রামের প্রত্যেক বালকবালিকার জন্যে একই রকম শিক্ষা ব্যবস্থা হতে পারবে। সকলকে যদি সমান-ভাবে পুষ্টিকর ও উত্তম আহার্য না দেওয়া যায়, তাহলে কি সমান-ভাবে শিক্ষা দেওয়া সম্ভবপর হবে? সুদামা ছিলেন দরিদ্র ব্রাহ্মণ-সন্তান আর শ্রীকৃষ্ণ রাজপুত্র। দুইজনেই গুরুগৃহে উপনীত হলেন। সেখানে দুইজনের আহার্যে কোন তারতম্য ছিল না, তাঁরা এক-

জাতীয় পরিশ্রমের কাজ করতেন এবং বিদ্যাও দুইজনকে সমভাবেই দেওয়া হত। যদি কোন গ্রামের স্কুলে একটি ছেলে ছেঁড়া কাপড় আর একটি ছেলে ভাল কাপড়চোপড় পরে আসে, যদি একজনের খাওয়া না জোটে আর অন্য জন বসে-বসে খেয়ে অলস হয়ে যায়, তাহলে সেই স্কুল চলবে কী করে? কাজেই গ্রামের সকলের সুশিক্ষা যদি আমাদের কাম্য হয়, তাহলে সামাজিক ব্যবস্থা এমন হওয়া চাই যাতে গ্রামের সকলে নিজেদের এক পরিবারভুক্ত বলে মনে করতে পারে আর গ্রামের মিলিত বুদ্ধি, শক্তি ও ধন সকলের কাজে আসতে পারে।

ভূদান ও গ্রামোদ্যোগের দ্বারা যে-অহিংসার আদর্শ সর্বত্র বিস্তৃত হবে, সেই অহিংসার মধ্যে নঈ-তালীমের আদর্শ লুক্কাইত আছে। জ্ঞানী, প্রেমিক ও বাৎসল্যের ভাবে পূর্ণ শিক্ষকেরা প্রত্যেক গ্রামে জন্মগ্রহণ করুন, ভগবানের কাছে এই প্রার্থনা করি।

—[অঙ্গুরেশ্বর (উড়িষ্যা), ৬ই মার্চ ১৯৫৫]

নঈ-তালীমে নতুন সমাজ

দেখা যাচ্ছে নঈ-তালীম আশানুরূপ ফলপ্রসূ হচ্ছে না। এই কারণে ছাত্র ও শিক্ষকেরা বিশেষ সন্তুষ্ট নন। আবাদী কংগ্রেসে পণ্ডিত নেহরু প্রস্তাব উত্থাপন করেছিলেন। ১০ বছর পর নঈ-তালীম শিক্ষাপদ্ধতি সরকারী শিক্ষাপদ্ধতিরূপে গৃহীত হবে এই মর্মে

সেখানে প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে। সুতরাং বর্তমানের নঈ-তালীম-বিদ্যালয়সমূহের আদর্শ বিদ্যালয় হওয়া উচিত। তাহলে নঈ-তালীম আশানুরূপ হবে এবং ভারতের সর্বত্র এইসব বিদ্যালয়ের অনুকরণে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হবে। তা না-হলে বলা হবে একরকম আর করা হবে অন্যরকম। আজকাল বেসিক-প্রবণ স্কুলগুলিকে নরসিংহাবতার বলা যেতে পারে। নরসিংহ যেমন না পুরা মানুষ, না পুরা পশু। এইজন্যে কয়েকটি আদর্শবিদ্যালয় পরিচালনা করা এবং এই সম্বন্ধে আমাদের ধারণা নিতান্ত স্পষ্ট হওয়া প্রয়োজন।

ভুল ধারণা

অনেকে মনে করেন—যদি কিছু হাতের কাজ শেখানো হয়, যেমন চরখায় সূতাকাটা শেখানো, তাহলে নঈ-তালীম অনুযায়ী শিক্ষা হল। আবার কেউ মনে করেন যে, লেখাপড়ায় বেশী মনোযোগ না-দেওয়ার নাম নঈ-তালীম। কেউ-বা মনে করেন, শ্রমের সঙ্গে জ্ঞান জুড়ে দিতে পারলেই নঈ-তালীম হয়ে যাবে। এই সংযোগ স্বাভাবিক হল কি-না সে-দিকে দৃষ্টি দেওয়া দরকার বলে মনে করা হয় না। এই তিনরকম ধারণাই ভুল।

শিল্পে দক্ষতা

নঈ-তালীমের ছাত্রদের অল্পপরিমাণ হাতের কাজ শেখানো হবে না। মাছ যেমন জলে বিচরণ করে, নঈ-তালীমে শিক্ষিত ছেলেমেয়েরা ঠিক তেমনি অনায়াসে হাতের কাজ করবে; হাতের কাজে তাদের ঠিক ততটা পটু হতে হবে। আমাদের ছেলেদের ৪-ঘণ্টা হাতের কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করতে পারার মতো

আত্মবিশ্বাস থাকা চাই। কি করে সূতা কাটতে হয়, কাপড় বুনতে হয়, এসব একটু-আধটু জানলেই চলবে না। কেউ-কেউ বলবেন যে, তাঁরা যখন শিক্ষকতা করবেন, তখন তাঁদের আর হাতের কাজে দক্ষ হয়ে লাভ কি! মা তো ছোট শিশুকে খাওয়া শেখান। খাওয়া শেখানোর পর একথা কখনও বলা হয় না যে, খেতে শিখেছে যখন, তখন আর খাওয়ার দরকার কি। কি করে খেতে হয় সেই জ্ঞানই যথেষ্ট নয়, প্রতিদিন খাদ্য পাওয়া চাই। আহার্য পানীয় যেমন নিত্যপ্রয়োজনীয়, তেমনি নঈ-তালীমের শিক্ষক ও ছাত্রদের কাছে শরীরশ্রমও নিত্য প্রয়োজনীয়। শ্রমশিল্পে তাঁদের এতটা নিপুণ হতে হবে যাতে গ্রামের কাঠের মিস্ত্রী, কৃষক প্রভৃতিরা তাঁদের কাছে শিখতে আসে। যন্ত্রপাতি মেরামত করার বিদ্যাও তাঁদের জানা থাকা চাই। তাঁদের কৃষিবিদ্যায় আচার্য হতে হবে। আজ তো গ্রামের শ্রমশিল্পগুলি নষ্ট হয়ে গেছে, নঈ-তালীমের দ্বারা সেইসকলের পুনরুদ্ধার করতে হবে।

পূর্ণজ্ঞানের দরকার

নঈ-তালীমে বইয়ের বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়নি বলে জ্ঞানকে উপেক্ষা করা হয় না। অনেক সময় একথা মনে করা হয় যে, শ্রমশিল্পের দ্বারা যতটুকু জ্ঞান হয় সেটাই সব। কিন্তু এই ধারণা ত্রুটিপূর্ণ। নঈ-তালীমের দ্বারা জীবনের মৌলিক বিষয়গুলির জ্ঞান পুরাপুরি হওয়া চাই। ইতিহাসের বিশদ তথ্যসমূহ, নিষ্কর্মা রাজন্য-বর্গের নামাবলী ইত্যাদি কণ্ঠস্থ করার কোন দরকার নেই। এতে ছাত্রদের উপর নিরর্থক ভার চাপানো হয়। কিন্তু জীবনে যে-সমস্ত

জ্ঞান প্রয়োজন, যারদ্বারা আমাদের জীবনবিকাশের সহায়তা মিলে, সে সব খুব প্রয়োজনীয়। তত্ত্বজ্ঞান, ধর্মসম্বন্ধীয় জ্ঞান, নীতিজ্ঞান, এসব সম্বন্ধে শিক্ষালাভ করা দরকার। আমাদের সমাজ এবং অন্যান্য সমাজের বিশেষত্ব জানা দরকার। বিজ্ঞানের মৌলিক যুক্তি-সমূহ ছেলেদের বোঝা চাই। চিকিৎসাবিদ্যা, খাদ্যবিজ্ঞান, স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান, রন্ধনবিদ্যা প্রভৃতির উত্তম জ্ঞান হওয়া প্রয়োজন। নঈ-তালীমে জ্ঞানের অল্পতা যাতে না হয়, সেদিকে দৃষ্টি রাখতে হবে। উত্তম ভাষাজ্ঞান হওয়া দরকার। নিজের মনোভাব, যুক্তি-বিচার প্রভৃতি যথাযথ প্রকাশ করবার বিদ্যা আয়ত্ত করতে হবে। হাতের লেখা সুন্দর হওয়া চাই, সাহিত্যবোধ হওয়া চাই। অর্থাৎ নঈ-তালীমে জ্ঞান যথেষ্ট হবে, কিন্তু অপ্রয়োজনীয় জ্ঞানের কোন স্থান থাকবে না।

আজকাল বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে ছাত্রদের মাথায় বৃথা অপ্রয়োজনীয় জ্ঞানের বোঝা চাপিয়ে দেওয়া হয়। আর বলা হয় যে, শতকরা ৩৩ নম্বর পেলেই পাশ। অর্থাৎ সেখানে শতকরা ৬৭ নম্বর পাওয়ার মতো উপযুক্ত জ্ঞান ভুলে যাওয়ার পথ খুলে রাখা হয়েছে। বস্তুত শতকরা ১০০ ভাগ জ্ঞানই স্মৃতিতে অঙ্কিত থাকা চাই। যে রাঁধুনী শতকরা ৮০ খানা রুটি ভাল বানাতে পারে, তাকে কে চাকরী দেবে? তেমনি কোন জ্ঞান কাঁচা না হওয়া চাই। জ্ঞান হলে ১৬ আনা হওয়া চাই। আর না হয় তো একেবারেই না থাকতে পারে, মাঝামাঝি হতে পারে না। কেউ কি শতকরা ৮০ ভাগ জীবন্ত থাকে আর ২০ ভাগ মৃত?

যদি কেউ বেঁচে থাকে তো পুরাই বেঁচে থাকে আর মৃত্যু হলে পুরাপুরি মৃত্যু হয়। জ্ঞান পুরাপুরি ও দ্বিধাহীন হওয়া চাই। জ্ঞান সংশয়যুক্ত হওয়া উচিত নয়। কিন্তু আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে শতকরা ৬৭ ভাগ জ্ঞান ভুলে যাবার অবকাশ এইজন্যে রাখা হয়েছে যে, তাঁরাও জানেন সেখানে অপ্রয়োজনীয় জ্ঞান অনুশীলন করা হয়। নঈ-তালীমে এইরকম ভুলবার অবকাশ থাকবে না। যতটা শেখানো হবে তার সমস্তটাই মনে রাখা দরকার হবে আর ছাত্রেরা সবটাই মনে রাখবে। কারণ এই জ্ঞান জীবনে প্রয়োগ করা হবে এবং কাজে লাগবে। বস্তুত প্রকৃত বিদ্যা মানুষ কখনও ভোলে না আর যা ভোলে তা বিদ্যাই নয়। সুতরাং নঈ-তালীমে যে-বিদ্যা শেখানো হবে, তা কখনও ভোলার বিদ্যা নয়। যারা নঈ-তালীমে শিক্ষিত হবে, তারা মহাজ্ঞানী হবে।

জ্ঞান ও কর্মের সমবায়

এখন কর্ম ও জ্ঞানের সংযোগ সম্বন্ধে আলোচনা করা যাক। এইজন্যে আমি সমবায় শব্দ তৈরী করেছি। মাটি আর ঘড়া পরস্পরের সঙ্গে এমন ওতপ্রোতভাবে যুক্ত যে, এদের পৃথক অস্তিত্ব বর্ণনা করা যায় না আর এদের অদ্বৈতভাবও বোঝানো যায় না। এইরূপ যেখানে দ্বৈত ও অদ্বৈত নির্ণয় করা যায় না, সেইরূপ সম্বন্ধকে সমবায় বলা হয়। যে-শিক্ষাপদ্ধতিতে জ্ঞান ও কর্মের সমন্বয় হবে এবং কখন জ্ঞান দান করা হচ্ছে আর কখন কর্ম করা হচ্ছে বলা যাবে না, সেই শিক্ষাপদ্ধতিই নঈ-তালীম-পদ্ধতি। জ্ঞান ও কর্মকে পৃথক করা যাবে না। জ্ঞান-প্রক্রিয়ার সঙ্গে কর্মের

প্রক্রিয়া এবং কর্ম-প্রক্রিয়ার সঙ্গে জ্ঞান-প্রক্রিয়া চলতে থাকবে। জ্ঞান ও কর্ম পরস্পরের সঙ্গে এমন নিবিড়ভাবে ওতপ্রোত হয়ে যাবে যে, কোন প্রকারেই এই দুইটিকে আলাদা করে দেখানো যাবে না। হাতের কাজ ছাড়া জ্ঞান আহরণ করার ব্যবস্থা থাকবে না। শিল্পের মাধ্যমে জ্ঞানের বিকাশ ও জ্ঞানের দ্বারা শিল্পের বিকাশ সাধিত হবে। এই আমাদের পদ্ধতি। জ্ঞান ও কর্ম একসঙ্গে সেলাই করে জুড়ে দিয়ে যে-পদ্ধতি তৈরী হয়, সে-পদ্ধতি আমাদের নয়। আমাদের পদ্ধতিতে জ্ঞান ও কর্ম পরস্পরের সঙ্গে ওতপ্রোত হয়ে যাবে।

নতুন সমাজ রচনাই লক্ষ্য

নঈ-তালীম সম্বন্ধে যে অস্পষ্ট ও ভুল ধারণা আছে, সে সম্বন্ধে বললাম। এখন একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা বলতে চাই। বর্তমান সমাজব্যবস্থা বজায় রেখে নঈ-তালীম প্রবর্তন করা যাবে না। নঈ-তালীম বর্তমান সমাজব্যবস্থার সম্পূর্ণ বিরোধী। যদি কেউ বলেন যে, নঈ-তালীম একরকমের 'তালীম' অর্থাৎ শিল্পের মাধ্যমে শিক্ষাদানপদ্ধতির নামই নঈ-তালীম, তাহলে ভুল বলা হবে। নঈ-তালীম নতুন সমাজ রচনা করবে। যদি বর্তমান সমাজব্যবস্থায় নঈ-তালীম-পদ্ধতি প্রচলিত করা যায়, তাহলে শিক্ষকদের বৃত্তির তারতম্য, ডিগ্রী অনুসারে বৃত্তি দেওয়া প্রভৃতি চলবে না। নঈ-তালীমেই যদি আর্থিক বৈষম্য থাকে, তবে তা কী করে রাষ্ট্র-পরিবর্তন আনয়ন করবে? বর্তমান রাষ্ট্রব্যবস্থায় যোগ্যতা অনুসারে বেতন দিয়ে বিভিন্ন শ্রেণী সৃষ্টি করা হয়েছে।

নঈ-তালীম এই ব্যবস্থাকে দূর করবে। নঈ-তালীম যদি বর্তমান ব্যবস্থার বিরোধী না হত আর এই অবস্থাকে চূর্ণ না করত, তাহলে এ তো নঈ-তালীমই হত না। নঈ-তালীমে শরীরশ্রমের এবং মানসিক-শ্রমের আর্থিক ও নৈতিক মূল্য সমান বলে স্বীকৃত হবে। অর্থাৎ বর্তমান সমগ্র অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তিত করতে হবে। আর নঈ-তালীম সেই পরিবর্তন সাধিতও করবে।

[রাজসুনাখ্‌লা, পুরী (উড়িষ্যা) ১৭ই এপ্রিল, ১৯৫৫]

ব্রহ্মবিদ্যা ও শ্রমশিল্প

আজকাল শিক্ষক চেয়ারে বসেন, ছাত্রেরা বেঞ্চে। আর বই-এর সহায়তায় লেখাপড়া চলে। এভাবে যারা শিক্ষা পায় তাদের কাজ করার শক্তি থাকে না। আজ কোন ছেলে রান্না করতে জানে না। তারা ভাবে রান্না করা মেয়েদের কাজ, হীন কাজ। রান্না করা তাদের কাজ নয়, তাদের কাজ খাওয়া। এর থেকে তাদের ধারণা হয় যে, তারা মেয়েদের থেকে উঁচু। আমরা এমন শিক্ষা দিতে চাই যাতে ছেলেরাও রান্নার কাজ শিখতে পারে। আজকাল ছেলেরা গ্রীষ্ম সহ্য করতে পারে না, তাই গ্রীষ্মকালে ছুটি থাকে। যাদের রোদ-জল সহ্য হয় না, তারা চাষের কাজ কী করে করবে?

শ্রীকৃষ্ণের শিক্ষালাভ

শ্রীকৃষ্ণ যেমন কাজ করতে-করতে বিদ্যালাভ করেছিলেন, তেমনি করে আমাদের ছেলেদেরও বিদ্যালাভ করতে হবে।

শ্রীকৃষ্ণ গরু চরাতেন, দুধ দুইতেন, ঘর লেপতেন, মজুরের কাজ করতেন, গুরুগৃহে জ্বালানী কাঠের জন্যে কাঠ চিরতেন, অর্জ্জুনের ঘোড়ার সেবা করতেন এবং অর্জ্জুনের সারথির কাজও করতেন। যুধিষ্ঠির যখন রাজসূয়-যজ্ঞ করেছিলেন সে-সময় শ্রীকৃষ্ণ তাঁর কাছে গিয়ে বললেন, 'আমাকে কোন কাজ দিন।' যুধিষ্ঠির বললেন, 'এখন তো কাজ খালি নেই।' শ্রীকৃষ্ণ বললেন 'আমি বসে থাকতে রাজী নই।' তখন যুধিষ্ঠির বললেন, 'তাহলে আপনি নিজেই কাজ খুঁজে নিন।' শ্রীকৃষ্ণ তখন উচ্ছিষ্ট পরিষ্কার করার আর গোবর দিয়ে লেপার কাজ বেছে নিলেন। বললেন যে, তিনি এ কাজে খুব দক্ষ, কারণ ছোটকাল থেকে একাজ করেছেন। শ্রীকৃষ্ণের এই উচ্ছিষ্ট পরিষ্কার করার কথা শুকদেব ভাগবতে আর ব্যাসদেব মহাভারতে বর্ণনা করেছেন। এই শ্রীকৃষ্ণই আবার অর্জ্জুনকে ব্রহ্মবিদ্যাও শিক্ষা দিয়েছিলেন।

বর্তমানের শিক্ষা

আমাদের দেশের ছেলেদের সমস্ত কাজে সমান নিপুণতা লাভ করতে হবে। একদিকে তারা যেমন ব্রহ্মবিদ্যায় পারদর্শী হয়ে উঠবে, অন্যদিকে তেমনি সাফাইয়ের কাজে, লেপার কাজে, চাষের কাজেও দক্ষতা লাভ করবে। এখন যে-শিক্ষা তারা লাভ করছে, তাতে ব্রহ্মবিদ্যাও জানছে না, প্রয়োজনীয় কাজকর্মও কিছুই শিখছে না। ব্রহ্মবিদ্যা কিছুই না-জানার ফলে আমরা বিষয়ভোগে মগ্ন হয়ে পড়েছি, ইন্দ্রিয়ের দাস হয়ে গেছি। শিক্ষিত লোকেরা আরাম প্রিয় হয়ে পড়েছেন ; তাঁদের অন্তর ভোগ বাসনায়, ধন লালসায়

পূর্ণ। আর শ্রমশিল্প ব্যতিরেকে বিদ্যাশিক্ষা হওয়ার দরুন সকলের হাত অকর্মণ্য হয়ে পড়েছে। এভাবে আত্মজ্ঞানের অভাবে আমরা অন্তরের গতি হারিয়েছি আর কাজের অভাবে হাতের শক্তি হারিয়ে ফেলেছি। শিক্ষিত লোকেরা দশ আঙ্গুল দিয়ে কাজ করার বদলে হাতে কলম নিয়ে তিন আঙ্গুল দিয়ে কাজ করেন। এই জাতীয় শিক্ষা যদি সকলেই লাভ করে, তবে অন্ন উৎপাদন করবে কে?

ব্রহ্মবিদ্যা ও শ্রমশিল্প

শিক্ষার আমূল পরিবর্তন করতে হবে। শিক্ষা-প্রণালীর মধ্যে ব্রহ্মবিদ্যা ও শ্রমশিল্প শিখবার ব্যবস্থা করতে হবে। ব্রহ্মবিদ্যা দ্বারা আত্মজ্ঞান হবে, শরীর, মন ও ইন্দ্রিয়ের উপর কর্তৃত্ব করার শক্তি জন্মাবে। সব মানুষকে ভালবাসতে শেখা যাবে, আত্ম-পর ভেদ মিটে যাবে; এইগুলি আমার আর ঐ জমি অন্যের—এই জাতীয় স্বার্থবুদ্ধি দূর হয়ে যাবে। ব্রহ্মজ্ঞব্যক্তির মমকার থাকে না। তিনি বলেন, 'এই-যে জমি, এই-যে ঘর, এই-যে সম্পত্তি, এসব সকলের।' যিনি ভ্রান্ত-বিদ্যার অধিকারী তিনি বলেন, 'এসব আমার।'

আমাদের শিক্ষা ছেলেদের দুই হাতে কাজ করতে শেখাব, যাতে তারা স্বাবলম্বী হতে পারে। প্রত্যেক ছেলে ভাল রাঁধতে শিখবে। ছেলেরা চাষের কাজ করবে। দেশের সর্বত্র মানুষ জড়তাগ্রস্থ ও অলস হয়ে পড়েছে, তাই কৃষি-শিল্প সব লুপ্ত হতে বসেছে। সকল-রকমের দক্ষ কারিগর আমাদের দেশে দরকার। ভাল কাঠের মিস্ত্রী, ভাল তাঁতী, ইঞ্জিনিয়ার, কর্মকার, চর্মকার প্রভৃতি আমাদের দরকার। আমাদের ভাল সৈনিক ও সেনাপতিও চাই। আমাদের

এমন ব্যবসায়ী চাই যাঁরা ব্যবসাদ্বারা লোকের সেবা করবেন, লোককে ঠকাবেন না। দেশে কোন কাজই ছোট থাকবে না, সবই সমান মর্যাদা লাভ করবে। কেউ একথা বলবে না, 'অমুক কাজ আমি করব না, কারণ তা হীন কাজ।'

[নৌরঙ্গপুর, কোরাপুট (উড়িষ্যা), ৫ই জুলাই, ১৯৫৫]

নঈ-তালীমের আদর্শ

শিষ্যের দেবতা গুরু, গুরুর দেবতা শিষ্য। শিষ্য অনন্যচিত্ত হয়ে গুরুর কাছে জ্ঞান লাভ করবে এবং গুরুসেবা করবে। গুরুও অনন্যচিত্ত হয়ে শিষ্যকে জ্ঞানদান করবেন এবং অধ্যাপনা ভিন্ন তাঁর অন্য চিন্তা থাকবে না। গুরু কিম্বা শিষ্য শিষ্যসেবা বা গুরুসেবাদ্বারা স্বীয়-স্বীয় স্বার্থ সিদ্ধ করার কথা ভাববেন না। অর্থাৎ বিদ্যার্থীরা গুরুসেবাকে এবং শিক্ষকেরা ছাত্রসেবাকে পর্যাপ্ত ধ্যেয়, একমাত্র ধ্যেয় ও অনন্য ধ্যেয় মনে করবেন এবং উভয়ে অধ্যয়ন-অধ্যাপনাদ্বারা পরমেশ্বরের পূজা করছেন বলে অনুভব করবেন।

সমষ্টি-জীবন

এইরকম উপলব্ধি হলে সকলেই উপকৃত হবেন। ছাত্র ও শিক্ষক মিলে যখন কৃষি, বস্ত্রবয়ন, সাফাই প্রভৃতি উৎপাদক-শ্রম করেন, তখনই সমষ্টিগত জীবনযাত্রা সহজ হয়ে যায় আর এই সমাজচেতনার উদ্ভবের দ্বারা দেশের প্রভূত উপকার সাধিত হয়। অনুরূপভাবে

অধ্যয়ন ও অধ্যাপনায় পরস্পরের মধ্যে সহযোগিতার ও সমাজ-সেবার অনুভূতি হলেও আমরা শ্রেয়লাভ করব। অধ্যাপনা ও উৎপাদকশ্রমে উপরোক্তভাবে সমষ্টি-জীবনের স্ফূরণ হলে উপযুক্ত পুস্তকের অভাবও মিটে যাবে। কারণ, উপরোক্ত দুই প্রকারের অভিজ্ঞতা থেকে নানাবিষয়ে প্রয়োজনীয় পুস্তক লিখবার উপাদান সংগৃহীত হবে।

অভিজ্ঞতাপূর্ণ গ্রন্থ

আমাদের দেশে যে-সকল উত্তম ভাষ্য রচিত হয়েছে, সে-সকল গ্রন্থ প্রত্যক্ষ অধ্যাপনার সময়েই রচিত হয়েছে। ভগবান শঙ্করাচার্য ব্রহ্মসূত্রের যে অতুলনীয় ও বিখ্যাত ভাষ্য রচনা করেছেন, তা এই-ভাবেই হয়েছে। এই অসাধারণ গ্রন্থে অতি সহজ, চিত্তাকর্ষক ও সর্বসাধারণের বোধগম্য ভাষায় গভীর তত্ত্বজ্ঞানের ব্যাখ্যা করা হয়েছে। গ্রীন, কাণ্ট প্রভৃতি তত্ত্বজ্ঞানীদের গ্রন্থ বড়ই জটিল। কিন্তু শঙ্করের ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য এত সহজ ভাষায় লেখা যে, আমি ছোট ছেলেদের সংস্কৃত শেখাবার সময় অনায়াসে এই ভাষ্য পড়িয়েছি। আর ছেলেদেরও তা বুঝতে একটুও অসুবিধা হয়নি ; তাদের মনে হয়েছে যে, নিজেদের মাতৃভাষায়ই তারা এসব পড়ছে। তার কারণ, শঙ্করাচার্য শিষ্যদের ব্রহ্মসূত্র পড়িয়েছিলেন এবং সেই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার সাহায্যে এই ভাষ্য লিখেছিলেন। পড়াবার সময় এক এক সূত্রের যে-বিস্তৃত ব্যাখ্যা করেছিলেন, সেই ব্যাখ্যারই সংক্ষিপ্তসার তিনি ভাষ্যাকারে লিপিবদ্ধ করেছিলেন। এইজন্যে কথোপকথন বা আলোচনার ঢং-এ এই বই লেখা হয়েছে। এই

বই পড়ার সময় মনে হয় না যে, একজন লেখকের বই পড়ছি ; মনে হয় গুরু উপদেশ দিচ্ছেন আর আমি শুনছি।

আমার রচনাবলী

অধ্যয়ন-অধ্যাপনা এবং উৎপাদক-শ্রম সমাজসেবার উদ্দেশ্যে সাধিত হলে তা থেকে নানা গ্রন্থ রচিত হতে পারবে। আমি প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার সাহায্যে সূতাকাটা সম্বন্ধে একটি পুস্তিকা রচনা করেছি। সূতা কাটতে-কাটতে আর সূতাকাটা শেখাতে-শেখাতে এই পুস্তিকা রচিত হয়েছে। আমার অন্য পুস্তক 'গীতা-প্রবচন' তো কারাগারে বন্দীদের কাছে প্রদত্ত কতকগুলি ভাষণের সমষ্টি। সেবার উদ্দেশ্যে ও স্বাভাবিকভাবে ঐ সকল ভাষণ দেওয়া হয়েছিল বলেই 'গীতা-প্রবচন' লেখা হয়েছে, তা না হলে ভেবে-চিন্তে ঐ বই লেখা হত না। আমরা প্রার্থনার সময় প্রতিদিন গীতায় স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ যেসব শ্লোকে আছে, সেসব শ্লোক উচ্চারণ করে থাকি। একদিন জেলে কয়েকজন বন্ধু 'স্থিতপ্রজ্ঞ' সম্বন্ধে আমাকে কিছু বলতে অনুরোধ করলেন। তাঁদের সামনে ঐ শ্লোকগুলির ব্যাখ্যা করতে গিয়ে যা বলেছিলাম, তা থেকে 'স্থিতপ্রজ্ঞ-দর্শন' নামে পুস্তক রচিত হয়েছে। জেলে লেখা 'স্বরাজ্য-শাস্ত্র' নামে বইও এভাবেই হয়েছে। এক বন্ধু কয়েকটি প্রশ্ন করেছিলেন, আমি তার উত্তর দিয়েছিলাম ; ঐ প্রশ্নোত্তর থেকেই বইটি লেখা।

এইভাবে দেখা যায় যে, যখন শিক্ষক ও ছাত্র সমাজসেবার উদ্দেশ্যে অধ্যয়ন, অধ্যাপনা এবং উৎপাদক-শ্রম করেন, তখন তাতে কেবল সংশ্লিষ্ট লোকেরাই লাভবান হয় না, সমস্ত জগত উপকৃত হয়।

কারণ এই আলোচনা ও কর্মপ্রচেষ্টা থেকে যেসব গ্রন্থ রচিত হয়, সে-সব গ্রন্থের আদর্শ অনুসরণকারী সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয় এবং পরম্পরাগত-ভাবে এই সকল গ্রন্থের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা চলতে থাকে।

চিন্তার অনুশীলন ও প্রয়োগ

নঈ-তালীম বিদ্যালয়গুলি চিন্তায়, অধ্যয়নে ও আচরণে যুক্তি-প্রধান স্থান অবলম্বন করবে আমি এই আশা করি। এইরূপ শিক্ষক ও ছাত্রের মিলিত চিন্তা ও আচরণ থেকেই জগতে সকল প্রকারের অভিজ্ঞতাপ্রসূত জ্ঞানের উদ্ভব হয়েছে। যে-শিক্ষায় যুক্তির মন্থন ও প্রয়োগ পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায়, তাকেই নঈ-তালীম আখ্যা দেওয়া হয়েছে। আজ যে-শিক্ষা চলেছে তাতে যুক্তির মন্থন হয়, কিন্তু তাকে জীবনে প্রয়োগ করা হয় না। অসংখ্য কৃষক আজ যে-আচরণ করছেন তার মূলে যুক্তির মন্থন বা অনুশীলন নেই ; তাঁরা পরম্পরাগতভাবে যে-কাজ করে যাচ্ছেন তা কর্মযোগ। একদিকে তত্ত্বজ্ঞানী আর অন্যদিকে অগণিত কৃষক, এই উভয়ের মিলন সাধন করে যা হবে, তা-ই হবে নঈ-তালীমের শিক্ষক ও ছাত্র।

গোপাল কৃষ্ণ

রাখাল শ্রীকৃষ্ণ এর আদর্শ। একদিকে তিনি গরু চরাতেন, ঘোড়ার সেবা করতেন, যুদ্ধ করতেন, আবার অন্যদিকে ধর্মোপদেশও দিতেন। শ্রীকৃষ্ণ ছিলেন একাধারে মহাকর্মী ও মহাজ্ঞানী। তিনি কেবল পূর্বাচার্যদের অর্জিত জ্ঞানের অনুশীলনই করেননি, স্বয়ং নতুন-নতুন তত্ত্বের উদ্ঘাটনও করেছেন। পূর্বে জ্ঞানযোগ, কর্মযোগ ও ভক্তিযোগের সাধনা ভিন্ন-ভিন্ন সাধনমার্গ অনুসরণ করে করা

হত। ধ্যানযোগেও কেউ-কেউ অনুসরণ করতেন। ত্রিগুণের ক্রম-বিকাশের প্রক্রিয়াও সাংখ্যমতানুসারে এক ভিন্ন পন্থারূপে প্রচলিত হয়েছিল। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এইসকল সাধনমার্গের সমন্বয় করে এক নতুন তত্ত্ব জগতের সামনে তুলে ধরলেন। এই কারণে আমি তাঁকে জগদ্গুরু বলি। তিনি মানুষকে এক নতুন বস্তু দিয়েছেন। তিনি কৃষক কিংবা শিল্পীদের মতো কেবলমাত্র অনুকরণ করেই কর্মযোগ সাধন করেন নি, নতুন কর্মপন্থাও সৃষ্টি করেছেন। লোকেরা আগে ইন্দ্রের পূজা করত, তিনি কাল্পনিক দেবতা-পূজার পরিবর্তে প্রত্যক্ষ পর্বতের পূজা প্রবর্তন করেন, অর্থাৎ পর্বতের প্রতি লোকদের শ্রদ্ধান্বিত হতে শেখান। ভারতবর্ষে গো-সেবার মর্যাদা তিনি এত বাড়িয়ে দিয়েছেন যে, আজও গো-সেবার সঙ্গে তাঁর নাম বিশেষভাবে জড়িত হয়ে আছে। সাধক একনাথ বলেছেন যে, রামচন্দ্রের জীবনে সর্বপ্রকারের পূর্ণতা থাকা সত্ত্বেও একটি অপূর্ণতা ছিল। সেই অভাব পূর্ণ করার জন্যে তিনি শ্রীকৃষ্ণরূপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। শ্রীরামচন্দ্র কখনও গো-সেবা করেন নি, তাই গো-সেবা করবার জন্যে তিনি শ্রীকৃষ্ণরূপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ নানা সমাজকল্যাণ প্রচেষ্টার সঙ্গে গো-সেবাকেও (এক কল্যাণ কর্মরূপে) যুক্ত করে দিলেন।

তত্ত্বজ্ঞান ও কর্মযোগ

শ্রীকৃষ্ণ তত্ত্বজ্ঞানে, সামাজিক ক্ষেত্রে ও শিল্পে নানা উন্নতি সাধন করেছিলেন। মানুষকে তিনি এক নতুন তত্ত্বজ্ঞানের ও এক নতুন কর্মযোগের সন্ধান দিয়েছিলেন। তিনি যে সম্পূর্ণ নতুন বস্তু জগতকে

দান করেছিলেন তা নয়, তাঁর তত্ত্বজ্ঞান প্রাচীন তত্ত্বজ্ঞানের উপরই প্রতিষ্ঠিত। পুরানো পাত্রে তিনি নতুন মিষ্টান্ন প্রস্তুত করে জগতে বিতরণ করেছিলেন। ঘি, গুড়, ময়দা এ সকল পূর্বেও ছিল; তিনি এ সকল তৈরী করেন নি, তিনি এ সব দিয়ে এক অভিনব মিষ্টান্ন প্রস্তুত করলেন। লাড্ডু ঘি-গুড়-ময়দা দিয়ে প্রস্তুত বটে, কিন্তু এসব থেকে তা সম্পূর্ণ ভিন্ন বস্তু। তাঁর আবির্ভাবের পূর্বে যে-সকল মৌলিক তত্ত্বজ্ঞান জ্ঞাত ছিল, সে-সকলকে মিলিয়ে তিনি এক সরস তত্ত্বজ্ঞানের মিষ্টান্ন প্রস্তুত করলেন। তাঁর পূর্বে আর কেউ গো-সেবার কথা যে জানত না, তা নয়; কিন্তু তিনি গো-সেবাকে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কাজ বলে প্রমাণ করলেন এবং গো-সেবাকে গো-পূজার মর্যাদা দান করলেন। ভারতবর্ষের সমাজ-সংস্কার ক্ষেত্রে এ তাঁর বিশিষ্ট দান। শ্রীকৃষ্ণজীবনী আলোচনা করা আমার উদ্দেশ্য নয়। কিন্তু আমি এমন এক ব্যক্তির জীবন দৃষ্টান্তরূপে গ্রহণ করেছি, যিনি সকল কাজ অধ্যাত্ম আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে করতেন এবং যাঁর জীবনে জ্ঞান ও কর্মের দুই ধারা এক হয়ে গিয়েছিল।

বুনিয়াদী শিক্ষকের আদর্শ

বুনিয়াদী শিক্ষককে উপরোক্ত আদর্শ সামনে রাখতে হবে। তিনি কোন চাষী বা তাঁতী বা কাঠের মিস্ত্রী অপেক্ষা ঐসকল কর্মে কম নিপুণ হবেন না, বরং অধিক দক্ষতা লাভ করবেন। এ সকল লোক যা বুঝতে পারবে না তাঁর কাছে তা সহজেই বোধগম্য হবে। প্রত্যেক কাজেই তিনি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের থেকে অধিক ক্ষিপ্র হবেন

এবং যন্ত্রাদির সংস্কার বিষয়ে তাঁর জ্ঞান বেশী থাকবে। কৃষক নিজের অন্নসংস্থানে যদি আট-ঘণ্টা ব্যয় করে, তাহলে বুনিয়াদী শিক্ষকের সেই জায়গায় চার-ঘণ্টায় কাজ হয়ে যাওয়া চাই। বুনিয়াদী শিক্ষককে এতটা প্রগতি সাধন করতে হবে। আমি আজ পর্যন্ত যত বুনিয়াদী শিক্ষক দেখেছি, তাঁরা সকলেই নামমাত্র হাতের কাজ জানেন। মাছ যেমন অবলীলাক্রমে জলে সাঁতার দেয়, খেলা করে, এ সকল শিক্ষকেরা তেমন অবলীলাক্রমে কৃষি প্রভৃতি কার্য সম্পন্ন করতে পারেন না। শ্রীকৃষ্ণ ছিলেন এক সুদক্ষ যোদ্ধা এবং এক নিপুণ ও তত্ত্বজ্ঞ গো-সেবক। কর্মযোগের অনুরূপ প্রয়োগ আমাদের বিদ্যালয়ে প্রচলিত করতে হবে।

অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান

আমাদের বিদ্যালয়েও যে-সকল তত্ত্বের আলোচনা হবে, সে সকলের প্রভাব প্রত্যেকের উপর পড়া চাই, অর্থাৎ সে-সকল জীবন্ত হওয়া চাই এবং নতুন-নতুন যুক্তিদ্বারা সে-সব ক্রমেই অধিকতর বোধগম্য হওয়া চাই। কিসে সমাজতত্ত্বের ক্রমশ সংস্কার হবে, সেবিষয়ে বারবার আলোচনা করতে হবে। আজ সর্বত্র সাম্যবাদের আলোচনা চলছে, বিভিন্নপ্রকার সমাজবাদও জগতে গৃহীত হয়েছে, ভারতবর্ষের গভর্ণমেণ্টও সমাজবাদী রচনাত্মক কাজে আত্মনিয়োগ করেছে। সর্বোদয়ও সমাজ সংগঠনের একটি পন্থা আর আমাদের প্রাচীন স্মৃতিশাস্ত্রেও সমাজরচনার এক পরিকল্পনা আছে। এ সকল প্রাচীন ও নবীন সমাজ-আদর্শ এখানে আলোচিত ও অধীত হওয়া চাই।

কেউ-কেউ মনে করেন বুনিয়াদী-শিক্ষায় জ্ঞানের শক্তি কম আর

কর্মের শক্তি বেশী। এ ধারণা ভুল। তাঁরা জানেন না যে, অন্যান্য বিদ্যালয়ে লব্ধ জ্ঞান ফাঁপা 'আর এখানে যে-জ্ঞান লাভ হবে, তা নিরেট। এই পার্থক্যের কারণ হচ্ছে, পূর্বোক্ত জ্ঞান কেবলমাত্র যুক্তিদ্বারা প্রাপ্ত আর শেষোক্ত জ্ঞান অভিজ্ঞতালব্ধ। এইজন্যে পূর্বোক্ত জ্ঞান হবে দ্বিধাগ্রস্ত আর শেষোক্ত জ্ঞান হবে নিঃসংশয়। সেখানকার জ্ঞানী অপেক্ষা এখানকার জ্ঞানী নিকৃষ্ট হবেন, একথা ভুল। যেখানে জ্ঞান ও কর্মের পার্থক্য দূর হয়ে যায়, সেখানেই নঈ-তালীমের উদ্ভব হয়। আমাদের আশ্রমে খাওয়ার সময় খাদ্য-সংশ্লিষ্ট জ্ঞানের আলোচনা হত। আমরা রান্না করতাম, কিন্তু রান্নার কাজে যত হিসাব দরকার তা-ও করতাম। খাওয়ার পর আমরা তরকারী কুটতাম আর নানা আলোচনা করতাম। সেই তরকারী কোটার আসরের নাম দিয়েছিলাম চর্চা-মণ্ডল বা আলোচনা-সভা। খাওয়ার পর শরীর কিছুক্ষণ আরাম চায়। এইজন্যে সেই সময়টাকে আমরা অবসর বিনোদনের সময় বলেই ধরতাম আর তাড়াতাড়ি কাজ সারবার জন্যে ব্যস্ত না হয়ে বেশ আরাম করে-করে কাজ করতাম। কাজের সঙ্গে-সঙ্গে দুনিয়ার নানাবিষয়ে আলোচনা চলতে থাকত, কিন্তু কেউ মনে করত না যে পড়াশুনা চলছে। এভাবে নানাবিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হত, কিন্তু যারা শিখত তারা শিখবার নাম করে শিখত না। শিক্ষাও তাই খুব সহজভাবে হত।

গুরু ও শিষ্য

মুনি বিশ্বামিত্র দশরথের কাছে গিয়ে বললেন, 'আমি রাম লক্ষ্মণকে চাই, তারা আশ্রমে যজ্ঞ রক্ষা করবে।' রাম লক্ষ্মণ

গুরুর কাছে জ্ঞান লাভ করবার উদ্দেশ্য নিয়ে তাঁর সঙ্গে যান নি। জ্ঞানার্জনের ইচ্ছা সকাম হতে পারে আবার নিষ্কামও হতে পারে। রামলক্ষ্মণের মনে সকাম ভাবনা ছিল না। আমাদেরও জ্ঞানার্জনের বাসনা নিষ্কাম হওয়া চাই। শিষ্য নিষ্কামভাবে অনন্যচিত্ত হয়ে গুরুসেবা করবে। প্রতিদানে জ্ঞান লাভ করব এইজন্যে গুরুসেবা করছি—এরকম মনোভাব বর্জন করতে হবে। রাম আর লক্ষ্মণ নিষ্কামভাবে সেবাকাজে রত হওয়ার জন্যে বিশ্বামিত্র মুনির সঙ্গে যাত্রা করলেন।

জ্ঞানদানের বিধি

সায়ংকালে বিশ্বামিত্র রামলক্ষ্মণকে সন্ধ্যাবন্দনার জন্যে প্রস্তুত হতে বললেন। সন্ধ্যাবন্দনার পর কিছু জ্ঞানচর্চাও হল। তারপর রামলক্ষ্মণ তৃণশয্যায় শুয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন। এ কথা স্মরণ রাখতে হবে যে, রামলক্ষ্মণ ছিলেন পিতার স্নেহভাজন দুই কিশোর রাজপুত্র। তাঁরা এতদিন রাজোচিত মহার্ঘ শয্যায় রাত্রিযাপনে অভ্যস্ত হয়েছেন। সেখানে তাঁদের জন্যে তৃণশয্যা রচিত হল এবং তাঁরা সেই শয্যায় শয়ন করলেন, অর্থাৎ তাঁদের বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা আরম্ভ হয়ে গেল।

ঊষাকালে সূর্যোদয়ের বহু পূর্বে বিশ্বামিত্র দুই ভাইকে জাগালেন। উন্মুক্ত আকাশের নীচে মুক্ত বায়ুতে তৃণশয্যায় রাজপুত্ররা ঘুমিয়ে ছিলেন, তাঁদের জাগাতে বড় মায়া হল। রাজপুরীতে বন্দীরা গান গেয়ে তাঁদের জাগাত। 'সূর্যোদয়ের আর দেরী নেই, অলিকুল গুঞ্জন করছে। হে রাজকুমার রাম! উঠুন, শয্যা ত্যাগ

করুন'—হয়তো এইরকম গান করতে-করতে বন্দীরা তাঁদের জাগাত। আর আশ্রমে রাত্রিশেষে প্রায়ান্ধকারে যখন সকলে নিদ্রামগ্ন, তখন বিশ্বামিত্র মধুরস্বরে তাঁদের ডাকলেন—বললেন, 'ওঠো, জাগো।' ব্রাহ্মমুহূর্তের অমৃতময় পরিবেশে অমৃত পান করাবার জন্যে বিশ্বামিত্র তাঁদের ঘুম ভাঙ্গালেন। তাঁদের ঘুম ভাঙ্গাতে তাঁর কষ্ট হচ্ছিল, কিন্তু তিনি ভাবলেন—এঁদের এখন না জাগালে, এঁরা যে অমৃত থেকে বঞ্চিত হবেন। তাই তিনি তাঁদের জাগিয়ে দিলেন।

তারপর তাঁদের নিয়ে বিশ্বামিত্র ভ্রমণে বেরোলেন। কিছুদূর গিয়ে এক বিধ্বস্ত অঞ্চল দৃষ্টিগোচর হল। বিশ্বামিত্র ঐসব জায়গা দেখাতে-দেখাতে ঐ স্থানের পূর্ব ইতিহাস বর্ণনা করতে আরম্ভ করলেন। পূর্বে সেখানে এক সমৃদ্ধিশালী রাষ্ট্র ছিল, কি করে তার ঐ অবস্থা হল সে-সবের বর্ণনা দিয়ে তাঁদের ইতিহাস শেখাতে লাগলেন। পরে ধনুর্বিদ্যাও শিখিয়েছিলেন। এইভাবে তাঁদের যজ্ঞরক্ষার জন্যে উপযুক্ত করে তুলেছিলেন এবং তাঁদের দিয়ে যজ্ঞ রক্ষা করিয়েছিলেন।

রামলক্ষ্মণ একবারও ভাবেন নি যে, তাঁরা এক বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়ে বিদ্যাশিক্ষা করছেন। তাঁরা তো সেবাকাজের জন্যে কর্মক্ষেত্রে উপনীত হয়েছিলেন। কিন্তু সেবাকাজে রত থাকার কালেই তাঁরা উত্তম জ্ঞানলাভ করেছিলেন। জ্ঞান যাঁরা দিয়েছিলেন তাঁদেরও একথা মনে হয় নি যে, তাঁরা জ্ঞান দিচ্ছেন। আর যাঁরা জ্ঞানলাভ করেছিলেন তাঁরাও ভাবেন নি যে, তাঁরা জ্ঞানলাভ করছেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও উত্তম জ্ঞান দেওয়া হয়েছিল এবং উত্তম জ্ঞান লাভ করা হয়েছিল। নঈ-তালীমের আদর্শও এই। (মিরগানগুড়া, কোরাপুট, ১৬ই জুলাই, ১৯৫৫)

বিদ্যার তিন অঙ্গ

আজকালকার শিক্ষায় ছাত্ররা নানাবিষয়ে কিছু-কিছু জ্ঞান লাভ করে; কিন্তু স্বাধীনভাবে চিন্তা করার শক্তিলাভ করাই যে শিক্ষার মুখ্য উদ্দেশ্য, একথা তাদের বলা হয় না।

অনেকে বলেন যে, শিক্ষাক্ষেত্রে স্বাবলম্বনের বিশেষ গুরুত্ব আছে। শরীরশ্রমের দ্বারা উৎপাদন করতে শেখাতে হবে যাতে শিক্ষার্থী স্বাবলম্বী হতে পারে। কিন্তু স্বাবলম্বনের অর্থ আরও গভীর। শরীরশ্রম তো সকলের পক্ষে অবশ্য করণীয়। নিজের হাতে কাজ করার শিক্ষা সকলেরই পাওয়া চাই। প্রত্যেকে নিজের হাতে কাজ করলে জাতিভেদ থাকবে না এবং দেশের কল্যাণ হবে। এদ্বারা উৎপাদন বৃদ্ধি ও স্বাস্থ্যের উন্নতি হবে। এইজন্যে ন্যূনপক্ষে উপরোক্ত অর্থে শিক্ষায় স্বাবলম্বনের যোগ্যতা অর্জন করা তো নিশ্চয়ই উচিত। কিন্তু আমি শরীরশ্রমে বা শিল্পে স্বাবলম্বী হওয়াকে যথেষ্ট মনে করিনে।

প্রজ্ঞা স্বয়ম্ভূ হবে

আমার মতে শিক্ষাপ্রণালী এমনভাবে রচিত হওয়া উচিত এবং তারজন্যে এমন উপায় উদ্ভাবন করা উচিত যাতে ছাত্রের বিচারবুদ্ধি অনন্যনির্ভর হতে পারে এবং সে স্বাধীনভাবে চিন্তা করতে ও বিচার করতে সমর্থ হয়। স্বাধীন চিন্তাশক্তি জাগ্রত করা যদি শিক্ষার

মুখ্য উদ্দেশ্য হয়, তাহলে শিক্ষার স্বরূপ সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হয়ে যাবে। আজকাল স্কুল-কলেজে অনেক ভাষা ও অনেক বিষয় শেখানো হয়। প্রত্যেক বিষয়ে ছাত্রেরা বছরের পর বছর শিক্ষকদের সহায়তা লাভের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে। কিন্তু শিক্ষা এমন হওয়া চাই যাতে উপরের দিকে ছাত্রেরা অন্যের সহায়তা ছাড়াই শিখতে পারে। জ্ঞানের শেষ নেই। কিন্তু জীবনক্ষেত্রে যদিও অনন্ত জ্ঞানের ব্যবহারিক প্রয়োজনীয়তা থাকে না, তাহলেও পর্য্যাপ্ত জ্ঞানের আবশ্যকতা নিশ্চয়ই রয়েছে। তবে এ ধারণা ভুল যে, জীবনক্ষেত্রের জন্যে প্রয়োজনীয় শিক্ষা স্কুলে লাভ করা যায়। জীবনের জন্যে প্রয়োজনীয় জ্ঞান জীবনক্ষেত্রেই লাভ করতে হবে। আর জীবনক্ষেত্র থেকে জ্ঞান লাভ করবার শক্তিসৃষ্টি করাই বিদ্যালয়ের কাজ।

বিদ্যা মৌলিক বস্তু

ছেলেদের মাতাপিতা বিদ্যালয়ের শিক্ষা সমাপ্ত করাতে চান, কারণ তাহলে চাকরি পাওয়া সহজ হয় এবং সুখে-স্বচ্ছন্দে কাল কাটানো যায়। কিন্তু শিক্ষার প্রতি আর্থিক দৃষ্টিভঙ্গী অতিশয় ভ্রান্ত। বিদ্যা জীবনের এক মৌলিক বস্তু। বিদ্যাকে মুক্তির সোপান বলা হয়। বর্তমানকালে মুক্তির অর্থ স্বাবলম্বন। আমরা যখন অন্য অবলম্বন থেকে, অন্য আশ্রয় থেকে মুক্ত হই, তখনই স্বাবলম্বী হই। যিনি প্রকৃত বিদ্যালাভ করেন, তিনি যথার্থ মুক্ত ও স্বাধীন হন। তাই শরীরের জন্যে যথার্থ শিক্ষার প্রয়োজন আর তার জন্যে কোন না-কোন শিল্প শেখাতে হবে। এ হল

স্বাবলম্বনের ন্যূনতম অঙ্গ। আর নব-নব জ্ঞান লাভ করার শক্তি অর্জন করা স্বাবলম্বনের এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

ইন্দ্রিয় সংযম

মুক্তির জন্যে তৃতীয় অন্য এক বস্তুর প্রয়োজন রয়েছে, যা শিক্ষার আরেক অঙ্গ। পরাধীনতা যেমন মুক্তির পরিপন্থী, তেমন বিকারবশ্যতা বা প্রবৃত্তির দাসত্বও মুক্তির পরিপন্থী। যে-ব্যক্তি আপন ইন্দ্রিয়ের দাস এবং কামক্রোধাদিকে বশীভূত করতে পারে না, সে স্বাবলম্বী বা মুক্ত নয়। ইন্দ্রিয়-সংযম এই কারণে বিদ্যার তৃতীয় অঙ্গ। এইজন্যে সংযম, ব্রত, সেবা প্রভৃতিকে শিক্ষাপ্রণালীর অন্তর্ভুক্ত করতে হয়।

স্বাবলম্বনের তাৎপর্য

উপরোক্ত তিন অর্থে স্বাবলম্বনকে বুঝতে হবে। স্বীয় অন্ন-সংস্থানের জন্যে পর-নির্ভর না হওয়া—এ হল প্রথম অর্থ। জ্ঞান অর্জনের জন্যে স্বাধীন শক্তির উদ্ভব—এ হল দ্বিতীয় অর্থ। আর তৃতীয় অর্থ হচ্ছে—আত্মসংযমের শক্তি, অর্থাৎ ইন্দ্রিয় ও মনঃসংযমের শক্তি অর্জন করা। শরীরের পরাধীনতা ও মনের পরাধীনতা দুই-ই পাপ। উদরের জন্যে শরীর পরাধীন হয়। এজন্যে উৎপাদক-শ্রমের সাহায্যে নিজের জীবিকানির্বাহ করার শক্তি অর্জন করতে হবে। যে-মানুষের বুদ্ধি, চিন্তা ও বিচার স্বাধীন নয়, সে পরাধীন। এই কারণে মানুষের স্বাধীনভাবে চিন্তা করার শক্তি অর্জন করা দরকার। মন ও ইন্দ্রিয়ের দাসত্ব হতে মুক্ত হওয়ার শক্তিও শিক্ষা থেকে লাভ করা চাই।

মাতাপিতা সন্তানদের শিক্ষা সম্পর্কে যদি এই তিন আদর্শ সামনে রাখেন, তাহলে তাঁরা যথার্থ সুখী হবেন। যদি সন্তান সুখী ও সমর্থ হয় এবং সন্তানের জন্যে সমাজে সম্মান লাভ হয়, তবেই মাতাপিতার প্রকৃত সুখ। ছেলের চাকরি ও বিবাহের ব্যবস্থা হলেই সব হয়ে গেল, একথা মনে করা ঠিক নয়।

—(তেরুবলী, কোরাপুট, ২০শে আগষ্ট, ১৯৫৫)

চব্বিশ-ঘণ্টা আনন্দ

বিদ্যার লয়

বিদ্যালয়ের দুই অর্থ হতে পারে। এক অর্থে বিদ্যালয় হল সেইস্থান যেখানে বিদ্যার লয় অর্থাৎ লোপ হয়। আর দ্বিতীয় অর্থে বিদ্যালয় হল এমন স্থান যা বিদ্যার ঘর, আলয় বা বাসস্থান।

প্রথম অর্থের বিদ্যালয় আমাদের দেশে হাজার-হাজার আছে। সে-সব বিদ্যালয়ে ছেলেরা পরীক্ষা দেওয়ার জন্যে পড়াশুনা করে। এ যেন জোলাপ নেওয়া। এভাবে জ্ঞানের রেচন হয়ে সমস্ত জ্ঞান নিঃশেষে বেরিয়ে যায়। যে-পরীক্ষার্থী শতকরা ৮০ নম্বর পেয়েছে, তাকে ১৫ দিন পরে প্রশ্ন করে দেখা গেল যে, সে উত্তর দিতে পারে না। আমি নিজেই তা পরীক্ষা করে দেখেছি। সেই ছেলে আমাকে বলল যে, ১৫ দিন পর সে অনেক ভুলে গেছে। বলল যে, পরীক্ষার জন্যে সে অনেক কিছু তৈরী করেছিল। পরীক্ষা হয়েছিল

১৮ তারিখ, এই পরীক্ষাই যদি ১৭ তারিখ হত তাহলেও সে ১০।১৫ নম্বর কম পেত। শিক্ষকেরা জানেন যে, তাঁদের বিদ্যালয়ে বিদ্যার লয় হয়। তবে তাঁরা বলেই থাকেন, 'আমরা যদি ১০০৲ টাকার বিদ্যা দিই আর ছাত্ররা তা থেকে ৩০৲ টাকার বিদ্যা আয়ত্ত করতে পারে, তাহলেই যথেষ্ট হল। শতকরা ত্রিশ পেলেই তো আমরা ছাত্রদের পাশ করে দিই।'

বিদ্যালয়ের কার্যক্রম

বিদ্যালয়ের কার্যক্রম কি রকম হওয়া উচিত এ এক প্রশ্ন। এখন সে-সম্বন্ধে কিছু বলছি। বিদ্যালয়ে ঈশ্বরের আনন্দস্বরূপ প্রকাশিত হওয়া চাই। তাঁর অনন্ত রূপের মধ্যে তিনটি রূপ সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ। প্রথম সত্য, দ্বিতীয় চিৎ অর্থাৎ জ্ঞান আর তৃতীয় আনন্দ। কর্মযোগে, জীবনক্ষেত্রে ও সংসারে সত্য প্রধান। জ্ঞানীদের নির্জন সাধনকক্ষে এবং গ্রন্থরাজি পরিবৃত বিদ্বৎজনের গৃহে জ্ঞান প্রধান। আর ভক্তিমার্গে আনন্দ প্রধান। বিদ্যালয় হল ভক্তিমার্গ, অর্থাৎ সেখানে যত কাজ করা হবে তা আনন্দের জন্যেই করা হবে।

ভোজনের আনন্দ

যাঁরা ভক্তিমার্গে চলেন না তাঁরাও খাওয়াতে আনন্দ পান, কিন্তু রান্নাতে আনন্দ পান না। বিদ্যাশ্রমে ছেলেমেয়েরা আনন্দের জন্যে রান্না করবে, রুটি ফুলতে দেখে তাদের আনন্দ হবে। উনুনে কাঠ জ্বলছে আর সেই আগুনে দুধ উথলে উঠছে দেখে তাদের খুব মজা লাগবে। ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে বেললে রুটি কেমন গোল হয়, চাল ফুটবার সময় হাঁড়িতে দানাগুলি কেমন নাচতে থাকে, এসব দেখে

ছেলেমেয়েদের কত-না আনন্দ হবে। এসব আনন্দ উপভোগ করবার জন্যেই তারা রান্না করবে আর খাবেও আনন্দ পাওয়ার জন্যেই। আনন্দলাভের জন্যে তারা পরিমাণ মতো খাবে। তরকারীতে যদি পরিমাণ মতো নুন না দিয়ে বেশী নুন দেওয়া হয়, তাহলে খাওয়াতে কী করে আনন্দ পাওয়া যাবে? পরিমিত নুন দিলে তরকারী খেতে ভাল লাগে। আবার খাওয়ার সময় যদি পেটের মধ্যে কেবল ঠুসে ভরে দেওয়া হয়, অর্থাৎ খাওয়া যদি অতিরিক্ত হয়, তাহলে তাতে আনন্দ পাওয়া যাবে না। পেটে ব্যথা হবে, চোখের জল ফেলতে হবে, ডাক্তার ডেকে বিশ্রী ওষুধ খেতে হবে। এত সব কষ্ট ভুগতে তো আমরা চাইনে। আমরা তো খাব আনন্দের জন্যে। অন্যেরা যেমন উদরপরায়ণ হয়ে কষ্ট ভোগ করে, আমরা সেভাবে খাব না। আমরা আনন্দের জন্যে খাব আর খেয়ে উঠে মজা করে বাসন মাজব।

ঘুমাবার আনন্দ

অলস লোকেরা রাত্রি ১০টা-১১টা পর্যন্ত জেগে থাকে, সিনেমা দেখে আর কষ্ট সহ্য করে। আমরা ঠিক রাত ৮টার সময় প্রকৃতির কোলে ঘুমিয়ে পড়ব। দুর্ভাগা লোকেরা অনেক দেরীতে ঘুমায় আর দুঃস্বপ্ন দেখে—যেন এক রাক্ষস বুকের উপর বসে আছে। আমাদের ঘুম এত গাঢ় হবে যে, স্বপ্ন দেখব না, নিদ্রায় গভীর আনন্দ লাভ করব। আমাদের সারাদিনের কার্যক্রম খুব আনন্দের হবে আর কাজ শেষ হওয়া মাত্র ৮টা কি সাড়ে ৮টার ঘণ্টা বাজলেই তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়ব।

বুদ্ধগয়াতে একবার সর্বোদয়-সম্মেলন হয়েছিল। সেখানে দিনের বেলা বহু জ্ঞানালোচনা হল আর রাত্রিবেলা লোকেরা আনন্দ করতে চাইলেন। তাঁরা বললেন, রাত্রিবেলা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হবে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, কখন আরম্ভ হবে? তাঁরা বললেন, ৮টার সময় আরম্ভ হয়ে ২-ঘণ্টা চলবে। তাতে আমি বললাম, 'সেখানে যাওয়ার আমার ইচ্ছা নেই, কারণ ২-ঘণ্টার সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আমার পক্ষে যথেষ্ট নয়। আমার সাংস্কৃতিক কার্যক্রম ৮টার সময় আরম্ভ হবে আর রাত তিনটা পর্যন্ত চলবে। আমি টানা সাত ঘণ্টা ঘুমাব। এখন নিদ্রাই হল সবচাইতে বড় সাংস্কৃতিক কার্যক্রম, নিদ্রার আনন্দ থেকে বঞ্চিত হওয়ার ইচ্ছা আমার নেই।'

ব্রহ্মবেলার আনন্দ

শেষরাত্রে চারটার সময় ঘুম থেকে ওঠা কতই-না আনন্দদায়ক! শীতের মধ্যে উঠে দৌড়ালে শীতও দৌড়ে পালিয়ে যায়। ঘুমিয়ে থাকলে শীত আমার সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে থাকে। শরীর হি-হি করে কাঁপতে থাকে। উঠে বসলে শীতও উঠে আমার পাশে বসে, দৌড়াতে আরম্ভ করলে শীত দৌড়ে চলে যায়। সকালে উঠে দৌড়ালে কাজে খুব উৎসাহ আসে। তাই খুব ভোরে ওঠার আনন্দ আর দৌড়াবার আনন্দ আমরা ছাড়ব না।

জলখাবার

সূর্যোদয়ের পর শরীর পরিষ্কার করব। চোখ, কান, নাক ধোব। শহরের লোকেরা তো মুখ ধোয়ার আগেই চা খান। আগের দিনের বাসন না মেজে তাতে কী করে রান্না করা যাবে?

আমাদের মুখও তো একটা বাসনই? নোংরা মুখে কী করে চা খাওয়া যায়? এতে দাঁত খারাপ হয় আর মুখের সব ময়লা পেটে চলে যায়। ভাল-ভাল খাবারের সঙ্গে এসব ময়লাও পেটে চলে যায়। এতেই তো অসুখ হয়। দাঁত তুলে ফেলতে হয়। এইজন্যে ভোরে উঠে শরীর স্বচ্ছ নির্মল করতে হবে। তা না করে খাওয়া উচিত নয়। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে অল্প-স্বল্প জলখাবার খাব। একশ'রকম জিনিস পেটে ঢালব না। নানারকম জিনিস একসঙ্গে খেলে পেট বুঝতেই পারবে না কি করে হজম করবে। এক হাঁড়িতে ডাল, রুটি, তরকারী একসঙ্গে চাপিয়ে দিলে কি রান্না হয়? কোন জিনিস ২-ঘণ্টায় হজম হয়, আবার কোন জিনিস হজম হতে ৪-ঘণ্টা লাগে। কোনটা বা ৬-ঘণ্টা লেগে যায়। শুধু ডালভাত খেলে ৪-ঘণ্টায় হজম হয়ে যাবে। দুধ ২-ঘণ্টায় হজম হবে। তাই সব জিনিস একসঙ্গে পেটে ঢাললে ভারী গোলমাল হয়ে যায়। এইজন্যে সকালের জলখাবার অল্প এবং হাল্কা হওয়া দরকার।

চাষের আনন্দ

জলখাওয়ার পর আমরা আনন্দ করতে-করতে কোদাল নিয়ে ক্ষেতে যাব। অনেকক্ষণ কৃষিকাজ করব। নানারকমের মজার-মজার কাজ হবে। কোথাও কিছু রোপণ করতে হবে, কোথাও ছোট গাছে জল দিতে হবে, কোথাও কিছু কাটতে হবে, আবার কখনও-কখনও একজায়গার মাটি কেটে নিয়ে অন্য জায়গায় ফেলতে হবে। ক্ষেতে কোথাও উঁচু থাকে, কোথাও গর্ত থাকে। উঁচু-নীচু জায়গা থাকলে ক্ষেত হবে না, তাই উঁচু জায়গা কেটে সব সমান করতে

হবে। ছোটকালে চাষে আনন্দ পেতে শিখলে বড় হয়ে নানাবিষয়ে আনন্দ উপভোগ করতে পারবে।

পড়বার আনন্দ

এরপর ছাত্রেরা পড়বার আনন্দ, লেখবার আনন্দ, কিছু স্মরণ-রাখবার আনন্দ, গান করবার আনন্দ, ছবি আঁকবার আনন্দ—এসব বিচিত্র আনন্দ উপভোগ করবে। এরকম করে সব মিলিয়ে ২৪-ঘণ্টা আনন্দের কার্যসূচী রচিত হবে। এর নামই ভক্তিমার্গ। বিদ্যালয়ের কার্যক্রম এরকমই হওয়া উচিত।

ছুটির প্রশ্নই নেই

আজকালকার স্কুল তো মিল কিম্বা খনির মতো। লোকেরা ছেলেদের সেইরকম স্কুলে ভর্তি করে দেয় আর ৮-ঘণ্টা ছেলেরা সেখানে থাকে। সকাল ১০-টা থেকে বিকাল ৪টা পর্যন্ত এক দুঃখজনক কার্যসূচী। ১-ঘণ্টা খেলাধূলা, আমোদ আহ্লাদের জন্যে দেওয়া হয়। স্কুলে তো হাতের কাজও নেই, পায়ের কাজও নেই। পাঁচ ঘণ্টা বসে থাকতে-থাকতে ছেলেদের বিরক্ত ধরে যায়। এইভাবে ৬-দিন স্কুলে যাওয়ার পর বেচারারা ১-দিন ছুটি পায়। অর্থাৎ ৬-দিন কষ্ট আর ১-দিন ছুটি। আমাদের স্কুলে ছুটি থাকবে না। কারণ, এখানে কষ্টও নেই, ছুটিও নেই। আমাদের কার্যক্রম হবে আনন্দে ওতোপ্রোত।

—(কুজেন্দ্রী, কোরাপুট (উড়িষ্যা), ১৬ই সেপ্টেম্বর, ১৯৫৫)

লেখাপড়ার ক্লাস এবং শ্রবণের ক্লাস

আজকালকার পাঁচ-ঘন্টাব্যাপী শিশুদের বিদ্যালয়গুলিতে সময়ের অপব্যবহার হয়। শিশুদের পাঁচ-ঘণ্টা অনবরত লেখাপড়ায় রত রাখলে, তাদের পক্ষে বোঝাটা অতিরিক্ত হয়ে পড়ে। তাছাড়া এইসব স্কুলে গরীবলোকের ছেলেমেয়েরা পড়তে পারে না। এই-জাতীয় স্কুলের শিক্ষা অকেজো হয়। এইজন্যে আমার মনে হয়েছে যে, শিশুদের একঘণ্টার স্কুল হওয়া বাঞ্ছনীয়! এই স্কুল খুব সকালে বসবে। তাহলে ছেলেমেয়েরা সারাদিন অন্য কাজ করবার সময় পাবে এবং গ্রামের ধনী-নির্ধন সকলের ছেলেমেয়েরাই এই স্কুলে আসতে পারবে। এইভাবে সকালে লেখাপড়ার ক্লাস হবে। অনুরূপভাবে সন্ধ্যায় প্রাপ্তবয়স্কদের জন্যে শ্রবণের ক্লাস হবে। এখানে লেখা বা পড়া শেখানো হবে না। রামায়ণ ও ভাগবত জাতীয় বই থেকে পড়ে শোনানো হবে। কখনও কখনও মহাপুরুষদের জীবনীও পড়া হবে। তাছাড়া গ্রামের সমস্যাসম্বন্ধে আলোচনা হবে এবং কৃষি প্রভৃতি সম্বন্ধীয় উন্নতপ্রণালী ও জ্ঞানের কথা বলা হবে। এখানে ভজন, কীর্তনও শোনানো হবে। এক ঘন্টার শ্রবণের ক্লাস এইভাবে চলবে। এইভাবে সারাজীবনব্যাপী জ্ঞানার্জনের ব্যবস্থা হতে পারবে। যতদিন লেখাপড়ার বয়স থাকবে ততদিন সকলে সকালের ক্লাসে যাবে, পরে যখন লেখাপড়া শেষ করে সংসারে প্রবেশ করবে তখন সন্ধ্যাবেলার ক্লাসে। এই দুই

স্কুলের কোন স্কুলেই ছুটির দরকার হবে না। তার কারণ প্রতিদিন মাত্র একঘণ্টা স্কুল চলবে। দৈনিক পাঁচ-ঘণ্টাব্যাপী স্কুলগুলিতে বছরে ৬ মাস ছুটি থাকে, তাতে বাৎসরিক হিসাবে ঐসব স্কুল প্রকৃতপক্ষে দৈনিক আড়াই ঘণ্টাব্যাপী স্কুলে পরিণত হয়ে যায়। আমাদের স্কুল বৎসরের প্রতিদিনই বসবে, তাই পাঠ ভুলে যাওয়ার কোন সম্ভাবনা থাকবে না। যেমন দৈনিক আহার গ্রহণের দ্বারা শরীরের পুষ্টিসাধন হয়, যেমন দৈনিক স্নানের দ্বারা শরীর স্নিগ্ধ ও পরিষ্কার রাখা হয়, তেমনি মনের বিকাশের জন্যে প্রতিদিন কিছু কিছু অধ্যয়ন করা প্রয়োজন। একথা যুক্তিসঙ্গত মনে হয়। এইজন্যে জ্ঞানরূপ ভোজনব্যবস্থার মধ্যে ছুটির ব্যবস্থা হতেই পারে না। কিন্তু একসঙ্গে প্রতিদিন পাঁচ-ঘণ্টা লেখাপড়ায় রত থাকতে হয় বলে অতিরিক্ত শ্রমলাঘবের জন্যে ছুটি অবশ্য প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে। তার পরিবর্তে এইভাবে অল্পখরচে এক বছরের মধ্যে সারা ভারতবর্ষে একঘণ্টার স্কুল প্রতিষ্ঠিত হতে পারে।

একঘণ্টার স্কুলে যিনি অধ্যাপনা করবেন, তিনিও দিনের বেলা নিজের কাজকর্ম করতে পারবেন। এই কারণে শিক্ষকের বেতনের জন্যে খরচ খুব বেশী হবে না। তিনি প্রতিদিন গ্রামবাসীদের এক-ঘণ্টা সেবা করবেন আর গ্রামবাসীরা প্রতিদিন তাঁদের ফসলের একাংশ শিক্ষককে দেবেন। এইভাবে প্রায় বিনাখরচেই এই স্কুল চলবে বলে মনে হয়। এই একঘণ্টার স্কুলের পঠনীয় বিষয় কি কি হবে? কৃষি, কুটিরশিল্প ও গ্রামজীবনের নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম সম্বন্ধে শিক্ষাদান—এই সকল স্কুলের শিক্ষার অঙ্গ হবে। রাঁধা-

খাওয়া প্রত্যেক গৃহস্থের বাড়ীতে হয় ; এ হবে শিক্ষাদানের একটি বিষয়। খাদ্যবিজ্ঞান প্রভৃতি এর মাধ্যমে শেখানো যাবে। গ্রামের আর একটি কর্তব্য সর্বাঙ্গীন পরিচ্ছন্নতা। এই বিষয়টিও জ্ঞানদানের এক মৌলিক বিষয় বলে বিবেচিত হবে। যদি গ্রামে কোন রোগের প্রাদুর্ভাব হয় তাহলে রোগ প্রতিকারের উপায় ও রোগ বিস্তারের প্রতিষেধক হিসাবে যা-যা কাজে লাগানো হবে, তা শিক্ষারও অঙ্গীভূত হবে এবং তাতে রোগাদি বিষয়ে জ্ঞানলাভ হবে। গ্রামে কারও মৃত্যু হলে, এই ব্যাপারকেও শিক্ষাদানের কাজে লাগাতে হবে। অতিবৃষ্টিতে ফসল উৎপাদনে বিঘ্ন হয়েছে—এই ব্যাপার অবলম্বন করে এতদসম্বন্ধীয় নানা জ্ঞান দান করা হবে। গ্রামের উৎসবাদি, বিবাহ প্রভৃতি অনুষ্ঠান জ্ঞানপ্রাপ্তির উপায় হবে। গ্রামের একজনকে ক্ষেপা কুকুরে কামড়িয়েছে বা গ্রামে কোন ঝগড়া হয়েছে, এসব বিষয় নিয়েও আলোচনা হবে এবং সংশ্লিষ্ট নানাজ্ঞান পরিবেশন করা হবে। এইভাবে গ্রামের দৈনন্দিন জীবনের প্রত্যেক ঘটনা ও বিষয় জ্ঞানপ্রাপ্তির উপায় হিসাবে গ্রহণ করা হবে।

মাত্র একঘণ্টায় এত বিষয়ের জ্ঞান কি করে দেওয়া যাবে এবিষয়ে সন্দেহ উপস্থিত হতে পারে। কিন্তু আমি অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি যে, দৈনিক সকালে একঘণ্টা আর সন্ধ্যায় একঘণ্টা এই দুই-ঘণ্টার পঠন-পাঠনদ্বারা বহু বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া যেতে পারে। আমি যে সব ছেলেদের কয়েক বছর ধরে পড়িয়েছি তাদের মধ্যে অনেককেই একঘণ্টার বেশী পড়াইনি। কিন্তু দৈনিক একঘণ্টা পঠন-

পাঠনের দ্বারা তারা সুশিক্ষিত হয়েছে এবং বর্তমানে সমাজের সার্থক সেবকরূপে কাজ করছে। সান্ধ্যকালীন স্কুল যদিও প্রাপ্তবয়স্কদের জন্যে, তবু সেই স্কুলে অল্পবয়স্কদের আসায় বাধা হবে না। যারা সন্ধ্যার স্কুলে যোগ দেবে, তারা সকালের পঠন-বর্গের আর সন্ধ্যার পঠনবর্গের এই দুই ক্লাসের দ্বারাই উপকৃত হবে। রোজ দুঘণ্টা লেখা, পড়া আর শোনায় যে-লাভ তাই তাদের হবে।

গ্রামোন্নয়ন সমিতি কর্তৃক ব্যবস্থিত বিভিন্ন কুটিরশিল্পের প্রয়োগ-সংস্থায় শিল্পাদি শিখবার কাজে ছেলেরা বাকী সময় নিয়োগ করতে পারবে। তাছাড়া নিজ-নিজ কৃষিক্ষেত্রে চাষের কাজও তারা শিখতে পারবে। ব্যবহারিক ক্ষেত্রে কৃষি-শিল্পাদি ব্যবস্থার ভার স্কুল নেবে না, সে কাজের ভার থাকবে গ্রাম-পঞ্চায়েত বা গ্রামোন্নয়ন সমিতির উপর। এই কারণে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে শিক্ষার ব্যয় স্কুলের বহন করতে হবে না, এই ব্যয়ভার গ্রামোন্নয়ন সমিতি বহন করবে। এই জাতীয় স্কুলে শিক্ষালাভের ব্যয় খুব কম হবে অথচ শিক্ষার্থীরা হাতে-কলমে কাজ শিখে বিশেষ দক্ষতা লাভ করতে পারবে।

সন্ধ্যাবেলার গুরুত্ব

প্রাতঃকালে (যে-সময় একঘণ্টা পঠন চলবে) মন বিশেষ প্রসন্ন থাকে। এই অবস্থায় বিদ্যার্থী সহজে পাঠে মন দিতে পারবে এবং একাগ্রচিত্তে বিদ্যাভ্যাস করতে পারবে। সন্ধ্যাবেলার শ্রবণ-বর্গে মনোরঞ্জন অনুষ্ঠান, গল্প বলা, ভাগবত-কথা এবং সঙ্গীতাদি হবে। এই সমস্তের মাধ্যমে যে-জ্ঞানলাভ হবে, তাতে কোনপ্রকারের শ্রান্তি আসবে না। শ্রবণ-বর্গে গল্প ও কথা প্রভৃতি শোনাবার

পর প্রতিদিন একটি সুমধুর ভজন শোনানো হবে এবং ভজনের ব্যাখ্যা শোনানো হবে। এই সব কথা চিন্তা করতে-করতে বালক বৃদ্ধ সকলে ঘরে ফিরে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়বে। শাস্ত্রকারেরা বলেছেন, ভক্তির সঙ্গে ঈশ্বরের নাম করতে-করতে যাঁর মৃত্যু হয়, তাঁর পরম শান্তি লাভ হয়। শেষ সময় এমনই গুরুত্বপূর্ণ। অন্তিমকালে অন্তর হাল্কাভাবে পূর্ণ হওয়া উচিত নয়। যদি অন্তিমকালে হৃদয় ঈশ্বর-ভক্তিতে পূর্ণ থাকে, যদি অন্তরে শান্তি থাকে, তাহলেই পরজন্ম উত্তম ও পরম শান্তিময় হয়। জীবনান্তের এই-যে নিয়ম, এ নিয়ম দিনান্তের পক্ষেও প্রযোজ্য। দিনের অন্তে রাত্রিবেলা মানুষ নিদ্রামগ্ন হয়। ভেবে দেখলে বোঝা যায় যে, এ-ও একরকমের মৃত্যু। অর্থাৎ নিদ্রা মানুষের দৈনিক মৃত্যু। আগামী দিন ভগবান দয়া করে যদি আমাদের নিদ্রাভঙ্গ করেন, তাহলেই জেগে উঠব, নইলে নিদ্রার মধ্যেই জীবনের সমাধি হবে। এইজন্যে নিদ্রাকে দৈনিক মৃত্যু বলা যায়। নিদ্রার পূর্বে ভগবৎ ভক্তিতে তন্ময়তার প্রভাব গভীর ও সুদূরপ্রসারী। এইভাবে তন্ময় হয়ে যিনি নিদ্রিত হন, তাঁর নিদ্রা স্বপ্নহীন হয় এবং নিদ্রার অন্তে তাঁর মন উৎসাহে পূর্ণ হয়। তাই নিদ্রামগ্ন হওয়ার আগের সময় অর্থাৎ দৈনিকের অন্তিম সময়টি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হয়। এই কারণে সান্ধ্য-কালীন শ্রবণ-বর্গ একটি সুমধুর ভজনের পর শেষ হলে ভাল হবে। তাহলে গ্রামের আবালবৃদ্ধবনিতা প্রতি রাত্রে নিদ্রামগ্ন হওয়ার পূর্বক্ষণে ঈশ্বর-ভক্তির সুন্দর ভাবের মধ্যে মগ্ন হয়ে থাকতে পারবে, ঈশ্বরতন্ময়তার মধ্যে ধীরে-ধীরে পরম জননীর ক্রোড়ে নিদ্রিত হতে

পারবে। এই প্রকারে যদি শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা যায়, তাহলে অল্প ব্যয়ে প্রতি গ্রামে সার্বজনীন শিক্ষার ব্যবস্থা দ্রুত করা সম্ভব হবে।

প্রাতঃকালীন ও সায়ংকালীন বিদ্যালয়ে যিনি একঘণ্টাকাল পঠন-পাঠনের ভার গ্রহণ করবেন, গ্রামের লোকেরা সংবৎসর তাঁকে কিছু-কিছু শস্য দেবে। কিন্তু যদি গ্রামের শিক্ষক সম্পত্তিদান করার মতো গ্রামের লোকের সেবার জন্যে প্রেমভাবে ভাবিত হয়ে একঘণ্টা বুদ্ধিদান করতে সম্মত হন, তাহলে শস্যাদিতে যে-খরচ হবে তাও না-হওয়া সম্ভব। এই অবস্থায় শিক্ষক নিজে কিছু চাইবেন না, কিন্তু যদি তাঁর প্রয়োজন মিটাবার জন্যে গ্রামবাসীরা সারা বছর কিছু দেন, তবে তিনি ভগবানের প্রসাদরূপে তা গ্রহণ করবেন। এইরকম স্কুলে যদি গভর্ণমেণ্ট পুস্তকাদি দান করতে চায়, তাহলে তা নিশ্চয়ই করতে পারে। একাজ গভর্ণমেণ্টের অবশ্য কর্তব্য কাজ বলে আমি মনে করি। গ্রামবাসীরাও নিজেদের পাঠ সাঙ্গ হলে ব্যক্তিগত পুস্তকগুলি স্কুলে দিয়ে দেবেন। এইভাবে নিজেদের গ্রামস্থ পঠন-বর্গ ও শ্রবণ-বর্গের উন্নতিসাধন করাকে প্রত্যেকে সৌভাগ্যের কাজ বলে মনে করবে।

—[সর্বোদয়পুরম (কাঞ্চীপুরম) ৩১মে, ১৯৫৬]

প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন—আপনার প্রস্তাবিত একঘণ্টাব্যাপী স্কুলে কি ছেলেদের শিক্ষা পুরাপুরি হবে? গ্রামবাসীরা দেহের দিক থেকে যেমন অর্ধভুক্ত,

মাত্র একঘণ্টা লেখাপড়া হলে মনের দিক থেকেও কি তারা অর্ধভুক্ত হয়ে পড়বে না ?

বিনোবা—প্রতিদিন একঘণ্টাব্যাপী বৌদ্ধিক পঠন-পাঠন (বুদ্ধির চর্চা) ছেলেদের শিক্ষার জন্যে পর্যাপ্ত বলে মনে করি। গ্রামের যিনি শিক্ষক হবেন, তিনি অন্যান্য গ্রামবাসীদের মতোই শরীর-শ্রম দ্বারা নিজের জীবিকা অর্জন করবেন্। এতে বাকী সময়ে তিনি গ্রামবাসীদের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত থাকবেন, যার ফলে ছেলেরা অন্য সময়ও তাঁর সংস্পর্শে আসবে এবং কিছু-না-কিছু জ্ঞানলাভ করতে পারবে। অবশ্য তা না হলেও দৈনিক একঘণ্টার নিয়মিত পাঠ ছেলেদের শিক্ষার জন্যে যথেষ্ট। যতটা সময় খাওয়ার জন্যে অর্থাৎ শরীরে আহার্য পাঠাবার জন্যে প্রয়োজন হয়, ঠিক ততটা সময় শিক্ষার জন্যে অর্থাৎ বুদ্ধি ও মনের খোরাক জোগাবার পক্ষে যথেষ্ট—এই স্থির সিদ্ধান্তে আমি উপনীত হয়েছি। দিনের অবশিষ্ট সময়টা যায় ভুক্তবস্তু পরিপাকের জন্যে। দিনে তিনবার খেলে দেড় ঘণ্টার বেশী লাগে না। বুদ্ধির খাদ্য সংগ্রহের জন্যেও এর চাইতে বেশী সময় লাগা উচিত নয়। একঘণ্টা ভাল করে পড়ালে যতটা পড়ানো যায়, ততটা হজম করতে অর্থাৎ মনন ও অভ্যাস করতে ছেলেদের অনেক সময় লাগে। আজকাল অনেকে ভাবেন যে, শিক্ষার অর্থ হচ্ছে জ্ঞানের তথ্য যোগানো। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে শিক্ষা-যে তথ্য যোগানো নয়, একথা ভাল করে বুঝে নিতে হবে। শিক্ষাদানের প্রকৃত অর্থ হচ্ছে শিক্ষার্থীর অন্তরে জ্ঞানপ্রাপ্ত হওয়ার জন্যে শক্তি সঞ্চার করা। এই কার্যে সফলতা

লাভ করলে অর্থাৎ শিক্ষার্থীর জ্ঞান-পিপাসা জাগ্রত করতে পারলে পরবর্তী কাজ সহজ হয়ে যায়। তখন শিক্ষার্থী নিজেই সেই কাজ সম্পন্ন করতে সমর্থ হয়। সুতরাং শিক্ষার জন্যে দৈনিক একঘণ্টাই যথেষ্ট একথা বুঝতে হবে।

তাছাড়া এখনকার পাঁচঘণ্টাব্যাপী স্কুলগুলি বছরে ৬ মাস ছুটি থাকার দরুন এমনিতেই ২॥০ ঘণ্টাব্যাপী স্কুলে পরিণত হয়ে গেছে। এইসব স্কুলে মধ্যে-মধ্যে ছুটি হওয়াতে ছেলেদের পাঠ্য বিষয় আয়ত্ত করতেও বেশী সময় লাগে। আমাদের পাঠশালা তো দৈনিক একঘণ্টা ছেদহীনভাবে চলবে। এইসব পাঠশালার শিক্ষকেরা বর্তমানের প্রাইমারী স্কুলের শিক্ষকদের চাইতে অনেক বেশী যোগ্যতাসম্পন্ন হবেন। আমি দেখছি, আজকালকার শিক্ষা ব্যবস্থায় বিপরীত ব্যাপার চলছে। যেখানে প্রাইমারী স্কুলগুলিতে সবচেয়ে ভাল-ভাল শিক্ষক থাকা উচিত, সেখানে সবচেয়ে যাদের যোগ্যতা কম এমন সব শিক্ষক দেওয়া হয়। সুতরাং সবদিক বিবেচনা করলে দেখা যাবে যে, আমাদের একঘণ্টার স্কুলে শিক্ষা বিন্দুমাত্র কম হবে না।

প্রশ্ন—আপনার সিদ্ধান্তানুযায়ী উপরোক্ত পাঠশালা নিম্নক্লাসের শিক্ষার জন্যে পর্যাপ্ত হতে পারে, কিন্তু এই জাতীয় বিদ্যালয় কি উচ্চ শিক্ষাদানের জন্যে যথেষ্ট মনে করা যায়?

বিনোবা—আমি ছোটছেলেদের সরাসরি উপনিষদ পড়িয়েছি। কাজেই প্রত্যেক দিন একঘণ্টা পড়িয়ে কঠিন-কঠিন বিষয়ও শেখানো যায়। কিন্তু পূর্বোক্ত একঘণ্টার পাঠশালায় যে-শিক্ষা দেওয়া হবে, তা হচ্ছে বুনিয়াদী বা প্রাথমিক শিক্ষা। এই একঘণ্টার শিক্ষার

তুলনা যদি করতে হয়, তবে তা করতে হবে এখনকার চার বা পাঁচঘণ্টাব্যাপী প্রাইমারী শিক্ষার সঙ্গে। আমাদের দেখতে হবে এইসব চার-পাঁচঘণ্টাব্যাপী পাঠশালায় ছাত্রদের যতটা তৈরী করা হয়, উপরোক্ত একঘণ্টার স্কুলে ততটা তৈরী করা যায় কি-না। এছাড়া আমি বলেছি যে, গ্রামে-গ্রামে য়ুনিভার্সিটি প্রতিষ্ঠিত হওয়া চাই। একঘণ্টার স্কুল তো সর্বসাধারণের প্রাথমিক শিক্ষার জন্যে। সর্বসাধারণের জন্যে কেবলমাত্র প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা সম্পূর্ণ করতে পারলেই আমাদের সন্তুষ্ট হওয়া উচিত। যদি প্রত্যেক গ্রামে মানুষ জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত বাস করে যাবতীয় কর্ম সম্পন্ন করতে থাকে, তাহলে প্রত্যেক গ্রামেই সর্বাঙ্গীন শিক্ষার ব্যবস্থা থাকা চাই। প্রাথমিক শিক্ষা হবে গ্রামে, তার চেয়ে উচ্চস্তরের শিক্ষা হবে জেলাতে, তার চেয়ে উচ্চশিক্ষা হবে বড়-বড় শহরে, আরও উচ্চশিক্ষা অন্য বিশেষ কোন স্থানে—এরকম সিদ্ধান্ত ভ্রান্তিপূর্ণ। যখন জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সমস্ত ব্যবস্থা গ্রামে হতে পারে, তখন নিশ্চয়ই মানুষের সকলপ্রকার শিক্ষার উপকরণ গ্রামেই মজুত আছে। এতে আর সন্দেহ কি? এইজন্যেই আমি বলি এবং বিশ্বাস করি যে, গ্রামে বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বপ্রকারের শিক্ষাব্যবস্থা হওয়া সম্ভব এবং তা হওয়া উচিতও।

প্রশ্ন—আপনি যা বললেন, তা দর্শনশাস্ত্র, অর্থশাস্ত্র, ইতিহাস প্রভৃতি সম্বন্ধে খাটতে পারে। এসমস্ত বিষয়ে উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থা গ্রামে-গ্রামে হওয়া সম্ভব, একথা বুঝতে পারছি। কিন্তু বিজ্ঞান এবং উচ্চ টেকনিকাল শিক্ষা এবং সেইসব বিষয়ের গবেষণার ব্যবস্থা

হওয়া কি গ্রামে-গ্রামে সম্ভব হবে? প্রত্যেক গ্রামে ঐ সমস্তের জন্যে প্রয়োজনীয় সামগ্রী সংগ্রহ ও পরীক্ষাগার প্রভৃতি স্থাপন করা কি করে সম্ভব হবে?

বিনোবা—'প্রত্যেক গ্রামেই য়ুনিভার্সিটি প্রতিষ্ঠিত হবে'—একথার অর্থ এই নয় যে, প্রত্যেক গ্রামেই সব বিষয়ের উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থা হবে। বর্তমানের য়ুনিভার্সিটিগুলিতেও কি তা সম্ভব হচ্ছে? প্রত্যেক য়ুনিভার্সিটিতে তো প্রত্যেক 'ফ্যাকাল্টী' বা প্রত্যেক বিষয়েরই উচ্চশিক্ষা ও গবেষণার ব্যবস্থা হয় না। অন্যান্য সব সুবিধা সমান থাকলেও দুটি বিশ্ববিদ্যালয়ের যেটিতে অধ্যাপকেরা যোগ্যতর সেই বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার জন্যেই ছাত্রেরা আগ্রহান্বিত হয়। এরকম ব্যাপার গ্রাম্য বিশ্ববিদ্যালয়েও ঘটবে। সাধারণ বিষয়গুলির সর্বোচ্চ শিক্ষাব্যবস্থা প্রত্যেক গ্রামেই থাকবে, কিন্তু যেখানে বিশেষ কোন বিষয় শিখবার ব্যবস্থা অন্যান্য জায়গার তুলনায় সহজতর হবে, সেই জায়গায় সেই বিষয়টি শিখবার বিশেষ ব্যবস্থা থাকবে। যথা, অরণ্যবহুল অঞ্চলে বন-বিজ্ঞান বা উদ্ভিদ্-বিজ্ঞান বা ঔষধি-বিজ্ঞানের 'ফ্যাকাল্টী' থাকবে। এই 'ফ্যাকাল্টী' প্রত্যেক গ্রামীন বিশ্ববিদ্যালয়ে হওয়া সম্ভব হবে না। এই প্রশ্নটি অন্যদিক থেকেও বিবেচনা করা যায়। সবসময় বাইরের উপকরণ ও যন্ত্রাদির উপর নির্ভর করতে হয় না এমন অনেক বৈজ্ঞানিক উচ্চশিক্ষার কথা আমরা জানি। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে যে, জ্যোতিষশাস্ত্র অধ্যয়ণের জন্যে প্রতিদিন দূরবীণের সহায়তায় জ্যোতিষ্কাদি নিরীক্ষণ করার প্রয়োজন হয় না। মধ্যে-মধ্যে দূরবীণের

ব্যবহারই জ্যোতিষ-বিজ্ঞান শিক্ষার পক্ষে যথেষ্ট। সুতরাং গ্রামে-গ্রামে দূরবীণ না থাকলেও জ্যোতিষবিজ্ঞানের অধ্যয়ন-অধ্যাপনা প্রত্যেক গ্রামেই হওয়া সম্ভব। কোন কেন্দ্রীয় স্থানে দূরবীণ রাখা যেতে পারে এবং প্রয়োজনানুসারে চতুর্দিকের গ্রামের সকলেই সেটা ব্যবহার করতে পারে।

গবেষণার জন্যে তিনটি বিষয়ের প্রয়োজন হয়—তত্ত্বজ্ঞান, পরিশ্রম করার অভ্যাস ও দক্ষতা, এবং (পরীক্ষা) experiment-এর জন্যে প্রয়োজনীয় উপকরণ ও যন্ত্রাদি। গ্রামে তত্ত্বজ্ঞান আয়ত্ত করার পথে কোন বাধা হবে না, এ সম্বন্ধে আমি নিঃসন্দেহ। গ্রামের লোকেরা প্রত্যেক কাজ নিজের হাতেই করেন, সেজন্যে শ্রমে কুশলতা লাভ করার পর্যাপ্ত সুযোগ গ্রামে পাওয়া যায়। অধিকাংশ প্রয়োজনীয় উপকরণের ও যন্ত্রাদির ব্যবস্থা প্রত্যেক গ্রামেই হওয়া সম্ভব, কারণ গ্রামে উন্মুক্ত প্রকৃতির নিকেতন নিত্য অবারিত হয়ে আছে। যে-সব উপকরণ সব জায়গায় পাওয়া যায় না, সে-সম্বন্ধে আগেই বিচার করেছি।

এইভাবে বিচার করলে দেখা যাবে যে, প্রত্যেক গ্রামেই উচ্চ-বিজ্ঞান শিক্ষার ও গবেষণার সুবিধা আছে। এই কারণে প্রত্যেক গ্রামেই এসকলের ব্যবস্থা হওয়া উচিত। এইসব বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিত্তিস্বরূপ হবে গ্রামে-গ্রামে ‘একঘণ্টার পাঠশালা’। এখন পর্যন্ত সাধারণের মধ্যে জ্ঞানপ্রচার খুব অল্পই হয়েছে। বিবিধ জ্ঞানের ব্যাপক প্রচার এবং সর্বসাধারণের জন্যে বিবিধ জ্ঞান-বিজ্ঞানের পথ উন্মুক্ত করে দিতে উপরোক্তভাবে চেষ্টা করতে হবে।

এইমাত্র ভজনে শুনলাম ভক্ত বলছেন, 'হে ঈশ্বর, তুমি আমার সাথী। আমি তোমার আশ্রয় নিয়েছি, তাই কিছুতেই আর ভীত হব না।' কিন্তু আজ দুনিয়ার বহু দেশেই এক মহাত্রাসের পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। এর কারণ কি? কারণ আমরা ঈশ্বরের উপর নির্ভর না করে শক্তির উপর নির্ভর করছি। এইজন্যে বড়-বড় দেশ অস্ত্রশস্ত্র বৃদ্ধি করার কাজে লেগে গিয়েছে। রাবণের কাছে অনেক অস্ত্রশস্ত্র থাকা সত্ত্বেও সে নির্ভয় হতে পারেনি। রামায়ণে রাবণের ভীত-অবস্থার অনেক বর্ণনা পাওয়া যায়। সাগরতীরে বানরসেনার আগমনে রাবণ অত্যন্ত ভীত হয়ে পড়ল। রাবণের বহু পরাক্রম এবং তার অধীনস্থ নানা অস্ত্রে সুসজ্জিত সৈন্যবাহিনীও তাকে ভয়ের হাত থেকে রক্ষা করতে পারেনি। আজ দুনিয়ার অবস্থা রাবণের মতো হয়েছে। বহুল পরিমাণে অস্ত্রসম্ভার যাদের আছে, তারাও যেমন ভীত হয়ে উঠেছে, যাদের অস্ত্রশস্ত্রের পরিমাণ অনেক কম তারাও তেমনি ভয়ে ভীত হয়ে পড়েছে। যাদের অস্ত্রশস্ত্র কম, তারা ভাবছে—কি করে আরও সমর-উপকরণ সংগ্রহ করি। যাদের কাছে আগে থেকেই যথেষ্ট সমরোপকরণ রয়েছে তারা কিভাবে আরো অস্ত্রশস্ত্র বাড়ানো যায়, সে কথা ভেবে চিন্তিত হয়ে পড়েছে। এইভাবে আজ সারা দুনিয়া ভয়ে ও উদ্বিগ্নে কাল কাটাচ্ছে।

সরকার ভয় উৎপন্ন করে

উপরে যে-ভয়ের কথা বললাম তারজন্যে সরকারসমূহই দায়ী। সরকারগুলি জনগণের রক্ষক হয়ে বসেছে। জনগণ-যে স্বাবলম্বী না

হয়ে সরকারের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে, সেজন্যেও সরকারই দায়ী। এই কারণে দেশের জনসাধারণ মনে করে যে, সরকার তাদের রক্ষা করবে। সরকারও মনে করে যে, বিপদে-আপদে জনগণের রক্ষার ভার সরকারের। ভারতবর্ষ, পাকিস্তান, রাশিয়া, আমেরিকা প্রত্যেক দেশেরই এই এক অবস্থা। আমেরিকা শক্তিশালী বোমা তৈরী করছে। আজকাল রাশিয়ায়ও ঐরকম বোমা তৈরী হচ্ছে। সম্প্রতি আমেরিকা হাইড্রোজেন বোমা প্রয়োগ করে দেখেছে, রাশিয়াও ২।৩ মাস আগে পরীক্ষামূলকভাবে হাইড্রোজেন বোমা বিস্ফোরণ করেছে। এই সকল দেশের জনসাধারণকে বোঝানো হয় যে, এই সব পরমাণবিক বোমা ব্যতীত দেশ রক্ষা করা যাবে না এবং এই কারণেই পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণ করা হচ্ছে। একথা বলা হয় যে, এই সব ভয়ানক অস্ত্রশস্ত্র আছে বলেই দুনিয়ায়ও শান্তিরক্ষা হচ্ছে। এসব বর্জন করলেই শান্তি বিঘ্নিত হবে। হায়! শান্তিও রক্ষিত হতে চায়! এর তাৎপর্য হচ্ছে এই যে, যখন শান্তির নিজের কোন শক্তি থাকে না, তখনই তাকে অন্যের শক্তিতে রক্ষা করতে হয়।

আমেরিকানরা নির্দয় বা করুণাবিহীন নয়। কিন্তু সেখানকার তরুণ-তরুণীদের এ কথাই শেখানো হয় যে, পরমাণবিক বোমাই পৃথিবীতে শান্তির রক্ষক, অর্থাৎ সমরোপকরণ করুণাময় হয়ে উঠেছে।

সরকার থেকে মুক্তি চাই

অল্পবয়স্কদের যা শেখানো হবে, তারা তো তাই শিখবে। বর্তমানকালে সকল দেশেই শিক্ষাদানের অধিকার সরকার নিয়ে

নিয়েছে। প্রত্যেক দেশের সরকার স্কুলের শিক্ষানীতি নিয়ন্ত্রণ করে। এই কারণে লোকমত গড়ে উঠতে পারে না। অর্থাৎ স্বাধীন জনমত গড়তে পারে না। এই কারণেই যাকে আমরা গণতন্ত্র বলি, তা নামেমাত্রই বিদ্যমান আছে। ভারতবর্ষ, পাকিস্তান, রাশিয়া, আমেরিকা, এইসব দেশে প্রত্যেক লোকেরই ভোটদানের অধিকার আছে। তৎসত্ত্বেও মুষ্টিমেয় লোকের হাতে সমগ্র ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হয়ে আছে আর অধিকাংশ লোক কয়েকজন লোকের কাজের সমর্থন করে। এঁরাই লোকমত গঠন করেন এবং জনগণের প্রতিনিধিত্ব করেন। এই কারণে যতদিন জনগণ এঁদের কবল মুক্ত না হচ্ছে, ততদিন জগতে শান্তি প্রতিষ্ঠা হওয়া সম্ভব নয়। তাই ভূদান-আন্দোলনে এই যুক্তির উদ্ভব হয়েছে যে, জনগণের সমস্যা-সমূহ লোকশক্তির সাহায্যে জনগণই সমাধান করে নেবে। ভূদান-আন্দোলনের এটাই বিশেষত্ব।

গভর্ণমেণ্টই ঈশ্বর

আজ রাস্তায় চলবার সময় এক বন্ধু 'সরকার এটা করেন না, ওটা করেন না' বলছিলেন। বন্ধুটি গ্রামে সেবার কাজ করেন। ভক্তদের সব বক্তব্যই ভগবানের নামে থাকে। যে-কোন বিষয় সম্বন্ধে তাঁরা বলুন না-কেন, ভগবানের নাম না নিয়ে বলবেন না। আমি লক্ষ্য করেছি কার্য-কর্তারাও ঐরকম করে থাকেন। প্রত্যেক ব্যাপারে গভর্ণমেণ্টের নাম না নিলে তাঁদের চলে না। ওঁদের যদি নির্দেশ দেওয়া যায় যে, গভর্ণমেণ্টের নাম উচ্চারণ না-করে তাঁরা যেন তাঁদের বক্তব্য বলেন, তাহলে তাঁরা কিছু বলতেই

পারবেন না। জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ যে-কোন বিষয়েই বলতে বলা হোক, তাঁরা গভর্ণমেণ্টের উল্লেখ করবেনই। বিবাহের আইন, সমাজ সংস্কারের ব্যবস্থা, ভূমি-বণ্টন, দেশরক্ষার ব্যবস্থা এ সকল তো সরকারেরই হাতে ; এছাড়া ঔষধের ব্যবস্থাও গভর্ণমেণ্টই করে থাকে। সরকার যা খাওয়ায় লোকের তাই খেতে হয়, যা শেখায় লোকের তাই শিখতে হয়। সরকার যাকে শিক্ষা বলে, তাকেই শিক্ষা বলে মানতে হবে। যাকে গভর্ণমেণ্ট অশিক্ষা বলবে তাকেই অশিক্ষা বলে মেনে নিতে হবে। আমাদের ভোট দেওয়া ছাড়া আর কিছুই করবার নেই। প্রত্যেক গ্রামের সংস্থাসমূহ গভর্ণমেণ্টই গড়ে দেবে। আমি বলতে চাই যে, এ বড় ভয়ানক অবস্থা। এ কথা ঠিক যে, বর্তমানে যাঁদের হাতে ক্ষমতা রয়েছে তাঁরা সজ্জন। কিন্তু মুষ্টিমেয় লোকের হাতে, তাঁরা সজ্জন হলেও, সমগ্র সমাজের ব্যবস্থার ভার থাকা উচিত নয়। সজ্জন লোকেরা পরামর্শ দেবেন, তাঁরা কাজ করাবেন না। কিন্তু বর্তমানকালে দুনিয়ার সর্বত্র গভর্ণ-মেণ্ট মা-বাপ হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমার বিশ্বাস যতদিন জগতে এই অবস্থা চলবে, ততদিন দুনিয়ায় শান্তি প্রতিষ্ঠার আশা নেই। কিন্তু আমাদের বন্ধুরাও আমাদের যুক্তি পুরাপুরি বুঝতে পারেন না। আমি তো যা সত্য বলে বুঝি, তা না বলে থাকতে পারিনে। এই সত্য লোকেরা গ্রহণ করে না। কিন্তু তাতে আমি বিচলিত হই না। আজ আমি যা বলছি লোকেরা (না মানলেও) তা শুনবে এবং কয়েক বছর পর (যখন দেখবে যে আমার কথাই ঠিক) বলবে যে, 'বিনোবা এমন বলতেন।'

চিন্তা ব্যাপক হোক, ক্ষমতা সীমাবদ্ধ

পুরাকালে ভারতবর্ষে জ্ঞানের যথেষ্ট উন্নতি হয়েছিল। শুধু তাই নয়, এই দেশেই জ্ঞানালোচনার আরম্ভ হয়েছিল। কিন্তু শিক্ষাব্যবস্থা রাজশক্তির অধীন কখনও ছিল না। বিদ্যাদানের প্রণালী গুরুই নির্ণয় করতেন। রাজা গুরুদের সহায়তা দিতেন। রাজপুত্রকেও গুরুগৃহে গিয়ে সাধারণ লোকের ছেলেদের সঙ্গে বাস করতে হত। বিদ্যার্থীরা যখন ভিক্ষার অন্বেষণে আশ্রমের বাইরে যেত রাজপুত্রকেও তখন তাদের সঙ্গে ভিক্ষায় বেরোতে হত। আশ্রমের ব্যয় নির্বাহার্থ রাজা সাহায্য করতেন, কিন্তু রাজপুত্রের ব্যয় নির্বাহার্থ গুরু পৃথক-ভাবে কিছু যাচ্ঞা করতেন না। এই ভাবে দেখা যায় যে, ভারতবর্ষে শিক্ষা রাজশক্তির অধীন ছিল না। অর্থাৎ শিক্ষা স্বাধীন ছিল। সংস্কৃতজ্ঞ ব্যক্তিরা হিন্দুধর্মের বিচার-স্বাধীনতার কথা জানেন। অন্য এমন কোন ধর্মের কথা জানিনে যাতে পরস্পর বিরোধী দার্শনিক তত্ত্বের অস্তিত্ব আছে। অন্যান্য প্রত্যেক ধর্মে মূল বিচারধারা এক ও অভিন্ন। কিন্তু হিন্দুধর্মে কপিল, কণাদ, জৈমিনি প্রভৃতির বিচার পরস্পর বিরোধী। কিন্তু এমন কথা কেউ বলেন না যে, এই সমস্ত তত্ত্ব হিন্দুধর্ম বিরোধী। আজকাল দেখছি তামিলনাদে এক নাস্তিকদলের উদ্ভব হয়েছে। কিন্তু এজন্যে যদি তাদের ধর্মহীন বলা হয়, তাহলে অন্যায় হবে। এদেশে চিন্তার স্বাধীনতা এমনই অনস্বীকার্য বস্তু ছিল। এর মূলে ছিল এদেশের স্বাধীন শিক্ষা-ব্যবস্থা। রাজশক্তির শাসন শিক্ষাব্যবস্থার উপর ছিল না। আজ তো যেমন সেনাবাহিনী সরকারের অধীন, শিক্ষাও তেমনি সরকারের

হাতের মুঠোয়। রাজশক্তির প্রভাব এমনই ব্যাপক হয়ে গেছে। সরকার যদি ব্যাপকভাবে চিন্তা করে, তবে জনগণের কল্যাণ হয়। পূর্বকালে রাজশক্তি সর্ববিষয়ে চিন্তা করত না, তাতে জনগণের পূর্ণ কল্যাণ হত না। কিন্তু রাজশক্তি ব্যাপক হওয়া উচিত নয়। পূর্বে চিন্তা ব্যাপক ছিল না। আজ সরকারের ক্ষমতা সর্বগ্রাসী হয়ে পড়েছে। এর উল্টো হওয়া উচিত। রাজশক্তির উচিত চিন্তা যাতে গভীর ও সুদূরপ্রসারী হয় তার চেষ্টা করা এবং তার শাসন ক্ষমতা যাতে সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হয় সেই ব্যবস্থা করা। পূর্বকালে শাসন-ক্ষমতাও সীমাবদ্ধ ছিল আর চিন্তার ক্ষেত্রও সীমাবদ্ধ ছিল। আমি বলছি যে, সরকারের চিন্তার ক্ষেত্র বহুবিস্তৃত হোক আর ক্ষমতাপ্রয়োগের ক্ষেত্র সীমাবদ্ধ হোক। (প্রাতঃকালের ভাষণ)

—[তেন্নেরী (চিঙ্গলপেট) ২৪শে মে, ১৯৫৬]

নঈ-তালীমের বিচার

বাপু বলতেন যে, এদেশের নঈ-তালীমই তাঁর সর্বোত্তম ও সর্বশেষ অবদান। বাপু কোন বিষয়েই অতিকথনে অভ্যস্থ ছিলেন না। তিনি ছাড়া এমন কোনও লোকের কথা আমার মনে পড়ে না, যিনি নিজের কথা সম্পূর্ণরূপে ওজন করে বলেন। সুতরাং নঈ-তালীম সম্পর্কে তাঁর উক্তির সম্পূর্ণ তাৎপর্য্যই তিনি ব্যক্ত করতে চেয়েছিলেন। বাপুর শ্রেষ্ঠ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তাঁর প্রতিভা ; অর্থাৎ

যুক্তিনিরপেক্ষভাবে অন্তর্নিহিত প্রজ্ঞার আলোকে কোথায় কি প্রয়োজন হবে, তা তিনি অনুভব করতে পারতেন। স্বরাজলাভের পর যে-সমস্ত বস্তুর অত্যন্ত প্রয়োজন, সেসবের প্রত্যেকটিই তিনি প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন। বাপু বুঝেছিলেন যে, রাজ্য-পরিবর্তনের সঙ্গে-সঙ্গে পতাকা-পরিবর্তনের মতোই নতুন শিক্ষার প্রবর্তন করা প্রয়োজন হবে।

'নঈ-তালীম' নামের অর্থ

বাপু এই শিক্ষাকে 'নঈ-তালীম' কেন বললেন ? 'নঈ বা নূতন' কথাটির তাৎপর্য কী ? শিক্ষা ও জ্ঞানের মৌলিক বস্তুটি সনাতন, তা নিত্য নতুন হয় না। কিন্তু যুগে-যুগে জ্ঞানালোচনা মন্দীভূত হয়ে পড়ে, সেই অবস্থায় যুগসন্ধিক্ষণে সনাতন জ্ঞানবস্তুকে নবরূপে প্রকাশিত করার প্রয়োজন হয়। সনাতন জ্ঞানের নবীনরূপই নতুন শিক্ষা নামে অভিহিত হয়।

সত্যকাম-জাবালের কাহিনী আমরা সকলেই জানি। শিষ্য যখন গুরুগৃহে উপস্থিত হলেন, তখন গুরু তাঁকে গোসেবারূপ মন্ত্র দিলেন। এই গোসেবা করতে-করতেই অবশেষে তিনি জ্ঞানলাভে সমর্থ হয়েছিলেন। তিনি কি করে গো প্রভৃতি পশু থেকে, পক্ষী থেকে জ্ঞানলাভ করলেন সেই সম্বন্ধে নানা গল্প উপনিষদে আছে। একদিন গুরু শিষ্যের মুখে জ্ঞানের-দীপ্তি দেখতে পেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুই কোথা থেকে জ্ঞান পেলি ?' শিষ্য উত্তর দিলেন, 'অন্যে মনুষ্যেভ্যঃ' ! মনুষ্যেতর অন্য গুরু তিনি পেয়েছিলেন। মানুষের কাছ থেকেই কেবল জ্ঞানলাভ করা যায়—মানুষের এই অহংকার

অনুচিত। বস্তুত মনুষ্যরূপী গুরু থেকে আমরা যে জ্ঞানলাভ করি, তা সমগ্র জ্ঞানের অংশমাত্র।

বাধ্যতামূলক শিক্ষা

বিনা বেতনে বাধ্যতামূলক শিক্ষার উপায় উদ্ভাবনের চিন্তা করা হয়ে থাকে। আমি অনেক সময় পরিহাস করে বলি, সেই ব্যবস্থা হয়েই তো গেছে। ভগবানই সেই ব্যবস্থা করে রেখেছেন। সেই মহান ব্যবস্থা মানুষকে বাঁচিয়ে রেখেছে। শিক্ষার ব্যবস্থা না করে ভগবান মানুষকে সৃষ্টি করেন—এ কখনও সম্ভব নয়। গভর্ণমেণ্ট গঠিত হওয়ার পর সেই গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক অবৈতনিক ও বাধ্যতা-মূলক শিক্ষা প্রবর্তিত হবে ভগবান যদি এতটা নির্ভরশীল হতেন, তাহলে সৃষ্টি লোপ পেয়ে যেত। কিন্তু ভগবান তা করেননি। তিনি মানুষের মস্তিষ্কে বুদ্ধি দিয়েছেন, পেটে ক্ষুধা দিয়েছেন আর হৃদয়ে সকলের জন্যে সহানুভূতি দিয়েছেন। সহানুভূতিশীল হৃদয়, বুদ্ধি-যুক্ত মন এবং ক্ষুধার্ত উদর—এই তিনটি হল বিধাতাপ্রদত্ত জ্ঞান আহরণের উপায়। ক্ষুধা উপশমের জন্যে মানুষকে পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হয়ে বুদ্ধিপ্রয়োগ করে কাজ করতে হয়। এই কাজ করতে গিয়েই মানুষ বিবিধ জ্ঞানলাভ করে থাকে। যদি ভগবান পেটে ক্ষুধা না দিতেন, তাহলে কোন তালীমীসংঘ আর গভর্ণমেণ্টের জ্ঞানদান করার সাধ্য ছিল না। আমি এই শিক্ষাকেই বাধ্যতামূলক শিক্ষা বলি। যদি আমাদের এই শিক্ষা না হত তাহলে আমাদের পেটের ক্ষুধা মিটত না, হৃদয়ের সহানুভূতি শুকিয়ে যেত আর বুদ্ধিও স্থির হত না।

অবৈতনিক শিক্ষা

ভগবানের ব্যবস্থায় যে-মায়ের গর্ভে সন্তানের জন্ম হয়, সেই মায়ের কাছেই শিশু বিনাব্যয়ে মাতৃভাষা শিখে নেয়। গভর্ণমেণ্টের এজন্যে এক পয়সাও খরচ হয় না। আমি একে অবৈতনিক শিক্ষা-ব্যবস্থা বলি। এভাবে ভগবান অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষার ব্যবস্থা করেছেন। এরপর যে-কাজ বাকী রইল, তা হচ্ছে গণিতের শূন্যের মতো। একথা বোঝা দরকার। এইজন্যে আমি অনেকবার বলেছি যে, যদি কেউ নিজেকে শিক্ষাদাতা মনে করেন, তাহলে তাঁকে বুঝতে হবে যে তাঁর নিজেরই শিক্ষার আরও প্রয়োজন আছে।

শিক্ষাদান কথাটি ভুল

ভারতবর্ষের একটি বিশেষ শব্দের মধ্য দিয়ে আমরা ভারতীয় মনোবৃত্তি বুঝতে পারি। ভারতীয় সংবিধানে যে-১৪টি ভাষা স্বীকার করা হয়েছে, তার কোনটিতেই 'শেখানো'র অর্থে কোন শব্দ নেই। 'শেখা' এই অর্থ ব্যক্ত করার জন্যে শব্দ আছে। শেখাতে সাহায্য করা এই অর্থে 'শেখা' শব্দ থেকে 'শেখানো' শব্দটির কৃত্রিমভাবে সৃষ্টি হয়েছে। ইংরেজীতে 'টীচ্' একটি মৌলিক শব্দ। এই রকম 'শেখানো' অর্থে কোন মৌলিক শব্দ আমাদের ভাষায় নেই। আমরা শিখতে পারি, শিখতে অন্যকে সাহায্য করতে পারি, কিন্তু 'টীচ্' করতে পারিনে। ইংরেজীতে 'লার্ণ্' ও 'টীচ্' বলে দুটি স্বতন্ত্র ক্রিয়া আছে। এই 'টীচ্' ক্রিয়াটি আমি বলব অধ্যাপকের অহংকার-প্রসূত। যতদিন আমাদের এই অহংকার থাকবে, ততদিন আমরা শিক্ষার মূলতত্ত্বটি বুঝতে পারব না। এইজন্যে সংসারে একজনও

অশিক্ষিত মানুষ নেই, এই ধারণা নিয়ে আমাদের কাজ আরম্ভ করতে হবে।

কে অশিক্ষিত ?

আজকাল তো একজন সাধারণ ম্যাট্রিক পাশ ছেলে একজন দক্ষ কাঠের মিস্ত্রীকে বেকুব মনে করে। মিস্ত্রীর বাড়ী গিয়ে ছেলেটি বলে—এই শোন্, আমাদের বাড়ী কাজ করবি ? তোর মজুরি কত নিবি ? 'তোর মজুরি কত'—এভাবে প্রশ্ন করা হয় ; 'মহাশয় আপনার মজুরি কত' এভাবে নয়। এক শিক্ষিত কারিগর যিনি সমাজের সেবা করছেন এবং যিনি একজন অভিজ্ঞ ব্যক্তি, তাঁকে কেবলমাত্র লেখাপড়া করেননি বলে 'তুই' সম্বোধন করা হয় !

ভগবানের দর্শন

পয়গম্বর মহম্মদ সম্বন্ধে এক সুন্দর গল্প আছে। মহম্মদ ঈশ্বর-দর্শনের জন্যে তপস্যারত অবস্থায় ঈশ্বরের কাছ থেকে এক পত্র পান। মহম্মদ লেখাপড়া জানতেন না, তাই তিনি ভগবানের কাছে প্রার্থনা করে বললেন, 'হে ভগবান আমি তো মূর্খ, লেখাপড়া জানিনে। তোমার চিঠি কি করে পড়ব ? তুমি আমাকে দর্শন দাও।' তখন ঈশ্বর স্বয়ং তাঁকে দর্শন দিলেন। এই ঘটনার পর মহম্মদ সকলকে বলতেন, 'দেখ, আমি যদি লেখাপড়া জানতাম, তাহলে ভগবানের দর্শন পেতাম না। শুধু তাঁর চিঠিই পড়তে পেতাম। আমি লেখাপড়া জানিনে, এইজন্যে আমার ঈশ্বর দর্শন হয়েছে।' আমি কৃষকদের এক সভায় একটি প্রশ্ন করেছিলাম। আমি বলেছিলাম, "আপনারা নিজেরা পরিশ্রম করেন, ভাল করে

চাষ করে ক্ষেত তৈরী করেন। যখন এই ক্ষেতগুলি রোদে ঝলমল করতে থাকে, তখন সেই রৌদ্রস্নাত কৃষিক্ষেত্রগুলিতে ঈশ্বরের দর্শন হয়। আপনাদের মধ্যে যাঁরা রৌদ্র-জল-কৃষিক্ষেত্রের মধ্যে ঈশ্বর-দর্শন করেছেন, তাঁরা হাত তুলুন।" এইকথা বলামাত্র প্রত্যেকে হাত তুলে জানালেন যে, তাঁদের ঈশ্বর দর্শন হয়েছে। একজনও এমন কৃষক সেখানে উপস্থিত ছিলেন না, যাঁর ঈশ্বর দর্শন সম্বন্ধে সংশয় ছিল। তাঁদের সকলেরই ঈশ্বর দর্শন হয়েছিল। বৃষ্টির জলধারার মধ্যে শুধু তাঁরা ঈশ্বর দর্শন করেন না, পরন্তু তাঁদের এমন উপলব্ধি হয় যে, ঈশ্বর স্বয়ং স্পর্শ দেওয়ার জন্যে তাঁদের কাছে এসেছেন। এই দর্শন যাঁদের হয় না, আমরা তাঁদেরই বলি শিক্ষিত। ভগবান এইরকম শিক্ষিতদের হাত থেকে আমাদের রক্ষা করুন!

নিরহঙ্কার হওয়া প্রয়োজন

শিক্ষককে নিরহঙ্কার হয়ে শিক্ষা দিতে হবে। শিক্ষক সেবার ভার নিয়ে শিক্ষাকার্যে ব্রতী হবেন। নম্রতার সঙ্গে তাঁকে এই সেবার কাজটি করতে হবে, আবার শিক্ষার্থীকেও নম্রতার সঙ্গে শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। শিক্ষক ও শিক্ষার্থী উভয়েই নম্র হবেন। তাঁরা পরস্পরের বন্ধু হবেন। এই আদর্শ স্মরণ করে প্রাচীনকালে শিক্ষক ও শিক্ষার্থী একসঙ্গে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করতেন আর বলতেন, "তেজস্বিনাবধীতমস্তু"—আমাদের তুজনের অধ্যয়ন জ্যোতির্ময় হোক। এতে 'নৌ'-শব্দটি দ্বিবচন। অর্থাৎ শিক্ষক মনে করতেন না যে, তিনি অধ্যাপনা করছেন, তিনিও অধ্যয়ন করছেন একথাই ভাবতেন। আর শিক্ষার্থী তো অধ্যয়ন করছেনই।

দ্বিবচন প্রয়োগ করার তাৎপর্য এই যে, শিক্ষক ও শিক্ষার্থী দুজনে একসঙ্গে জীবনযাপন করছেন একসঙ্গে অধ্যয়ন করছেন। শিক্ষার্থী মনে করতেন শিক্ষক তাঁকে সহায়তা দিয়ে উপকার করছেন আর শিক্ষক মনে করতেন শিক্ষার্থী তাঁকে সহায়তা দিয়ে উপকার করছেন। পরস্পরের কাছে উপকৃত দুই বন্ধু যেমন আচরণ করেন, শিক্ষক ও শিক্ষার্থী শিক্ষাদান ও গ্রহণে ঠিক তেমন আচরণই করবেন—এই কথা মনে করে 'নঈ-তালীমে' পুস্তকের স্থান গৌণ করা হয়েছে। এতে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা ভীত হয়ে পড়েন। তাঁরা মনে করেন পুস্তকের উপর বেশী নির্ভর না করলে জ্ঞান-সাধন পর্যাপ্ত হয় না। জ্ঞানলাভে পুস্তকের কিছু প্রয়োজনীয়তা আছে, এসম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু শিক্ষাব্যাপারে পুস্তকের সহায়তা নিতান্তই গৌণ। শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর একত্র জীবনযাপনই এই ক্ষেত্রে মুখ্য বস্তু। অর্থাৎ শিক্ষক শিক্ষা দিচ্ছেন আর শিক্ষার্থী শিক্ষা গ্রহণ করছেন, এই জাতীয় ভেদ ঘুচিয়ে দিয়েই শিক্ষাকার্য আরম্ভ হওয়া উচিত।

'নঈ-তালীমে'র দ্বিতীয় সিদ্ধান্ত এই যে, এতে জ্ঞান ও কর্মের 'ভেদ', 'বিরোধ' ও 'বিবাদ' মিটে যায়। আমি এই তিনটি শব্দ এইজন্যে ব্যবহার করেছি যে, আজকাল সংসারে সমস্ত তত্ত্বজ্ঞানেই জ্ঞান কর্মের ভেদ বা জ্ঞান কর্মের বিরোধ নিয়ে আলোচনা থাকে। কেউ বলেন, জ্ঞান কর্ম থেকে ভিন্ন। কেউ বলেন, জ্ঞানের সঙ্গে কর্মের বিরোধ আছে। আর এইভাবে ভিন্ন-ভিন্ন তত্ত্বজ্ঞান অনুযায়ী বিভিন্ন দল গড়ে উঠেছে।

শিক্ষা-প্রয়োগ

'নঈ-তালীম' মনে করে যে, জ্ঞান এবং কর্ম একই বস্তুর দুটি রূপ। এইজন্যে নঈ-তালীমে জ্ঞান-কার্য চলছে, না কর্ম-যোগ চলছে, তা বোঝা যায় না। একদিক থেকে দেখলে মনে হবে জ্ঞান-কার্য চলছে, আবার ভিন্ন দিক থেকে দেখলে মনে হবে কর্ম-যোগ চলছে। এই দুটিরই অস্তিত্ব যে-শিক্ষাব্যবস্থায় রয়েছে তাকে 'শিক্ষা-প্রয়োগ' নামে অভিহিত করা যায়। যেখানে মনে হবে কেবল মাত্র জ্ঞান-কার্য চলছে বা কর্ম-যোগ চলছে, সেখানে শিক্ষার প্রয়োগ হচ্ছে না। জ্ঞান ও কর্মের কোনটা চলছে এ কথা যেখানে বোঝা যায় না সেখানেই শিক্ষার বাস্তবিক প্রয়োগ হয়। আজকাল বুনিয়াদী-শিক্ষায় খুব মজার ব্যাপার হয়। জ্ঞান আর কর্মের যোগ করার জন্যে তকলী কাটার সঙ্গে-সঙ্গে তকলীর গানও গাওয়া হয়। কিন্তু তকলী কাটার সঙ্গে তকলীর গান গেয়ে জ্ঞান ও কর্মের ঐক্য ঘটানো যায় না। এই যোগসাধন অতি সূক্ষ্মতত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত। জ্ঞান আর কর্মের ভেদ, বিরোধই-বা কতদূর আর ঐক্যই বা কোথায়? 'নঈ-তালীম' এই বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত যে, জ্ঞান ও কর্ম অভেদ, কর্ম থেকে জ্ঞান লাভ হয় আর জ্ঞান থেকে কর্মের প্রেরণা পাওয়া যায় এবং এই দুইয়ের যোগে জীবন সার্থক হয়ে ওঠে। এইরকম ঐক্যসাধনের ব্যবস্থা 'নঈ-তালীমে' বর্তমান আছে।

কেউ-কেউ দুঃখ করে থাকেন যে, নঈ-তালীমে ছেলেদের দিয়ে শ্রমসাধ্য কাজ করিয়ে নেওয়া হয়। আমরা ঠিক করেছি যে, নানা রকমের ব্যায়াম করব, কিন্তু উৎপাদক-শ্রম কিছুতেই করব না।—

এই সিদ্ধান্তের পরিণাম কি হতে পারে তা ভেবে দেখা দরকার। স্কুলগুলিতে ছেলেরা সারাদিন বসে বসে লেখা-পড়া করার ফলে তাদের ক্ষুধা হবে না, এইজন্যে স্কুলে ব্যায়ামের ব্যবস্থা করা হয়! যখন ব্যায়ামাগারে সব ছেলেরা সার বেঁধে উঠ-বস্ করছে, তখন যদি কোন কৃষক এসে তা দেখেন, তো বলবেন, 'আরে, এদের কি কিছু কাজ নেই? এরা কি বেকার?' তখন এঁরা বলবেন, ক্ষুধা পাওয়ার জন্যে এই ব্যবস্থা করা হয়েছে! কৃষক উত্তরে বলবেন, 'কেন, ক্ষুধা লাগাবার চমৎকার ব্যবস্থা তো কৃষিক্ষেত্রেই হতে পারে। যদি হাতে কোদাল নিয়ে ক্ষেতে নেমে পড়ে, তো দেখতে না দেখতে ক্ষুধা পেয়ে যাবে।' কিন্তু হাতে কোদাল নিলে যে, ছেলেরা মজুর হয়ে যাবে! আর কোদাল না নিলে লোকে তাদের মজুর বলবে না, সেই পরিশ্রমকে বলা হবে ব্যায়াম। আর এইভাবে ভেদ বাড়তে থাকে।

আনন্দের ব্যবস্থা

আমি চব্বিশঘণ্টা জ্ঞান লাভ করতে চাই, চব্বিশঘণ্টা কাজ করতে চাই। আর চব্বিশঘণ্টা আনন্দ ভোগ করতে চাই। আমাদের কার্যক্রম ঘণ্টার সংখ্যা হিসাব করে হবে না, তা হবে চব্বিশঘণ্টা ব্যাপী। এইজন্যে আনন্দ শ্রম ও জ্ঞান থেকে বিচ্ছিন্ন থাকবে না। আমাদের শিক্ষার মন্ত্র যদি এক কথায় বলতে হয়, তো আমি বলব সেই বাক্য হবে 'সচ্চিদানন্দ'। 'সৎ' হচ্ছে কর্মযোগ, এ ছাড়া জীবন রক্ষা হয় না। 'চিৎ' হচ্ছে জ্ঞান যোগ, এ ছাড়া জীবন জড়ত্ব প্রাপ্ত হয়। আর আনন্দ ছাড়া জীবন নীরস হয়ে যায়। এইজন্যে যে-শিক্ষায় সৎ, চিৎ ও আনন্দ, এই তিনেরই মিলন হবে, সেই শিক্ষাই

আসল শিক্ষা হবে। ইচ্ছা হয় একে 'নঈ-তালীম' বলা যেতে পারে বা 'পুরানী তালীম'।

ছাত্র ও অনুশাসনহীনতা

অন্য যে-কোন কাজে হুকুম চলতে পারে, হুকুম পালনও করা যেতে পারে, কিন্তু জ্ঞানের ব্যাপারে আদেশ বা শাসন চলতে পারে না। মনে করুন আপনার সামনে একটি গোলাকার বস্তু রয়েছে। এই গোলাকার বস্তুকে ত্রিকোণ বস্তু বলে ধারণা করা হোক—এ রকম আদেশ দেওয়া চলে না। এই জ্ঞানকার্যে আমার আদেশ বিফল হবে। যে-বস্তু গোলাকার তা অন্য কিছু বুঝাবার চেষ্টা সত্ত্বেও গোলাকারই প্রতীত হবে। জ্ঞানের বিষয়ে আজ্ঞা অকর্মন্য হয়ে যায়। একথা বোঝা চাই। এইজন্যে 'নঈ-তালীম' অনুশাসনের বিরেধী, অনুশাসন চালাবার বিরোধী। 'নঈ-তালীমে' বিদ্যার্থীদের পরিপূর্ণ মুক্তি দেওয়া হয়। দুনিয়ার সর্বত্র শাসনমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সময় যখন আসবে, তখন সমাজ শাসনমুক্ত হোক ; কিন্তু সমাজ শাসনমুক্ত হোক-না হোক বিদ্যার্থীদের জন্যে শাসনমুক্ত শিক্ষাব্যবস্থা করা নিতান্ত প্রয়োজন। স্বাধীনতালাভের অধিকারই বিদ্যার্থীদের শ্রেষ্ঠ অধিকার। এইকারণে আমাদের উত্তম গুরুরা বিদ্যার্থীদের উপদেশ দিতেন—

'যানি অস্মাকং সুচরিতানি তানি ত্বয়োপাস্যানি, নো ইতরাণি।' —'আমাদের সুকৃতিগুলি তোমরা অভ্যাস করবে, আমাদের যে-সকল কাজ ভাল নয়, তা তোমরা অনুকরণ করবে না।'

এইরূপ শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে থাকতে-থাকতে বিদ্যার্থীর অন্তরে

আত্ম-শাসনের ভাবনা উদিত হবে, এই আশাই আমরা করব। এবং নঈ-তালীমে কৃত্রিম অনুশাসন এসে পড়লে আমরা বাধা দেব। আজকের সমাজ কৃত্রিমভাবে রচিত হয়েছে। এ বৈষম্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। তাই নঈ-তালীমে শিক্ষাপ্রাপ্ত ছেলেরা এই সমাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করবে। গান্ধীজী 'বিদ্রোহী' হতে বলতেন না, বলতেন—'অন্যায়ের প্রতিকার করবে'। কিন্তু এই প্রতিকার যে বিনীতভাবে করতে হবে, সে সম্বন্ধে কোন দ্বিমত হতে পারে না। তবে প্রতিকার নিশ্চয়ই করতে হবে। এই 'বিনীতভাবে' কথাটি প্রয়োগ করার সঙ্গে-সঙ্গে আমার আর একটি কথা স্মরণ হচ্ছে— আমাদের প্রাচীন গ্রন্থাদিতে বিদ্যাকে বিনয় বলা হয়েছে। সংস্কৃতে 'শিক্ষা' ও 'বিনয়' এই দুটি শব্দ একার্থক। অমুক বিদ্যার্থীর শিক্ষা সমাপ্ত হয়েছে একথা বলতে গিয়ে বলা হত অমুক বিনীত হয়েছে। অর্থাৎ সত্যকারের শিক্ষা তাই হবে, যা পেলে বিদ্যার্থীর মধ্যে বিনয়ের উদয় হবে। তবে এই 'বিনয়' গোলামের নতিস্বীকার হবে না। বরং এই বিনয় সমাজের কুসংস্কারগুলির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার শক্তি যোগাবে। (নঈ-তালীম সম্মেলনের উদ্বোধনী ভাষণ)

—[সর্বোদয়পুরম্ (কাঞ্চীপুরম) ৩০শে মে, ১৯৫৬]

নঈ-তালীমের বৈপ্লবিক শিক্ষা

'নঈ-তালীম' এক বিশেষ শিক্ষাপদ্ধতি। পুরাতন দোষত্রুটিযুক্ত শিক্ষাপদ্ধতির স্থলে আমরা এ এক উত্তম শিক্ষাপদ্ধতি প্রবর্তন করতে চাইছি। পুরাতন শিক্ষাপদ্ধতি অতি প্রাচীন নয়, ইংরেজরা এদেশে আসবার পর এই পদ্ধতি প্রচলিত হয়। এই শিক্ষাপদ্ধতির বহু ত্রুটি, তবে দৃষ্টিভঙ্গী অনুসারে ভিন্ন-ভিন্ন লোকেরা এক-একটি ত্রুটির উপর জোর দিয়ে থাকেন। এই সকল ক্ষুদ্রবৃহৎ বহু ত্রুটির কথা আলোচনা করব না। আমার মতে এই পুরাতন শিক্ষাপদ্ধতি 'শিক্ষাপদ্ধতি' (তালীম) নামের যোগ্যই নয়, কেননা কোন একটি মানবগোষ্ঠীর উদ্দেশ্যে এই পদ্ধতি রচিত হয়নি। যে-শিক্ষাপদ্ধতি সামাজিক ঐক্যকে সম্মুখে রেখে রচিত হয় না, তা আর যাই হোক না-কেন শিক্ষাপদ্ধতি নামের যোগ্য নয়। ইংরেজের আগমনকালে ভারতবর্ষে যে-অবস্থা ছিল এবং পরবর্তীকালে ইংরেজ ভেদবুদ্ধির ভিত্তিতে যে-নতুন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত করেছিল, সেই অবস্থায় কোন দৃঢ়বদ্ধ সমাজের অস্তিত্ব থাকা সম্ভব ছিল না। গ্রামে-গ্রামে সমাজ বহুধা বিভক্ত হচ্ছিল, কোথাও-কোথাও এই ভেদ প্রবল হয়ে দেখা দিয়েছিল। যে-সকল স্থানে অস্পৃশ্যতাজনিত ভেদবুদ্ধি লোকের মনকে অধিকার করেছিল, সে-সকল স্থানে ঐক্যবদ্ধ গ্রামীণ সমাজ গঠন করা যেত না। এমন কি যে-সকল গ্রামে কয়েকটি জাতির লোক বাস করত. সে-সকল গ্রামেও সমাজকে ঐক্যবদ্ধ করা সম্ভব হত না। যে-স্থানে উচ্চনীচ ভেদভাব স্বীকৃত হয়, সে-স্থানেও সমাজের

লোকেরা একটি সমাজ গড়ে তুলতে পারে না। গ্রামদান-আন্দোলনের প্রচেষ্টায় আমরা যখন নানাস্থানে যাই, তখন এরূপ শতধাবিভক্ত সমাজের পরিচয় লাভ করি। যে-সকল গ্রামে একটি জাতির লোক কিম্বা দুই-তিনটি সমপর্যায়ভুক্ত জাতির লোক বাস করে, সাধারণত সেই সকল গ্রামেই গ্রামদান আন্দোলন সফল হয়।

একরস সমাজ চাই

যে-গ্রামে অনেক জাতির লোক বাস করে, সেই গ্রামে গিয়ে গ্রামদানের বিচারধারা (যুক্তিসমূহ) ব্যাখ্যা করলেও গ্রামদান প্রাপ্তি সহজ হয় না। কারণ, গ্রামদানের মূল যুক্তিই হল সমগ্র গ্রামকে একপরিবার বলে অনুভব করা। বিভিন্ন জাতির লোককে এক পরিবারভুক্ত বলে গণ্য করাকে যারা অধর্ম বলে মনে করে, তারা কী করে গ্রামদানের যুক্তি মেনে নেবে? যে স্বীকার করে যে সমগ্র গ্রামই এক পরিবারের অন্তর্গত, কেবল স্বার্থবুদ্ধিপ্রণোদিত হওয়ায় আমরা ভিন্ন হয়ে রয়েছি, তাকে একথা বুঝানো যেতে পারে। যে-ব্যক্তি গ্রামকে একপরিবারভুক্ত করাকে অধর্ম বলে জানে, তাকে গ্রামদানের মূলে যে-অর্থনৈতিক যুক্তিযুক্ততা রয়েছে তা বুঝাবার আগে বুঝাতে হবে যে, জাতিভেদ ধর্ম নয়, এর মধ্যে যথেষ্ট অন্যায় রয়েছে। সুতরাং যে-স্থানে ঐক্যবদ্ধ সমাজ সম্ভব, সে-স্থানে গ্রামদানও সম্ভব। বিভিন্ন জাতির এক-একটি গোষ্ঠী হতে পারে, সমাজ হতে পারে না। গোষ্ঠী ও সমাজে পার্থক্য আছে। আর যে-স্থানে সমাজ নেই, সেখানে শিক্ষা হতেই পারে না, অর্থাৎ যাকে আমরা লোকশিক্ষা বলি তা সম্ভব নয়। তবে যদি কোন ব্যাকরণের

স্কুলে ব্যাকরণ শেখানো হয় তবে তা শেখানো যেতে পারে। এ ভিন্ন প্রসঙ্গ। কিন্তু যাকে আমরা 'লোকশিক্ষা' বলে থাকি, যেখানে জীবনের অনেক বিষয়ই অন্তর্ভূক্ত হয়ে পড়ে, যাকে আমরা জীবন-শিক্ষা নাম দিতে পারি, তা একমাত্র একভাবে ভাবান্বিত (একরস) সমাজেই সার্থক হওয়া সম্ভব।

ভেদ-বিভেদ দূর করতে হবে

গত দুই-তিনশ বছর ধরে ভারতবর্ষে উপরোক্ত প্রকার সমাজের অস্তিত্ব ছিল না। এই কারণে যে-কোন কল্যাণকর শিক্ষার প্রবর্তন হলে, তাই নবশিক্ষারূপে পরিগণিত হবে। অর্থাৎ শত-শত বছর পর তাই হবে যথার্থ শিক্ষার সর্বপ্রথম আয়োজন। একথা বলার কারণ, নতুন শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তনের সঙ্গে-সঙ্গে গ্রামবাসীদের ঐক্যবদ্ধ করে পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন (একরস) করে তোলাই হবে নঈ-তালীমের অন্যতম উদ্দেশ্য। যতপ্রকার ভেদবুদ্ধি সংসারের নানাস্থানে দৃষ্টিগোচর হয়, তার সব কয়টিই আজ গ্রামে প্রবলভাবে দেখা দিয়েছে। অর্থাৎ ধনী নির্ধনের ভেদ, মালিক মজুরের ভেদ, ব্রাহ্মণ অব্রাহ্মণের ভেদ, হরিজন হরিজনেতরের ভেদ —সর্বপ্রকারের ভেদই বর্তমান রয়েছে। যতপ্রকারে সমাজ খণ্ড-বিখণ্ড করা সম্ভব, তার সবই গ্রামে বিদ্যমান। এইসকল ভেদ দূর করাই নঈ-তালীমের লক্ষ্য হবে। এতে নঈ-তালীমের শত্রুর অন্ত থাকবে না, তবু এসব উপেক্ষা করেই নঈ-তালীমকে অগ্রসর হতে হবে। এই সভাতে সকলে এর অনুকূলেই বলছেন। আমার সন্দেহ হয়, সম্ভবত নঈ-তালীম সম্বন্ধে লোকেরা ভুল বুঝেছেন।

বৈষম্যের রাজ্য অচল

যোগ্যতার সঙ্গে বেতনের বিশেষ সম্বন্ধ নেই। ক্ষুধা তথা প্রয়োজনানুসারেই বেতন ধার্য হওয়া উচিত। এবং যেহেতু বিভিন্ন মানুষের মধ্যে প্রয়োজনের তারতম্য অতিসামান্যই হয়ে থাকে, সেহেতু বেতনেও বিশেষ তফাৎ হওয়া উচিত নয়। বালকদের একথা বুঝানো হলে, অমনি তারা প্রধান শিক্ষক ও অন্যান্য শিক্ষকরা কত বেতন পান তা জানতে চাইবে। তখন তো আমরা আর জবাব খুঁজে পাব না। তাই আমাদের বিদ্যালয়ে সকলের বেতন প্রায় সমান হওয়া প্রয়োজন। বালকেরা সরকারী চাকুরীর স্তরের ন্যায্যতা সম্বন্ধেও প্রশ্ন করবে। এই প্রশ্নের উত্তরে বলা হবে, 'ভাই, এ ন্যায্য নয়।' প্রশ্ন হবে, 'তবে এ কেন প্রচলিত আছে?' উত্তরে বলা হবে, 'জোর করেই চালানো হচ্ছে।' এভাবে বুঝিয়ে দেওয়া সত্ত্বেও বালকরা বুঝতে পারবে যে, যারা অসাম্যের প্রশ্রয় দেয় তাদের কারো হাতে শাসনভার টিকতে পারে না। অসাম্য সহ্য করা ভিন্ন কথা, কিন্তু অসাম্যের রাজ্য যে চলতে পারে না এসম্বন্ধে বালকেরা স্থিরনিশ্চয় হবে। এই অবস্থায় তারা বিদ্রোহী না হয়ে আর কি করবে? অসাম্যের উপর প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রের পক্ষে এ নিতান্ত বিপজ্জনক। তবু সরকার এই শিক্ষাপদ্ধতি গ্রহণ করতে চান। তাঁদের এই ইচ্ছা তখনই শোভন হবে, যখন তাঁরা বর্তমানের দোষ-ত্রুটিগুলি সম্বন্ধে সচেতন হবেন এবং এসকল দোষত্রুটি নিরাকরণ করবার জন্যে বিশ্বাসপূর্বক নতুন শিক্ষাপদ্ধতি প্রবর্তন করবেন। পক্ষান্তরে যে-রাষ্ট্র সাম্যযোগী সমাজ গঠনের ঔচিত্য

সম্বন্ধে সন্দিহান হবে, তাকে জোরপূর্বক এই শিক্ষাব্যবস্থাকে বাধা দিতে হবে।

সর্বপ্রথম বৈষম্য মিটাও

নঈ-তালীমে ছাত্রদের শেখানো হবে যে, কোন-না-কোন শরীর-শ্রম বিনা বা ক্ষেতে কাজ না-করে খাওয়া নিতান্ত অন্যায়। এখন যদি এমন হয় যে, কয়েকটি জাতির লোক স্বহস্তে কাজ করা অধর্ম বলে মনে করে, তাহলে সে-সকল জাতির লোকেরা কি করে এই শিক্ষাকে স্বীকার করে নেবে? তাদের এর বিরুদ্ধাচরণ করতে হবে কিনা, আপনারাই বলুন। আমরা এও বুঝাব যে, প্রত্যেকেরই ভাগে কিছু জমি থাকা উচিত এবং প্রত্যেকেরই জমিতে চাষ করবার অধিকার আছে। কিন্তু ছাত্রেরা দেখবে যে, গ্রামে কেউ জমির মালিক ও কেউ ভূমিহীন এবং তারা বুঝবে যে, এরকম হওয়া অন্যায়। বর্তমানে সমাজের সকল ব্যবস্থাই যে ত্রুটিপূর্ণ একথা বুঝাবার সুযোগ নঈ-তালীমে আসবে, এসকল উদাহরণের দ্বারা আমি তাই বলতে চাই। সুতরাং বর্তমান সমাজ যদি নঈ-তালীম প্রবর্তনে সম্মত হয়, তাহলে বুঝতে হবে যে, সমাজ জেনে-শুনেই আত্মহত্যায় সম্মত হয়েছে। ছাত্রদের কাছে গুরু অপেক্ষা যোগ্য ব্যক্তি এ সংসারে আর কেউ নেই। আর তিনিই বলছেন গ্রামে অসাম্য থাকা নিতান্ত অন্যায়। এ শুনে ছাত্রেরা তৎক্ষণাৎ জিজ্ঞাসা করবে, 'আচ্ছা, তাহলে আমরা আপনার সঙ্গে মিলে এই অসাম্য দূর করবার চেষ্টা করি না কেন? আপনি আমাদের বৃথা গণিতাদি শিখাচ্ছেন। প্রথমে এই অসাম্যের হিসাব তো মেটাতে হবে, তারপর আমরা

অন্য অঙ্ক শিখব।' অর্থাৎ নঈ-তালীমের শিক্ষকদের গ্রামের অসাম্য দূর করবার কার্যক্রম শিক্ষণীয় বিষয়ের অন্তর্ভূক্ত করে নিতে হবে।

সকল দেশের ইতিহাসেই দেখা যায় যে, শিক্ষকদের অনুপ্রেরণার বলেই যুগে-যুগে রাষ্ট্রবিপ্লব সংঘটিত হয়েছে। সুতরাং বর্তমান সমাজ-ব্যবস্থা পরিবর্তন করে অর্থনৈতিক ও সামাজিক সাম্য স্থাপন করা অর্থাৎ এক রাষ্ট্রবিপ্লব ঘটানো নঈ-তালীমের অন্যতম উদ্দেশ্য হয়ে পড়ছে এবং নঈ-তালীম ক্রান্তির অঙ্গ হয়ে যাচ্ছে। এইজন্যে আমি বলেছিলাম যে গ্রামোদ্যোগ, ভূমির সমবণ্টন, জাতিভেদ ও সাম্প্রদায়িকতা দূরীকরণ এবং জীবনের মাধ্যমে বিদ্যার্থীদের শিক্ষাদান —নঈ-তালীমের এই চতুর্বিধ কার্যক্রমকে এক অখণ্ড কার্যক্রম বলে মনে করতে হবে। এই চার বিভাগকে মনে ধারণা করবার জন্যে এবং বুঝবার ও বুঝাবার জন্যে পৃথক করা যেতে পারে, কিন্তু কার্যকালে এদের পৃথক করা সম্ভব নয়।

এ শিক্ষা শাসনব্যবস্থার অবসান ঘটাবে

গতকাল কাকাসাহেব (কাকা কালেলকর) বলেছেন, 'বিনোবার কাজ হচ্ছে রাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার অবসান ঘটানো। এই ব্যাপারে নঈ-তালীমের প্রচেষ্টা বিনোবার কাজে যথেষ্ট সহায়তা করবে।' তিনি এক বিচিত্র ভাষায় আপনাদের সম্মুখে এই সিদ্ধান্ত উপস্থাপিত করেছেন সন্দেহ নেই। কিন্তু তিনি নঈ-তালীমের যথার্থ চিত্রই উপস্থিত করেছেন। কাঠ থেকে উৎপন্ন কীট কাঠকেই খায়, এই ঘটনার বর্ণনাচ্ছলে বুদ্ধদেব বলেছেন 'তত্থায় তমেব খাদতি'— উৎপন্নবস্তু উৎপাদক বস্তুকে ভক্ষণ করে।

অনুরূপভাবে যদি প্রচলিত রাষ্ট্রব্যবস্থা থেকে নঈ-তালীমের উৎপত্তি হয়ে থাকে, তাহলে 'নঈ-তালীম'ই এই রাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার অবসান ঘটাবে। সমাজ-কল্যাণের জন্যে আপনাদের জন্মদাতাকে স্বহস্তে অপসারিত করতে হবে, আপনাদের সম্মুখে এই গুরুতর কর্তব্য রয়েছে। যদি রাষ্ট্র-নায়কেরা এর সমীচীনতা অনুভব করে এতে সম্মতিদান করে থাকেন, তাহলে আমাদের অত্যন্ত আনন্দের কথা। আশা করি সকল দিক বিবেচনা করেই নঈ-তালীম প্রবর্তনের সম্মতি দেওয়া হয়েছে। কেননা কেবল বর্তমান সরকার যে এ চাচ্ছেন, তা নয়; এ সম্পর্কে কংগ্রেসেরও এক প্রস্তাব আছে। কংগ্রেসের প্রস্তাব বিশেষ মূল্যবান। সরকারের কাছ থেকে যে প্রস্তাব আসে, তারও মূল্য আছে। কিন্তু এটি অন্য কারণে মূল্যবান। কংগ্রেস সমাজব্যবস্থার আমূল পরিবর্তনের উদ্দেশ্যে নানা প্রস্তাব গ্রহণ করে থাকেন। এইজন্যেই মনে হয় বুঝে-শুনেই নঈ-তালীমের প্রতিষ্ঠা হয়েছে। অর্থাৎ আমি নিজেকে নিশ্চিহ্ন করবার জন্যেই আপনার জন্ম দিচ্ছি—এইরূপ মনোভাবের ফলেই আজ নঈ-তালীমের জন্ম হয়েছে। রাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার অবসান ঘটাবার কার্যক্রম গ্রহণ করলে আমাদের সমগ্র দৃষ্টিভঙ্গী পরিবর্তিত হয়ে যাবে।

কাজের মাধ্যমে শিক্ষাদান করলেই নঈ-তালীম হয় না। এই শিক্ষা সম্পূর্ণ নতুন সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে চায়। এই কারণে একে নঈ-তালীম বলা হয়। নতুন সমাজগঠনের পরও নঈ-তালীমে নব-নব অভিজ্ঞতা সঞ্চিত হবে এবং তা আরও উন্নত ও সংস্কৃত হবে। এই পরিবর্তিত ও উন্নত শিক্ষাকে লোকে কল্যাণকর শিক্ষা বলে

অভিহিত করবে। এইপ্রকারে শিক্ষা ক্রমে অধিকতর কল্যাণকর হবে এবং শিক্ষাসংস্কারের প্রচেষ্টা নিরন্তর চলতে থাকবে। সেইজন্যে একথা মনে করলে ভুল হবে যে, পুরাতন শিক্ষাপদ্ধতির সংস্কার-সাধন দ্বারা নঈ-তালীমের উদ্ভব হয়েছে। আমি তা বলতে চাইনি। নব সমাজ গঠনকারী নব শিক্ষাপ্রণালী নব-নব বিকাশের পথে অনন্তকাল অগ্রসর হয়ে চলবে। এই বিকাশের সম্ভাবনা চিরকালই অব্যাহত থাকবে। এইজন্যে নঈ-তালীমের বিদ্যালয়ে ভূদান, সম্পত্তিদান, সর্বোদয়, সাম্যযোগ প্রভৃতির অর্থনৈতিক বিচারধারা এবং সংশ্লিষ্ট সমাজজীবন সম্পর্কে নানা চিন্তা ও ধারণা অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার বিষয় হওয়া উচিত। শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের নিয়ে যে-ক্ষুদ্র সমাজ গঠিত হবে, তা নব সমাজের আদর্শেই গড়ে তুলতে হবে। বিদ্যালয়ের সমাজজীবন ভাবি গ্রামসমাজের অনুরূপ হবে। এইজন্যে শিক্ষকেরা ও তাঁদের পরিবারস্থ লোকজন এবং ছাত্র-ছাত্রিগণ সকলে মিলে যে-সমাজ গড়ে তুলবেন, তা যেন একটি আদর্শ সমাজ গঠনের উদাহরণ হয়। এই ক্ষুদ্র সমাজের অন্তর্গত পরিবারগুলি আদর্শস্থানীয় হবে এবং এরা অবশ্যই স্বাবলম্বীও হবে। বস্তুত এই সমাজ স্বাবলম্বী না হলে আদর্শ সমাজরূপে পরিগণিত হতে পারে না। পাঁচ-দশজন উত্তম শিক্ষক, তাঁদের পরিবারস্থ দশ বা কুড়িজন লোক এবং ৫০।৬০।৮০ জন শিক্ষার্থী, সব মিলিয়ে শতাধিক লোকের এক গোষ্ঠীকে চাষ ও অন্যান্য শ্রমশিল্পের জন্যে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি, উৎপাদনের জন্যে ভূমি দেওয়া হল। এতদ্ব্যতীত প্রয়োজনীয় সকল পুস্তক ও অন্যান্য

সামগ্রীও তাঁদের দিয়ে বলা হল যে, তাঁরা ছাত্রদের বিদ্যাদান করবেন আবার সকলের জীবিকার সংস্থানও করবেন। এই উভয় দায়িত্ব তাঁদের উপর ন্যাস্ত করা হল। এই অবস্থায় তাঁরা যদি বলেন যে, জীবনধারণের সকল প্রয়োজনীয় সামগ্রী উৎপাদন করে তদুপরি শিক্ষাদান করা সম্ভব নয়, তাহলে বলতে হবে যে, তাঁরা নঈ-তালীমের 'ক' 'খ'-ও শেখেন নি।

নঈ-তালীমের প্রকৃত শিক্ষক

এই কথা কিছু রূঢ় শোনাচ্ছে সন্দেহ নেই। তার কারণ আমরা যে-শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত তাঁদের নিকট এই সমগ্র চিন্তাধারাই নতুন। কিন্তু এই মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের সমাজ অত্যন্ত ক্ষুদ্র। সেই তুলনায় সাধারণ লোকের সমাজ অত্যন্ত বৃহৎ এবং এই সমাজের লোকেরাই শ্রমের দ্বারা জীবিকার্জন করেন। সুতরাং পরিণামে এই বৃহৎ শ্রমশীল সমাজ থেকেই শিক্ষক গড়তে হবে। অর্থাৎ এঁদের মধ্যে বিদ্যা ও সংস্কৃতির আলো জ্বালাতে হবে। যখন এরূপ শিক্ষক সংগৃহীত হবে, তখনই আদর্শ শিক্ষাব্যবস্থাও সম্ভব হবে। পুরাতন শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষিত এবং নতুন শিক্ষাব্যবস্থা প্রচলিত করতে উৎসুক শিক্ষকেরা যে শিক্ষা দেবেন, তা নঈ-তালীমের পূর্ণ সম্ভাবনা প্রকাশ করতে পারবে না। তা হবে নঈ-তালীমের এক অপরিণত রূপ।

যখন আমাকে জিজ্ঞাসা করা হয় যে, নঈ-তালীমের আদর্শ আমি কোথায় প্রস্তুত করেছি, তখন আমি প্রশ্নকর্তাদের বলে থাকি যে, আমি নঈ-তালীমের আদর্শ দেখাবার যোগ্য নই। এর রূপ

কেমন হবে সে-সম্বন্ধে কল্পনা করবার যোগ্যতা ঈশ্বরের দয়ায় লাভ করেছি মাত্র, একে রচনা করবার যোগ্যতা আমার হয়নি। নঈ-তালীমে শিক্ষিত আমাদের ছাত্রেরা এবিষয়ে অধিকতর যোগ্যতা-সম্পন্ন হবে। অবশ্য অনেকেই জিজ্ঞাসা করেন যে, অধিক বিদ্যায় আমাদের সমকক্ষ কোন ছাত্র আছে কিনা। উত্তরে বলা হয় যে, এরূপ বিদ্বান ছাত্র নেই। তখন তাঁরা জিজ্ঞাসা করেন, তাহলে তারা আপনাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কিসে হল? উত্তরে আমি বলে থাকি যে, তারা আমাদের অপেক্ষা বিদ্বান নয় বলেই আমাদের অপেক্ষা অধিক যোগ্যতাসম্পন্ন। কারণ বিদ্বান না হওয়ার দরুন তারা অন্যান্য অনেক বিষয়ে যোগ্যতা লাভ করেছে।

শিক্ষা প্রত্যক্ষ হওয়া প্রয়োজন

তেলঙ্গানায় ঘুরবার সময় কেবল লাঠির দ্বারা বাঘের সঙ্গে যুদ্ধ করেছেন এমন এক চাষীর সঙ্গে দেখা হয়েছিল। সাধারণ এক লাঠি দিয়েই তিনি নির্ভয়ে বাঘের সঙ্গে যুঝেছিলেন এবং সেই লাঠির আঘাতেই বাঘের পঞ্চত্বপ্রাপ্তি ঘটেছিল। যখন কৃষক সেই লাঠি আমাকে দেখালেন, দেখলাম তাতে বাঘের রক্ত লেগে রয়েছে। আমি তাঁর চেহারাও তাকিয়ে-তাকিয়ে দেখলাম এবং ভাবলাম যে, ইনি যদি একজন বিদ্বান লোক হতেন, তাহলে বাঘের সামনে সকল বিদ্যা লোপ পেত। কিন্তু এই কৃষকের যে-বিদ্যা তাদ্বারা ইনি বাঘের সম্মুখীন হতে সক্ষম হয়েছিলেন।

এইজন্যে বলছি যে, বিদ্বান হলেও আমার বিদ্যার যে বিশেষ মূল্য নেই একথা বুঝবার মতো বুদ্ধি আমার আছে। একথা আমি

স্বীকার করি যে, আমার প্রতিষ্ঠার কারণ আমার বিদ্যাবত্তা। আজ সমাজ বিদ্যাবত্তাকে যথেষ্ট সম্মান করে, এটিই আমার প্রতিষ্ঠার কারণ। বিদ্যাবত্তার কোন মূল্যই নেই একথা আমি বলতে চাইনে। তবে, মাত্রাতিরিক্ত মূল্য যদি দেওয়া হয়, তাহলে কাজ হবে না। সুতরাং আমাদের অপেক্ষা ছাত্ররা অধিকতর প্রগতিশীল কিনা, এর প্রমাণ নির্ভর করে ছাত্ররা আমাদের অপেক্ষা অধিকতর কর্মদক্ষ কিনা এবং তারা গুণে আমাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কিনা—এই কথার উপর। আমাদের শিক্ষার এই পরিণাম যে, আমরা নিজের চোখে দেখিনে, অপরের চোখ দিয়ে দেখি। বিদেশে যাবার সাহস আমাদের নেই, স্বচক্ষে সে-সকল দেশ আমরা দেখব না অথচ নানা দেশের বর্ণনা-সম্বলিত এক ইংরেজী বই পড়ে মনে করব যে, ঘরে বসেই বিদেশ সম্বন্ধে যথেষ্ট জ্ঞান অর্জন করেছি। অর্থাৎ আমরা অপরের চক্ষুদ্বারা দেখি এবং এইভাবে যে-জ্ঞানলাভ করি সেই জ্ঞানের জোরেই বিদ্বান বলে পরিচিত হই। এইরূপ বিদ্যা যে-জ্ঞানের দ্বারা হয়, তা প্রত্যক্ষ জ্ঞান নয়, তা পরোক্ষ জ্ঞান। প্রকৃত জ্ঞান তো তাই, যা সাক্ষাৎ দর্শন থেকে লাভ হয়, যা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে প্রাপ্ত। কিন্তু এইপ্রকারের বিদ্যাবত্তা আমাদের মধ্যে নেই। অর্থাৎ অভিজ্ঞতালব্ধ বিদ্যা আমাদের মধ্যে নেই। এই অবস্থায় আমাদের বিদ্যা আমাদের তেজস্বী ও বীর্যবান করতে পারে না। এই দৃষ্টিতে নঈ-তালীমকে দেখতে হবে এবং এর সমগ্র আয়োজন সমগ্রভাবে করতে হবে।—[তামিলনাদের কর্মীদের মধ্যে (কাঞ্চীপুরম্) ৩১।৫।১৯৫৬]

কোন তত্ত্ব উপলব্ধি করবার একমাত্র উপায় হচ্ছে, তাকে জীবনে রূপায়িত করার চেষ্টা; সে রূপায়ন অপূর্ণ হলেও তত্ত্ব উপলব্ধির প্রয়াস ছাড়া গত্যন্তর নেই। আমার মতে শিক্ষাতত্ত্বের ব্যাপারে গভর্ণমেণ্ট বা তালীমী-সংঘ রচিত শিক্ষাব্যবস্থার বাহ্য আকৃতির বিশেষ কোন গুরুত্ব নেই। আমি পেরিনায়কম্পালমে তালীমী-সংঘের সম্মেলনে বলেছিলাম যে, তালীমী-সংঘ নঈ-তালিমের তুলনায় খুবই সামান্য বস্তু।

নৈতিক মূল্য ধর্মের দ্বারা পরিমেয় নয়

নঈ-তালীমের দৃষ্টিভঙ্গী মৌলিক। বর্তমান সমাজে শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রমের মূল্য পৃথকভাবে নির্নয় করা হয়। নঈ-তালীম তা স্বীকার করে না। নঈ-তালীমের আদর্শ অনুসারে মানুষের শারীরিক ও মানসিক উভয়বিধ সেবাই নৈতিক বস্তু। আর সেই কাজের জন্যে যে-পারিশ্রমিক দেওয়া হয়, তা হচ্ছে আর্থিক বস্তু। নৈতিক বস্তুর মূল্য আর্থিক বস্তুদ্বারা পরিমাপ করা যায় না। এক মাইলে কয় ঘণ্টা হয়, এরূপ প্রশ্নই ভ্রান্তিপূর্ণ। এক মাইলে কত গজ হয় সে-কথা জিজ্ঞাসা করা যেতে পারে, কিন্তু 'কত ঘণ্টা হয়' এ প্রশ্ন অযৌক্তিক। কারণ মাইল ও ঘণ্টা ভিন্ন জাতীয় হওয়ায় মাইলকে ঘণ্টাতে বা ঘণ্টাকে মাইলে পরিবর্তিত করা সম্ভব নয়। জলে নিমজ্জমান এক ব্যক্তিকে উদ্ধার করতে দশ মিনিট সময় লেগেছে বলে উদ্ধারকর্তাকে কি দশ মিনিটের মজুরি এক আনা

দেওয়া যায় ? তাঁকে যদি একশ টাকাও দেওয়া হয়, তবে তিনি তা নিতে অস্বীকার করে বলবেন যে, এই ব্যাপারে পয়সা নেওয়ার কথা উঠতেই পারে না। যে-সমস্ত শারীরিক ও মানসিক কাজ সমাজের সেবা হিসাবে করা হয়, সে-সব কাজ নৈতিক বস্তুতে পরিণত হয়ে যায়। এইজন্যে ঐসব কাজের আর্থিক মূল্য নির্নয় করা যায় না। একজন মানুষের ক্ষুধা কত টাকার খাদ্যে মিটবে, তা সহজেই হিসাব করা যায়। যার ক্ষুধা দুই টাকার খাদ্যে মিটবে, তার দুই টাকার খাদ্য পাওয়ার অধিকার আছে আর সমাজেরও সেই টাকা তাকে দেওয়া কর্তব্য। সে কাঠের মিস্ত্রী, না কৃষক, না শিক্ষক, অর্থাৎ তার কাজের সঙ্গে সে কত বেতন পাবে তার কোন সম্বন্ধ নেই। সেই সম্বন্ধ তার প্রয়োজনের সঙ্গে।

অর্থনৈতিক দিক

গভর্ণমেণ্ট 'নঈ-তালীম' প্রবর্তন করতে স্বীকৃত হয়েছে সন্দেহ নেই। কিন্তু আমরা একথা ভেবে উদ্বিগ্ন হচ্ছি যে, গভর্ণমেণ্ট প্রবর্তিত নঈ-তালীম সমাজে শ্রেণী-বিভাগকে আঘাত করবে না। এতে গভর্ণমেণ্টের কোন দোষ নেই, এ দোষ সমাজের। খৃষ্টধর্মাবলম্বীদের মতো গভর্ণমেণ্ট প্রবর্তিত নঈ-তালীম প্রচলিত অসম ব্যবস্থার সঙ্গে আপোষ করে কাজ চালাবে। খৃষ্টধর্মাবলম্বীরা রবিবার যখন গির্জায় উপাসনা করতে যান, তখন যদি কেউ কারও এক গালে চড় মারে তাহলে তিনি তাঁর অন্য গাল ফিরিয়ে দিতে প্রস্তুত থাকেন। কিন্তু এই শান্তির উপাসকেরাই সোমবার এটম বোমা ও হাইড্রোজেন বোমা তৈরী করতে লেগে যান। কারণ তাঁরা উভয় পরিস্থিতির সঙ্গে

আপোষ করে জীবনযাপন করতে অভ্যস্ত হয়েছেন। তাঁরা ভাবেন, ব্যক্তিগত জীবনের কল্যাণের জন্যে প্রয়োজনীয় কোন-কোন বিষয়ের সঙ্গে সমাজ সংগঠনের কোন সম্বন্ধ নেই। তেমনি মুসলমানেরা পরস্পরের সঙ্গে দেখা হলে 'সলাম' বলেন। 'ইসলাম' কথার অর্থ হচ্ছে শান্তি। তাঁদের পতাকায় চাঁদ ও তারার শান্ত ও সৌম্য প্রতীক অঙ্কিত আছে। এই প্রতীক সূর্যের মতো উগ্র নয়। পরমেশ্বরকে এঁরা 'রহীম' ও 'রহমান' রূপে জানেন। তৎসত্ত্বেও সামান্য বিষয় নিয়ে খুন করতেও তাঁরা ইতস্তত করেন না। হিন্দুধর্মাবলম্বীরাও ঠিক একইভাবে অন্যায়ের সঙ্গে আপোষ করে নিয়েছেন। নঈ-তালীম এরকম আপোষ করতে পারে না। তাকে তো সমাজের সম্পূর্ণ কাঠামোটাই বদলে দিতে হবে। আজ কংগ্রেস এক উত্তম প্রস্তাব করেছেন, 'সোস্যালিষ্ট প্যাটার্ণ অব সোসাইটি' তাঁদের লক্ষ্য বলে মেনে নিয়েছেন। কিন্তু আমরা দেখেছি যে, পুঁজীপতিরা নিজেদের আদর্শের সঙ্গে কংগ্রেসের আদর্শের একটা রফা করে নিয়েছেন। যেখানে এই প্রস্তাব হয়েছিল সেই সভাতেই মৌলানা আজাদ একথা বুঝিয়েছিলেন যে, এই প্রস্তাবে দেশে খুব বড় পরিবর্তন আসবে না। কংগ্রেস নেতাদের মতো হিটলারও বলেছিলেন যে, তাঁদের নীতি হচ্ছে 'ন্যাশন্যাল সোস্যালিজম' (রাষ্ট্রীয় সমাজবাদ) ! এইজন্যেই আমি বলেছি যে, বেচারা 'সোস্যালিজম্' খুবই বিপদে পড়ে গেছে! সোস্যালিষ্টরা এমনই এক গোলমেলে কথা বেছে নিয়েছেন যে, যার যেমন ইচ্ছা সেইভাবেই এর রূপ দিতে পারে। আজকাল 'সর্বোদয়' কথারও যথেচ্ছ ব্যবহার চলছে। সেইরকম

যদি নঈ-তালীমের নানা অর্থ হতে আরম্ভ হয়, তাহলে নঈ-তালীমের প্রকৃত তাৎপর্য যাঁরা হৃদয়ঙ্গম করেছেন তাঁরা বলবেন যে, আজ যা নঈ-তালীম নামে চলছে তার সঙ্গে প্রকৃত নঈ-তালীমের কোন সম্পর্ক নেই। নঈ-তালীমের অর্থনীতি অনুসারে শারীরিক পরিশ্রম ও মানসিক পরিশ্রমের শ্রেণীবিভাগ লোপ করতে হবে।

আধ্যাত্মিক দিক

নঈ-তালীমের আধ্যাত্মিক আদর্শ বলে যে, জ্ঞান ও কর্ম দুই বস্তু নয়, এ দুইটি একই বস্তু। কর্ম অপেক্ষা জ্ঞান শ্রেষ্ঠ বা জ্ঞান অপেক্ষা কর্ম শ্রেষ্ঠ এরকম বলা ভুল। জ্ঞান ও কর্ম অভিন্ন—এই মৌলিক আদর্শ অবলম্বন করে যে-শিক্ষা দেওয়া হবে, তার নামই 'নঈ-তালীম'। এই শিক্ষাকার্যে কোন পরিশ্রম হচ্ছে বলে মনেই হয় না। কাজের সঙ্গে-সঙ্গে শিক্ষালাভ হয় আর লাভ হয় পরিষ্কার নির্মল বায়ু। এখন কারখানাগুলিতে মজুরদের বন্ধ জায়গায় আটঘণ্টা কাজ করতে হয়। সেখানে তারা না-পায় খোলা হাওয়া, না-পায় আনন্দ। এরকম কাজের সঙ্গে জ্ঞানের কোন সম্পর্ক নেই। এইজন্যে সিনেমা প্রভৃতির মাধ্যমে তাঁদের আনন্দ 'সাপ্লাই' করতে হয়। মজুরদের কাজের মধ্যে কোন আনন্দ তাঁরা পান না। নঈ-তালীমে কিছুটা সময় কাজ করা হবে আর কিছুটা সময় আনন্দ উপভোগ করা হবে, এমন হবে না। নঈ-তালীম একই সঙ্গে 'সচ্চিদ্-আনন্দ' হবে। এতে কর্ম, জ্ঞান আর আনন্দ তিন এক হয়ে যাবে। জ্ঞান-লাভের স্বাভাবিক উপায় হচ্ছে এই যে, যখন কোন কাজ করা হবে তার সঙ্গে-সঙ্গেই যেন জ্ঞানও লাভ হয়ে যায়। রোগীর সেবা করার

সময় শুশ্রূষা সম্বন্ধীয় জ্ঞানের প্রয়োগ করা দরকার হয়। অর্থাৎ সেবা ও অধ্যয়ন দুই-ই করতে হয়। ডাক্তার রোগীকে সুস্থ করবেন অথচ তার সেবা করবেন না, এ কি করে হবে? সুস্থতা থেকে সেবা কাজকে পৃথক করা যেমন অসম্ভব, তেমনই কাজ থেকে আনন্দকে আলাদা করাও অসম্ভব। কাজ আর আনন্দকে পৃথক করে ফেললে আনন্দ নির্দোষ থাকে না এবং কাজ নীরস হয়ে যায়। ছোটবেলাকার এক ঘটনা মনে হচ্ছে। রাজার জন্মদিনেও স্কুল ছুটি আর রাজা মারা গেলেও। আমরা ছোট ছিলাম তাই ছুটিতে খুব আনন্দ পেতাম। আমাদের মনে হত জন্ম ও মৃত্যু মিথ্যা আর ছুটিটাই সত্য। অর্থাৎ আমরা একেবারে বৈদান্তিক হয়ে গিয়েছিলাম! আমরা বুঝতেই পারতম না যে, যে-ছুটি জন্ম উপলক্ষে হয়, তা আবার কি করে মৃত্যু উপলক্ষেও হতে পারে! আর ছুটিতে আমাদের আনন্দ থেকে বোঝা যায় যে, ছেলেরা স্কুলকে জেলখানার মতো মনে করে। আমরা চাই যে, সপ্তাহে শুধু একদিন নয়, সাতদিনই ছেলেরা আনন্দ করুক। কাজেই আমি বলছিলাম যে, নঈ-তালীম অর্থাৎ নবযুগের শিক্ষা তাঁরই লাভ হবে, যাঁর এই উপলব্ধি হবে যে কর্ম, জ্ঞান ও আনন্দ, অর্থাৎ সৎ চিৎ আনন্দ এই তিনে মিলে একই বস্তু।

সামাজিক দিক

নঈ-তালীমের সামাজিক আদর্শ বলে যে, সব মানুষই সমান। সুতরাং নঈ-তালীমের দৃষ্টিতে সমাজের বিভিন্ন জাতির মধ্যে বিভেদ এবং বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে বিভেদ সম্পূর্ণরূপে মিথ্যা। একথা

স্বীকার করে নিলে আজকের দিনে বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় মতবাদের মধ্যে যে-বিরোধ রয়েছে, তাও দূর হয়ে যাবে। নঈ-তালীম প্রতিষ্ঠিত হলে কোনরকম ভেদ-বিভেদ থাকতে পারে না। ভূমি সকলেরই। ভূমির ব্যক্তিগত মালিকানা থাকতে পারে না—ভূদানযজ্ঞের এই আদর্শ অনুসারে একথাও বলা যেতে পারে যে, কোন দেশের ভূমির উপর কেবলমাত্র সেইদেশের লোকেদেরই অধিকার, এই সিদ্ধান্তও ভুল। এই পৃথিবীতে যত ভূমি আছে তার অধিকারী হচ্ছে সমগ্র মানবজাতি। মানুষে-মানুষে কোনপ্রকারের সামাজিক পার্থক্য নঈ-তালীমে স্বীকার করা হয় না। আজকের সমাজ নানা প্রকার ভেদের উপর প্রতিষ্ঠিত। এইকারণে নঈ-তালীম প্রবর্তনের পর ভারতবর্ষে এক বিরাট সামাজিক বিপ্লব হয়ে যাবে। শিক্ষাক্ষেত্রে অল্পবয়স্কেরা এক সঙ্গে খেলবে, এক সঙ্গে পড়বে। বিভিন্ন ধর্মের অকল্যাণকর আচার অনুষ্ঠান ও সংস্কার বর্জন করে কেবল মাত্র যা কল্যাণকর সে-সমস্তই এতে গ্রহণ করা হবে। কেউ-কেউ সর্বধর্ম সমন্বয়ের ভুল ব্যাখ্যা করেন। তাঁরা বলেন, এর অর্থ হচ্ছে সর্ব ধর্মের সবকিছুকেই ভাল বলা। 'সেকুলর এটিচ্যুড্' অর্থাৎ 'পার্থিব দৃষ্টিভঙ্গী' অর্থে ধর্ম সম্বন্ধে কিছুই বলা হবে না—একথা লোকে বোঝে। কিন্তু ধর্মের নামে যে-সব অধর্ম চলছে, নঈ-তালীম সে-সকলের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে। আমি মনে করি যে, নঈ-তালীমকে প্রবলভাবে প্রতিরোধ করা সনাতনপন্থীদের কর্তব্য। তাঁরা যদি বাধা না দেন, তাহলে বুঝতে হবে হয় তাঁরা নঈ-তালীমের প্রকৃত স্বরূপ বুঝতে পারেননি কিম্বা আজকের নঈ-তালীম প্রকৃত নঈ-

তালীম নয়। ঠিক সনাতনীদের মতো রাষ্ট্র সংরক্ষণকারীদেরও নঈ-তালীমের বিরুদ্ধে দাঁড়ানো উচিত।

দোষ বিদ্যার্থীদের নয়, দোষ শিক্ষার

প্রশ্ন—আপনার আদর্শ তো ঠিকই আছে। কিন্তু একে গ্রহণ করার জন্যে যদি বিদ্যার্থীরা প্রস্তুত না হন, তাহলে কি করা যাবে?

বিনোবা—উত্তম আদর্শের উপযুক্ত হতে ছাত্রেরা পারছে না, না শিক্ষকেরা পারছে না—একথা ভেবে দেখতে হবে। শিক্ষকেরাই পশ্চাৎপদ হন, আমাদের অভিজ্ঞতা এই। সমস্ত বিদ্যার্থীই নঈ-তালীমের ভাবধারা গ্রহণ করতে প্রস্তুত, কারণ যুগের পরিবেশের মধ্যে এই বস্তু রয়েছে। আজকাল যে-শিক্ষা চলছে, তা থেকে যে মুক্ত হতে পারবে না, সে মূর্খ হয়ে থাকবে। আমার ছেলে-বেলাকার অভিজ্ঞতার কথা মনে পড়ছে। স্কুলে যত ছুটি মিলত তাতে আমার আশ মিটত না। আমি প্রথম ঘণ্টায় নাম ডাকার সময় ক্লাসে উপস্থিত থাকতাম আর তারপরই ক্লাস থেকে বেরিয়ে ঘুরতে থাকতাম। সেখানে যদি পুরাপুরি শিক্ষা গ্রহণ করতাম, তাহলে আজ আর ভূদানযজ্ঞের কাজে বেরিয়ে পড়তে পারতাম না। এই শিক্ষা আমার এত নীরস মনে হত যে, অবশেষে একদিন আমি কলেজ ছেড়ে দিলাম। শিক্ষার ঢঙ্ ঠিক হলে ছেলেরা শিক্ষকের জন্যে পাগল হয়ে যায়। ছোট ছেলেমেয়েদের 'হীরো ওয়ারশিপে' আগ্রহ থাকে আর শিক্ষকও তাদের 'হীরো' সহজেই হতে পারেন। এইজন্যে সব দেশেই দেখা যায় যে, ছেলেমেয়েরা মা-বাবাকে যতটা সম্মান করে, তার চেয়ে অনেক বেশী সম্মান

করে শিক্ষকদের। কিন্তু গুরুরও তো তেমনি হওয়া চাই। শুনতে পাই আজকাল ছেলেদের নাকি সংস্কৃত কঠিন মনে হয়। কিন্তু আমার অভিজ্ঞতা এই যে, ছেলেদের সংস্কৃত খুব ভাল লাগে। কৌশল না জানলে সংস্কৃতকে নীরস করা যায় না! সংস্কৃতের মতো সুন্দর বিষয়কে অসুন্দর করার জন্যে বিশেষ কলা-কৌশলের দরকার হয়—এই আমার অভিমত। আজকাল প্রথমেই ছেলেদের সামনে ব্যাকরণের বিভীষিকা উপস্থিত করে তাদের ঘাবড়ে দেওয়া হয়। প্রথমে সুমধুর কবিতা শেখালে ছেলেদের তাতে আনন্দ হবে। প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার শিক্ষা প্রণালীই ভুল। এইসকল বিদ্যালয়ে ছুটি পায় বলেই ছেলেরা বেঁচে থাকে। যা পড়ানো হয়, তার থেকে কোনরকমে শতকরা ৩৩ ভাগ মনে রেখে তারা ৬৭ ভাগ ভুলতে চায়। এতেও তাদের ভারী উপকার হয়।

প্রশ্ন—টেকনিক্যাল এজুকেশন, যথা মেডিক্যাল প্রভৃতির সঙ্গে বুনিয়াদী শিক্ষার কি সম্বন্ধ?

বিনোবা—বুনিয়াদী শিক্ষা ভিত্তিস্বরূপ। যেমন ভিত্তি অনুযায়ী অট্টালিকা নির্মাণ করতে হয়, তেমনি পরবর্তীকালের শিক্ষাও বুনিয়াদী-শিক্ষা অনুযায়ী হওয়া দরকার। অর্থাৎ প্রচলিত শিক্ষার সমগ্র রূপটিই বদলাতে হবে। চতুষ্কোণ ভিত্তির উপর ত্রিকোণ প্রাসাদ গড়া যায় না। এখানকার মেডিক্যাল কলেজে পড়তে হলে এমন সব গাছ-গাছড়া সম্বন্ধে জানতে হয়, যেগুলি ভারতবর্ষের কোথাও জন্মায় না। অনেক বিদেশী ওষুধ এদেশে আমদানী হয়। কিন্তু ছেলেদের তো দেশীয় গাছ-গাছড়া সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করা

দরকার। বর্তমানের মেডিক্যাল কলেজগুলি বিদেশী ওষুধের এজেন্সী করে মাত্র। যুদ্ধের সময় কয়েকটি বিলাতী ওষুধ ভাল পাওয়া যেত না। আমি বিদেশী ওষুধ বর্জন করবার কথা বলছিনে। আমি চাই যে, আমাদের চিকিৎসকেরা দেশীয় রীতির সঙ্গে পরিচিত হোন এবং তা গ্রহণ করুন। মেডিক্যাল কলেজ কোন একটি গ্রামের সঙ্গে যুক্ত থাকলে ভাল হয় আর এরকমই হওয়া উচিত। এরকম মেডিক্যাল কলেজের সহায়তায় গ্রামের আশপাশের লোকেদের স্বাস্থ্যের উন্নতি হবে আর আশপাশের অবস্থা সম্বন্ধেও কলেজ ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত থাকবে।

—[৭-২-৫৬ তারিখে শিবরামপল্লীর (হায়দ্রাবাদ) সরকারী বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের সঙ্গে আলোচনা]

ইতিহাস অধ্যয়ন

বিচার স্বাধীনতার সঙ্গে-সঙ্গে বিচার প্রণালীটিও আয়ত্ত করতে হবে। নাক, চোখ, কান বা মনের সাহায্যে বিচার করা হয় না ; বুদ্ধির দ্বারা বিচার করা হয়। এইজন্যে আমরা যখন ইন্দ্রিয় ও মনকে বশে রাখার পর বুদ্ধির দ্বারা পরিচালিত হব, তখনই চিন্তা করার প্রণালী আয়ত্ত করতে পারব। এই চিন্তা করার প্রণালীকে বিচার-শাস্ত্র আখ্যা দেওয়া হয়েছে। প্রত্যেক নাগরিক এবং প্রত্যেক বিদ্যার্থীকে এই শাস্ত্র শিখতে হবে। আজকের দিনের

বিদ্যার্থী ও নাগরিকেরা যে-শিক্ষা পাচ্ছেন, তার একটি মস্তবড় দোষ আছে। এমনিতে অনেক দোষই আছে, কিন্তু মস্ত বড় দোষ হচ্ছে এই যে, এই শিক্ষায় শিক্ষিত লোকদের মাথায় ইতিহাস নামক এক বস্তু ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। প্রচলিত শিক্ষার সবচেয়ে অনিষ্টকর ব্যাপার হচ্ছে ইতিহাসের পঠন-পাঠন। ইতিহাস যত মিথ্যা প্রচার করে, কল্পিত গল্প উপন্যাসের দ্বারাও ততটা হয় না। কারণ গল্প-স্রষ্টা প্রথমেই বলে দেন যে, তাঁর সমগ্র কাহিনীটিই কল্পনাপ্রসূত। ঐটুকু সত্য উক্তি তাঁর লেখার মধ্যে থাকে। পক্ষান্তরে ইতিহাস লেখক দাবী করেন তিনি যা লেখেন তাই সত্য, অন্যে যা লেখেন তা মিথ্যা।

রাষ্ট্রীয় কর্ণধারদের মর্জি ও ইতিহাস

আপনারা কি মনে করেন ইতিহাস নামক যে-বস্তু পড়ানো হয়, তা সত্য ঘটনার ইতিহাস? যে-দুটি মহাযুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে, তাদের ইতিহাস জার্মাণীতে একভাবে লেখা হয়েছে আর রাশিয়া, আমেরিকা, ইংল্যাণ্ডে আর একভাবে লেখা হয়েছে। কার কত ত্রুটি হয়েছে, কে কি অন্যায় করেছে, কোন্ কোন্ ঘটনা কখন ঘটেছে —এ সকলের ইতিহাস মিথ্যা লেখা হয়। সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ দলিল, কাগজপত্র প্রভৃতি পুড়িয়ে ফেলা হয়। সম্প্রতি খবরের কাগজে এক মজার খবর বেরিয়েছে, রাশিয়ার ইতিহাস নাকি সংশোধন করে নতুন করে লেখা হবে। বর্তমান ইতিহাসে লেখা আছে যে, স্টালিনের মৃত্যু হয়েছে। সংশোধন করে একথা অবশ্যি লেখা হবে না যে, স্টালিনের মৃত্যু হয়নি। কিন্তু স্টালিনের জীবদ্দশায় যে-ইতিহাস

রাশিয়ার মহাগৌরবের কারণ ছিল, সে-ইতিহাসকে সর্বৈব মিথ্যা বলে আবার নতুন ইতিহাস লেখা হবে। স্টালিনের সমসাময়িক ইতিহাসে লেখা হয়েছিল যে, মহাত্মা গান্ধী একজন ক্রান্তি-বিরোধী ব্যক্তি ছিলেন। এখন লেখা হবে যে, তিনি একজন মহাপুরুষ ছিলেন। মহাত্মা গান্ধী নামে কোন ব্যক্তি ছিলেন না, একথা যে তাঁরা লেখেন না, এই আমাদের পরম সৌভাগ্য। এঁরা দয়া করে এতটা সত্যের অপলাপ করবেন না! কিন্তু এসম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই যে, ইতিহাস রাষ্ট্রনায়কদের আদেশ অনুসারেই লেখা হয়। জনগণের চিন্তাধারাকে আপন ইচ্ছানুসারে নিয়ন্ত্রিত করার জন্যে পুরানো ঘটনাগুলিকে কাজে লাগানো হয়। এরই নাম ইতিহাস এবং এই ইতিহাস সমস্তই অল্প-বয়স্কদের শেখানো হবে। ইতিহাস যাঁরা তৈরী করেছিলেন তাঁরা তো গত হয়েছেন, কিন্তু তাঁদের রচিত মিথ্যা কাহিনীর চাপে বিদ্যার্থীদের মস্তিষ্ক নিষ্পিষ্ট হচ্ছে। মৃত রাজাদের নাম মুখস্থ করার কি প্রয়োজন আছে? কোন্ ঘটনা কখন ঘটেছে, সে-সব কথা জানবার কোন প্রয়োজন নেই। এপর্য্যন্ত কত রাজা হয়েছে তার কি কোন হিসাব আছে নাকি? এই গাছে যত পাতা আছে, তত রাজা এপর্যন্ত হয়েছে। তাঁদের ইতিহাস পড়ে কি করবেন? এশুধু ইতিহাসের নামে জনগণের মনকে এক ছাঁচে ঢেলে গড়বার মতলব। ফলে দেশের সব লোকের মন প্রেজুডিস ও আরোপিত ধারণায় কুণ্ঠিত হয়ে পড়ে এবং ক্রমে-ক্রমে লোকেরা উদ্যমহীন হয়ে যায়।

ইতিহাসের বোঝা থেকে মুক্ত হও

ভূদানের কাজ যখন প্রথম আরম্ভ হয়েছিল তখন লোকেরা জিজ্ঞাসা করত, 'এরকম ভিক্ষা করে কতদিনে কাজ শেষ হবে? ভিক্ষা করে কতটাই বা পাওয়া যাবে? ইতিহাসে এরকম ব্যাপার কখনও ঘটেছে কি?'—ইত্যাদি। উত্তরে আমি বলতাম, 'ইতিহাসে বিনোবার কথা তো নেই। বিনোবা নতুন জন্মেছেন আর ইতিহাসও তিনি নতুন করেই রচনা করছেন। তোমরা কি নব-ইতিহাস রচনাকারী হবে, না শুধু পুরানো ইতিহাস পড়বে? কর্তব্যবিমুখ হয়ে শুধু পুরানো ইতিহাস পড়া এবং অনুমিত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া আমার পেশা নয়। ইতিহাসে যা ঘটেনি তা কখনও ঘটতে পারে না—এরকম বলা হয় কেন? রামচন্দ্র তো বাঁশী বাজাননি, তা বলে কি শ্রীকৃষ্ণ বাঁশী বাজাননি? পুরানো লোকেরা যা করেছিলেন তা-ছাড়া আমাদের যদি আর কিছু করবার না থাকে, তাহলে আমরা জন্মেছি কেন? ভগবান যখন আমাদের সৃষ্টি করেছেন, তখন নিশ্চয়ই আমাদেরও কিছু করবার আছে।' এইজন্যে পুরানো ইতিহাসের কোন প্রভাব আমাদের উপর পড়া উচিত নয়। প্রথমত ইতিহাস একদেশদর্শী হয়। তার উপর এ-যে কতটা সত্য তাও বলা শক্ত। আর সত্য হলেও এর প্রভাব আমাদের উপর পড়বার কোন দরকার নেই। কারণ আমাদের জন্ম হয়েছে নব সত্যের প্রতিষ্ঠা ও প্রয়োগের জন্যে। এইকারণে বিদ্যার্থী ও নাগরিকদের কর্তব্য নিজেদের মনকে ইতিহাসের প্রভাব থেকে মুক্ত রাখা।

ইতিহাস অন্যায় অভিমানের জনক

'বল্লারী' কর্ণাটকের অন্তর্গত না অন্ধ্রের—এসম্বন্ধে ইতিহাস কি বলবে? অন্ধ্রবাসীরা ইতিহাস পড়ে বলেন যে, বল্লারী অন্ধ্রের অন্তর্গত। আর কর্ণাটকবাসীরা ইতিহাস পড়ে বলেন যে, বল্লারী কর্ণাটকের অন্তর্গত। আর ইতিহাস ঘেঁটেই বা কি হবে? ভূগোল কি বলে দেখা যাক। বল্লারী একই জায়গায় বরাবরই আছে। ইতিহাস এসম্বন্ধে কি প্রমাণ করতে পারে? প্রত্যেক প্রদেশের লোক নিজ-নিজ প্রদেশের সীমা অন্য প্রদেশের মধ্যে বিস্তৃত করার চেষ্টা করে। কর্ণাটকবাসীরা বলবেন যে, তাঁদের প্রদেশের সীমা গোদাবরী থেকে কাবেরী পর্যন্ত বিস্তৃত। অর্থাৎ কিছুটা তামিলনাদের কিছুটা অন্ধ্রের এবং কিছুটা মহারাষ্ট্রের অংশ তাঁদের প্রদেশের অন্তর্গত হওয়া চাই। তাহলে তাঁরা সন্তুষ্ট হন। মহারাষ্ট্রীয়েরা বলবেন যে, তাঁদের প্রদেশের সীমা নর্মদা থেকে তুঙ্গভদ্রা পর্যন্ত বিস্তৃত। অর্থাৎ কিছু গুজরাটের, কিছু হিন্দী ভাষাভাষী অঞ্চলের এবং কিছু কর্ণাটকের অংশ মহারাষ্ট্রের মধ্যে আসা চাই। নিজের সীমানা ঠেলে পাশের জমির একহাত নিজের করে নেওয়া যেমন কৃষকের পক্ষে এক হাস্যাস্পদ প্রয়াস, তেমনি হাস্যাস্পদ নিজ-নিজ প্রদেশের সীমা বিস্তৃত করার প্রয়াস। এসব শুনে এখানে অল্পবয়স্কেরা হাসছে। কিন্তু আপনাদের এসেম্বলীতে খুব জোরের সঙ্গে এ সব দাবী করা হয়। এ দাবী যে নিরর্থক সে কথা জেনে-শুনে শুধু-শুধু গোলমাল করা হয়। এসবের মূলে আছে এই ইতিহাস শিক্ষা। পুরানো ইতিহাস যেভাবে লেখা হয় ঠিক সেইভাবে যদি

আমরা পড়ি, তাহলে আমাদের অহংকার বেড়ে যায়। কাশ্মীর-প্রশ্ন সম্বন্ধে পাকিস্তানের অনেক খবরের কাগজে লেখা হয় যে, ভারতবর্ষ খুব জুলুম করছে, আক্রমণ করছে। আর শ্রীনেহরু আগাগোড়া সব মিথ্যা বলে উড়িয়ে দিচ্ছেন। অন্যদিকে ভারতবর্ষের খবরের কাগজে লেখা হয় যে, পাকিস্তানই জুলুম করছে, আক্রমণ করছে। এভাবে পরস্পর পরস্পরকে মিথ্যাবাদী বলছে। এক্ষেত্রে কি করা কর্তব্য ? এর নিষ্পত্তি কে করবে ? অর্থাৎ ইতিহাসের প্রতি এতটা মনোযোগ দেওয়া হয় যে, সত্য আর সেখানে টিকতেই পারে না। যতদিন পর্যন্ত ইতিহাসের প্রতি একাগ্রতা ও আগ্রহ অটল থাকবে, ততদিন আপনারা উন্নতির পথে অগ্রসর হতে পারবেন না।

ইতিহাসে বিবেক

একটা সহজ কথা বলছি। আপনাদের তেলেগু-লিপি ও কানাড়ী-লিপিতে সামান্য তফাৎ আছে। দুটোরই কিছু অদল-বদল করে দুই লিপিকে এক লিপি করা যায়। এর জন্যে একটি সমিতি নিয়োগ করলে সেই সমিতি উপায় নির্ধারণ করতে পারে। দুই প্রদেশ এক করার প্রস্তাব হচ্ছে। তা করার আগে একটু তো মনের মিল হওয়া দরকার ; তারপর দেশকে বিস্তৃত করার চেষ্টা করা যেতে পারে। কিন্তু তেলেগুভাষীরা বলবেন, তেলেগুভাষার 'তল্‌কটু' উঁচু করা দরকার। আর কানাড়ীভাষীরা বলবেন, অতটা উঁচু ভাল দেখায় না, এটা নীচে রাখাই ভাল। তারপর পুরানো বই ঘেঁটে দেখা হবে যে, সেখানে 'তল্‌কটু' কতটা উঁচু আছে। তখন ইতিহাসের অভিমান এসে সব কাজ পণ্ড করে দেবে। পুরানো ইতিহাস অনুযায়ী

যাঁরা কাজ করতে চান, তাঁরা উভয় পক্ষের কিছু বিসর্জন দেওয়ার নীতি অনুসরণ করতে পারেন না। এইকারণে সত্যকারের প্রগতি করতে হলে বর্তমান যুগে পুরানো ইতিহাসের সারতত্ত্বটি গ্রহণ করে অসার কথাগুলি বর্জন করতে হবে।

ইতিহাসের কোন দরকার নেই, আমি তা বলছিনে। ভগবান ব্যাসদেব 'মহাভারত' নামে এক উত্তম ইতিহাস লিখেছেন। বিচিত্র মানব-স্বভাবের বিবিধ পরিচয় সেখানে রয়েছে। এইরকম ইতিহাসে মানুষের উপকার হয়। কিন্তু ইতিহাসের ভূত যদি সমাজের ঘাড়ে চেপে বসে, তাহলে প্রগতি সুদূরপরাহত হয়ে যায়। একথা ঠিক যে, পূর্বপুরুষদের পরাক্রমের কথা পড়ে মানুষ প্রেরণা পায়। কিন্তু তাঁরা ভাল কাজের সঙ্গে-সঙ্গে অনেক খারাপ কাজও তো করেছেন। তাহলে তাঁদের সব কাজের পরিপূর্ণ ইতিহাসের বোঝা মাথার উপর চাপানোর কী প্রয়োজন ? ভাল জিনিস নিতে হবে, খারাপ ছাড়তে হবে। আমরা যদি পুরানো ইতিহাসের সঙ্গে শক্ত হয়ে লেগে থাকি, তবে আমাদের ভাল-মন্দ নির্ণয়ের শক্তিই ক্ষীণ হয়ে যাবে।

ইতিহাস মানবস্বভাবের ইতিহাস নয়

বিদ্যার্থীকে বলা হয় ইতিহাসে 'রীড বিটুইন দি লাইনস্', অর্থাৎ দুই পংক্তির মধ্যে যা অলিখিত আছে তাই পড়, যা লেখা হয়েছে তা ছেড়ে দাও। অর্থাৎ মধ্যে-মধ্যে যে সাদা কাগজ আছে তাই পড়তে বলা হয়। এক বন্ধু আমাকে একটি সুন্দর কবিতার বই পাঠিয়েছিলেন। সেই বই-এর প্রতি পৃষ্ঠায় চারদিকের জায়গা ছেড়ে শুধু মধ্যখানে লেখা ছিল। সেই কবিতাগুলি সুন্দর ছিল। কিন্তু

কবিতার চারদিকের সাদা জায়গার কাব্য আরও সুন্দর মনে হয়েছিল। ঠিক সেরকম লিখিত ইতিহাস থেকে অলিখিত ইতিহাসের গুরুত্ব বেশী হবে। এক মা তাঁর শিশু সন্তানকে জড়িয়ে ধরে আদর করেন আর তাকে খুব যত্নের সঙ্গে খাইয়ে-দাইয়ে লালনপালন করেন—এই সংবাদ তো তার করে খবরের কাগজে পাঠানো হবে না। কিন্তু যদি কোন খুন হয়, তাহলে তৎক্ষণাৎ খবরের কাগজে তার পাঠানো হবে এবং ইতিহাসেও সে-কথা লেখা থাকবে। অর্থাৎ মায়ের ভালবাসা যা খুব বড় জিনিস, ইতিহাসে তা স্থান পাবে না। আর কাউকে খুন করা হয়েছে, যা মোটেই ভাল কাজ নয়, সে-কথার উল্লেখ ইতিহাসে থাকবে। মানবতার অভিব্যক্তি ইতিহাসে লেখা থাকে না। মানবতার উপর যত আঘাত হানা হয়েছে, সে-সবের উল্লেখ ইতিহাসে পাওয়া যায়। এইকারণে মানবস্বভাবের জ্ঞান আমরা ইতিহাস থেকে পাইনে। মানবস্বভাববিরোধী ঘটনা ইতিহাসে সংগ্রহ করা হয় বলে ইতিহাসের যেখানেই দৃষ্টি দেওয়া যায়, সেখানেই কেবল হিংসার প্রাবল্য চোখে পড়ে।

ইতিহাস ভয়ের প্রচারক

ছাপাখানার দৌলতে বর্তমানে একদিকের খবর অন্যদিকে সহজে প্রচার হচ্ছে। এর থেকে মিথ্যা ভয়ের উৎপত্তি হয়। আমাদের দেশে দুই শ' বছর আগে খুব বড় যুদ্ধ হয়েছিল। সে যুদ্ধ পানিপথের যুদ্ধ নামে পরিচিত। সেই সময় চীন, জাপান ও অন্যান্য দেশ ঐ যুদ্ধ সম্বন্ধে কিছুই জানতে পারেনি। আজ তো পাকিস্তান যদি ২।১টা গ্রামে হামলা করে তাহলে সমগ্র ভারতবর্ষে,

পাকিস্তানে, এমন কি সারা দুনিয়ার খবরের কাগজে এই সংবাদ বেরিয়ে পড়ে। খবর শুনেই সারা দেশে মহাভয় উপস্থিত হয় আর সেনাবাহিনী বাড়ানো, দেশরক্ষার খরচ বাড়ানো প্রভৃতি নিয়ে আলোচনা চলতে থাকে। পার্লামেণ্টের এক সদস্য এমনও বলেছেন যে, পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা স্থগিত রেখে এখন দেশরক্ষার জন্যে খরচ বাড়িয়ে দেওয়া উচিত। বেচারা এত ঘাবড়ে গেছেন! পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে ইতিহাস প্রকাশের এই পরিণাম। পক্ষান্তরে একথা ভেবে দেখা দরকার যে, এক গ্রামের উপর আক্রমণ হওয়ার অর্থ পাঁচলাখ গ্রামের উপর আক্রমণ হওয়া নয়। এই অনন্তপুরে দশলক্ষ লোকের বাস। এখানে একজন লোক খুন হওয়ার অর্থ বাকী ৯,৯৯,৯৯৯ জন লোক বেঁচে আছে। দশলক্ষ লোকের মধ্যে একজনের মৃত্যুতে ভয় পাওয়ার হেতু কি থাকতে পারে? একথা ঠিক যে, একজনের মাথা খারাপ হলে তাকে সুস্থ করার চেষ্টা করা উচিত। আর একথাও বুঝতে হবে যে, যার মৃত্যু হয়েছে তার আয়ুষ্কাল নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু এরজন্যে সমস্ত লোক শঙ্কিত হয়ে উঠবেন এ অত্যন্ত অযৌক্তিক কথা। আজকালকার ইতিহাসের দৃষ্টিভঙ্গীই খারাপ। যেখানে এর প্রভাব পড়ে সেখানেই বুদ্ধিশক্তি কুণ্ঠিত হয়ে যায় এবং পুরুষার্থ লোপ পায়।

—[অনন্তপুর (অন্ধ্র) ৬ই এপ্রিল, ১৯৫৬]

বিদ্যার্থীদের কর্তব্য

প্রত্যেকেরই স্বদেশের প্রতি দুরকমের কর্তব্য আছে—প্রথম বিদ্যার্থীর কর্তব্য আর দ্বিতীয় নাগরিকের কর্তব্য। প্রত্যেক বিদ্যার্থীই পরে নাগরিক হয়, সুতরাং এই দুই বিভাগ মিশ্রিত ও অবিচ্ছিন্ন। আজকের বিদ্যার্থী ভবিষ্যতের নাগরিক। এবং প্রত্যেক নাগরিককেই আমি এক-একজন বিদ্যার্থী বলে মনে করি। ২৫-বছর বয়স হলে ভোট দেওয়ার অধিকার হয় এবং তখনই সেই ব্যক্তি নাগরিক বলে স্বীকৃত হন। কিন্তু এই বয়ঃসীমা সাধারণভাবে প্রযোজ্য। এর বহু ব্যতিক্রম হয়ে থাকে। এদেশে এমন শত-শত দৃষ্টান্ত আছে যে-সব ক্ষেত্রে অনেকে অল্পবয়সেই সমগ্র দেশকে পথপ্রদর্শন করেছেন। শঙ্করাচার্য তাঁর সুপ্রসিদ্ধ শঙ্করভাষ্য মাত্র ষোলবছর বয়সে লিখে-ছিলেন। এরকম কয়েকটি দৃষ্টান্ত আমাদের দেশে পাওয়া যায়। এইজন্যে কোন ব্যক্তির বয়সের উপর আমি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিনে। বিদ্যার্থীকে আমি নাগরিকরূপে দেখতে চাই আর যিনি নাগরিকরূপে গণ্য তাঁকে বিদ্যার্থী বলে মনে করতে চাই। বর্তমানে বহু নাগরিক দেখা যায় যাঁরা বিদ্যাভ্যাস ত্যাগ করেছেন। মনে করা হয় যে, বিদ্যাভ্যাসের সময় অতীত হলে যখন মানুষ সংসারের ভার গ্রহণ করে, তখন তার অধ্যয়ন করার সময়ও অতীত হয়ে যায়! এই সিদ্ধান্ত অত্যন্ত ভ্রান্ত ও ভারতীয় সংস্কৃতির পরিপন্থী। ভারতীয় সভ্যতার আদর্শানুসারে মানুষ আমরণ বিদ্যাভ্যাস ও অধ্যয়ন করবে। গৃহস্থের বিবিধ কর্তব্যের মধ্যে একটি হচ্ছে এই যে, তাঁকে প্রতিদিন স্বাধ্যায় করতে হবে। এই অন্ধ্রদেশে বহুলোক তৈত্তিরীয় উপনিষদ

পাঠ করে থাকেন। তৈত্তিরীয় উপনিষদে বলা হয়েছে যে, বিবিধ কর্তব্য সাধনের সঙ্গে-সঙ্গে প্রত্যেক মানুষের স্বাধ্যায় করা চাই। বিভিন্ন কর্তব্যের নাম করার সময় সঙ্গে-সঙ্গে বলা হয়েছে—"স্বাধ্যায়প্রবচনে চ"। বিশেষ করে স্বাধীনতাপ্রাপ্তির পর যদি প্রত্যেক নাগরিক অধ্যয়নের অভ্যাস রক্ষা না করেন, তাহলে স্বাধীনতা বিপন্ন হয়ে পড়বে। ছাত্রজীবন জীবনের আরম্ভমাত্র। ছাত্রজীবন শেষ হলে যখন বিদ্যার্থী স্বাধীনভাবে অধ্যয়নাদি করবার শক্তিলাভ করে, তখনই তাকে নাগরিক বলে গণ্য করা হয়। যে নাগরিক ছাত্রজীবনে ছেদ টেনে দিয়ে লেখাপড়ার শক্তি অর্জন করেও লেখাপড়া ছেড়ে দেন, তাঁর দশা তো সেই ব্যক্তির মতো যিনি উপার্জন করার শক্তি থাকা সত্ত্বেও উপার্জন করেন না। কেউ যদি হাঁটবার শক্তি পেয়ে না হাঁটেন, তখন কী হবে? তেমনি যদি কেউ অধ্যয়নের শক্তি লাভ করার পর অধ্যয়ন করা ছেড়ে দেন, তাঁকে কী বলা যাবে? সেইজন্যে বিদ্যার্থী ও নাগরিককে পৃথক ভাবে গণ্য করার চেষ্টা করা উচিত নয়। কিন্তু আমরা বিদ্যার্থীদের কর্তব্য ও নাগরিকদের কর্তব্য আলাদা করে দিয়েছি। এমন ভাবে কর্তব্য ভাগ করে দেওয়া হয়েছে যে, উভয়ে মনে করে এটি তাঁর কর্তব্য। আজ আমি বিদ্যার্থীদের কর্তব্য সম্বন্ধে কিছু বলব আর কাল নাগরিকদের কী কর্তব্য সেসম্বন্ধে আমার ধারণা ব্যক্ত করব। এইভাবে উভয় কর্তব্য নির্ণয় করে এক সম্পূর্ণ সিদ্ধান্ত আপনাদের সামনে উপস্থিত করব।

বিদ্যার্থীদের সঙ্গে আমার মিল

আমি লক্ষ্য করেছি, আমার যে-সভায় ছাত্ররা অধিক সংখ্যায় যোগ দেয়, সেই সভায় মোটেই গোলমাল হয় না। বিদ্যার্থীদের সম্বন্ধে আমার যে-অভিজ্ঞতা হয়েছে, তা বাস্তবিকই অদ্ভুত। ভারতের ছাত্রদের আমি বড় ভালবাসি। এইজন্যে তাদের সামনে যখন কিছু বলি, তখন তাদের সঙ্গে এক হয়ে যাই। এর কারণ হচ্ছে, আমি আর যা-কিছু হই না-কেন সর্বপ্রথম আমি একজন বিদ্যার্থী। আমার অধ্যয়নের অভ্যাস আজ পর্যন্ত অব্যাহত আছে। একটি সামান্য দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। আমাদের পদযাত্রায় একজন জাপানী বন্ধু ছিলেন। সেই সময় আমি জাপানী ভাষা পড়ার জন্যে প্রতিদিন একঘণ্টা করে সময় দিতাম। বয়স বেড়ে গেলে স্মরণশক্তি কমে আসে এরকম আমার কখনও মনে হয়নি। বরং আমার এই অভিজ্ঞতা হয়েছে যে, শরীর ক্ষীণ হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে ক্রমেই স্মরণশক্তি বেড়ে চলেছে। ছোটকালে যে শ্লোক দশবার পড়ে মনে রাখতে পারতাম, আজকাল দুবার পড়েই সেই শ্লোক মনে রাখতে পারি। তার কারণ নিরন্তর অধ্যয়নের অভ্যাস বজায় রাখতে পেরেছি। বুদ্ধদেব বলেছেন, যেমন রোজ স্নান করলে শরীর পরিষ্কার থাকে, রোজ সম্মার্জনী দিয়ে মার্জনা করলে গৃহ পরিছন্ন থাকে, তেমনি রোজ অধ্যয়ন করলে মন স্বচ্ছ হয়। যদি রোজ স্নান না করি, তাহলে শরীর পরিষ্কার থাকবে না। তেমনি রোজ অধ্যয়ন না করলে মনের মালিন্য ঘুচবে না। যেরকম বললাম আমি বরাবর সেরকমই করছি। অধ্যয়নের অভ্যাস অব্যাহত রেখেছি। আর ভরসা আছে যেদিন ভগবান

কোলে তুলে নেবেন, সেদিনও অধ্যয়ন করে তাঁর কাছে যেতে পারব। এই অধ্যয়নশীলতা আছে বলেই ছাত্রদের সঙ্গে আমার হৃদয়ের ঐক্য অনুভব করতে পারি।

চিন্তার স্বাধীনতা প্রয়োজন

বিদ্যার্থীদের প্রথম কর্তব্য হচ্ছে চিন্তার স্বাধীনতা রক্ষা করা। যদি কারও পরিপূর্ণ স্বাধীনতার অধিকার থেকে থাকে, তবে তা একমাত্র বিদ্যার্থীরই আছে। শ্রদ্ধা বিনা বিদ্যালাভ হয় না। সুতরাং শ্রদ্ধাবান হতেই হবে। কিন্তু মনে রাখতে হবে জ্ঞান লাভ করতে হলে যেমন শ্রদ্ধার প্রয়োজন, তেমনি বুদ্ধির স্বাধীনতাও পূর্ণরূপে বর্তমান থাকা দরকার। কান আর চোখ দুটি বিভিন্ন ইন্দ্রিয় বটে, কিন্তু তারা পরস্পরের সহযোগিতায় কাজ করে, বিরোধ করে না। শ্রদ্ধা আর বুদ্ধিরও সেই সম্বন্ধ। যদি শ্রদ্ধা না থাকে, তবে বিদ্যালাভ অসম্ভব। মা ছেলেকে চাঁদ দেখিয়ে বলেন, ঐ দেখ চাঁদ। ছেলের যদি মায়ের প্রতি শ্রদ্ধা না থাকে আর তার সন্দেহ হয় যে, কি জানি মা যা দেখাচ্ছেন তা চাঁদ না আর কিছু, তাহলে সে জ্ঞান লাভ করতে পারবে না। এইজন্যে শ্রদ্ধা জ্ঞান লাভের ভিত্তিস্বরূপ। জ্ঞানের আরম্ভই হয় শ্রদ্ধা থেকে। কিন্তু জ্ঞানের পরিপূর্ণতা হয় বুদ্ধিতে। শ্রদ্ধার দ্বারা জ্ঞানের আরম্ভ হয় আর স্বাধীন চিন্তার সাহায্যে সেই জ্ঞান পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। এইজন্যে বলছি যে, চিন্তার স্বাধীনতার অধিকার বিদ্যার্থীরা যেন কখনও না হারায়। যে-শিক্ষক ছাত্রের উপর জোর জবরদস্তি করেন, তিনি শিক্ষকই নন। শিক্ষক তো তিনি, যিনি বলবেন, 'আমার কথা

যাচাই করে নাও। যদি ঠিক হয় গ্রহণ করো আর যদি ঠিক না হয় গ্রহণ করো না।' এইভাবে যে-শিক্ষক ছাত্রের বুদ্ধির স্বাধীনতা উদ্রেক করতে সহায়তা করবেন, তিনিই প্রকৃত শিক্ষক নামের যোগ্য হবেন। কেননা চিন্তার স্বাধীনতাই প্রকৃত স্বাধীনতা। মহাপুরুষকে শ্রদ্ধা ও সম্মান নিশ্চয়ই করতে হবে। কিন্তু মহাপুরুষ বলেছেন বলেই কোন কথা মানতে হবে এরকম মনে করা ভুল। আমার কথা যদি ঠিক মনে না করে কেউ না মানে, তাহলে আমার খুব আনন্দ হয়। যেকোন লোকের কথা যুক্তিযুক্ত মনে হওয়াতে যদি কেউ তা মেনে নেয়, তাহলে আমি খুশী হই। কিন্তু আমার কথা নির্বিচারে যদি কেউ মেনে নেয়, তাহলে আমার খুব দুঃখ হয়। এজন্যেই আমি বলি যে, বুদ্ধির স্বাধীনতা হওয়া প্রয়োজন। তার চেয়ে ভাল কথা হবে চিন্তার স্বাধীনতা। চিন্তার এই স্বাধীনতা ক্ষুন্ন হতে দেওয়া উচিত নয় আর স্বাধীনতার অধিকার বিশেষভাবে রক্ষা করা উচিত। পৃথিবীর সর্বত্র বিদ্যার্থীদের কাছ থেকে এই অধিকার কেড়ে নেওয়া হচ্ছে। এইজন্যে আমি তাদের সাবধান করে দিতে চাই। আজকাল 'ডিসিপ্লিন' বা অনুশাসনের নামে বিদ্যার্থীদের মন ছাঁচে গড়ার চেষ্টা হচ্ছে। আমি 'ডিসিপ্লিনে' বিশ্বাস করি আর জানি যে, 'ডিসিপ্লিন' ছাড়া কাজ হয় না। ঘরে যদি আগুন লাগে, তখন 'ডিসিপ্লিন' না থাকলে সমস্ত গোলমাল হয়ে যাবে। লোকের সংখ্যা যদি কমও হয় কিন্তু ডিসিপ্লিন থাকে, তাহলেও অল্প সময়ে ভাল করে আগুন নেবানো যায়। যদি অনেক লোক থাকে আর ডিসিপ্লিন না থাকে, তাহলে আগুন নেবানোই যাবে না। কিন্তু 'ডিসিপ্লিনে'র

নামে সব জায়গায় যন্ত্রীকরণ হচ্ছে। ফলে বিদ্যার্থীদের মনের উপর দারুণ আঘাত এসে পড়ছে।

ইউনিয়ন গঠন

সারা দুনিয়াতে শিক্ষা-ব্যবস্থার ভার সরকারের উপর ন্যাস্ত হয়েছে। আমার মতে এর চেয়ে বড় বিপদ আর হতে পারে না। আমি বারবার বলেছি বর্তমানে শিক্ষা দেওয়ার অধিকার সরকারের হাতে থাকা উচিত নয়। এ অধিকার থাকবে জ্ঞানীদের হাতে। কারণ, শিক্ষাদান সেবাপরায়ণতা ছাড়া সফল হয় না। আজ তো এমন অবস্থা হয়েছে যে, সারা পৃথিবীতে বিভিন্ন গভর্ণমেণ্ট শিক্ষা-ব্যবস্থা নিজেদের করায়ত্ত করে বসে আছে। শিক্ষাবিভাগের কর্ম-কর্তাগণ যে-বই অনুমোদন করবেন, সব বিদ্যার্থীদের সেই বই পড়তে হবে। উত্তরপ্রদেশের একান্নটি জেলার ছয় কোটি লোকের জন্যে একটি বই অনুমোদন করা হবে আর সকলকেই সেই বই পড়ানো হবে! এখন 'বিশাল অন্ধ্র' সৃষ্টি হয়েছে, তাই সেখানে যন্ত্রীকরণও খুব বিস্তৃতভাবে হতে পারবে। কারণ, পূর্বে যে-পাঠ্য পুস্তকসমূহ ১১টি জেলার জন্যে অনুমোদন করা হয়েছিল, এখন সেগুলি ২০টি জেলায় চালানো হবে। যদি গভর্ণমেণ্ট ফ্যাসিষ্ট হয়, তাহলে ছাত্রদের ফ্যাসিজম্ শেখানো হবে, যদি কম্যুনিষ্ট হয় তো কম্যুনিজম, পুঁজিবাদী হয় তো পুঁজিবাদের শ্রেষ্ঠত্ব আর প্ল্যানিংবাদী হয় তো প্ল্যানিং-এর সমগ্র কাহিনী ছাত্রদের শেখানো হবে। এর মতো বিপদ আর হতে পারে না। এইকারণে শিক্ষাবিভাগকে গভর্ণমেণ্টের অধীনতা থেকে মুক্ত রাখতে হবে। সর্বপ্রথম বিশেষ প্রয়োজনীয় হচ্ছে শিক্ষাবিভাগের

মুক্তি। আমি বিদ্যার্থীদের আগে থেকে স্পষ্ট করে বলে দিতে চাই যে, তাদের ছাঁচে ঢালার চেষ্টা হচ্ছে। তাই আপন-আপন চিন্তার স্বাধীনতা বা বিচার-স্বাধীনতা তাদের রক্ষা করতে হবে। কিন্তু বিদ্যার্থীরা একথা বুঝতে পারছে না। আজ তো তারা ভিন্ন-ভিন্ন ইউনিয়ন গড়ছে। এতে আমি বিস্মিত হয়েছি। কারণ ইউনিয়ন হয় ভেড়া-ছাগলের, বাঘের ইউনিয়ন হয় না। বিদ্যার্থীদের তো ভেড়া নয়, বাঘ হতে হবে। যদি কোন কথা যুক্তিযুক্ত মনে হয়, তাহলে তার প্রচার করতে হবে। অন্যথায় তা গ্রহণ করা উচিত নয়। আমার খুব আশ্চর্য লাগে যে, গভর্ণমেণ্টের চেষ্টায় ছাত্রেরা নির্বীর্য হয়ে পড়ছে আর সেদিকে কোন খেয়াল না করে (নিজেদের নির্বীর্য করবার জন্যে) নিজেরাই 'ইউনিয়ন' গড়ে তুলছে। লাখ-লাখ স্কুল ও পাঠশালা হোক, কিন্তু এসব বিদ্যালয়ের একজন ছাত্রও যেন ইউনিয়নে যোগ না দেয়। তাদের বলা উচিত, 'নাগরিক হওয়ার পর যদি ব্যক্তিগত স্বাধীনতাকে সংযত করতে হয়, তাহলে না-হয় কোন একটা ইউনিয়নে ঢুকে পড়ব। কিন্তু এখন তো আমি বিদ্যার্থী। এখন শতকরা একশ ভাগ স্বাধীনতা রক্ষা করার অধিকার আমার আছে।' একথা ঠিক যে, রাজনীতি সম্বন্ধে মনন চিন্তন করা দরকার। কিন্তু কোন রাজনৈতিক মতকে সুনিশ্চিতভাবে গ্রহণ করা উচিত নয়। উন্মুক্ত মন নিয়ে চিন্তা করতে হবে, যাতে প্রয়োজন হলে বিচারধারা বদলে নেওয়া যায়। ছাত্রদের বলা উচিত যে, ইউনিয়নে ঢুকলে তো মত বদলাবার (যুক্তিযুক্তভাবে) অধিকার হারিয়ে ফেলতে হবে। এর অর্থ এই নয় যে, সহযোগিতা করা হবে না।

সেবার জন্যে সহযোগিতার নিশ্চয়ই দরকার আছে। কিন্তু ইউনিয়নের সহযোগিতা দেশের পক্ষে বিপজ্জনক। কারণ ইউনিয়ন ছাত্রদের এক ছাঁচে ঢালতে চায়। এদ্বারা দেশের স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হবে।

আত্মজয়ী হও

বিদ্যার্থীদের দ্বিতীয় কর্তব্য হচ্ছে আত্মজয়ী হওয়া। যে আত্ম জয় করতে পারবে, সে-ই স্বাধীন হওয়ার অধিকার লাভ করবে। যে-আদর্শ গ্রহণ করার সংকল্প করব, অভ্যাসের দ্বারা তাকে জীবনে অবশ্যি রূপায়িত করব—এরূপ সাধননিষ্ঠ হতে হবে। বিদ্যার্থীদের এই দৃঢ় বিশ্বাস হওয়া চাই যে, সংসারে এমন কোন শক্তি নেই যা তাদের সত্যসাধনা থেকে বিচ্যুত করতে পারে। সত্যসংকল্পে অটল থাকবার জন্যে দেহ, মন ও বুদ্ধিকে বশে রাখা প্রয়োজন। আমি যদি সকাল ৪টায় শয্যাত্যাগ করতে দৃঢ়সংকল্প হই, তাহলে ইন্দ্রিয়-সমূহের এমন কী শক্তি থাকতে পারে যে তারা আমাকে তা থেকে নিবৃত্ত করবে। এইজন্যে বিদ্যার্থীদের বিদ্যাভ্যাসের সঙ্গে-সঙ্গে আত্মজয়ের সাধনাও করতে হবে। অন্যথা বিদ্যা বীর্যহীন হয়ে পড়বে। আত্মজয়ের শক্তিই শ্রেষ্ঠ শক্তি। আপনারা গীতার স্থিতপ্রজ্ঞ সম্পর্কে শ্লোকসমূহ শুনেছেন। স্থিতপ্রজ্ঞ কে? যাঁর প্রজ্ঞায় নির্ণয়শক্তি আছে তিনিই স্থিতপ্রজ্ঞ। আজকের পৃথিবীতে বহু বড়-বড় সমস্যা দেখা দিয়েছে। কাজেই এখন ছোটখাট সমস্যা না রাখাই ভাল। বর্তমানে সারা পৃথিবীর লোকেরা পরস্পরের খুব কাছে এসে পড়েছে। তাই বৃহৎ পটভূমিকার পরিপ্রেক্ষিতে চিন্তা করা দরকার এবং ব্যাপক দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে দ্রুত সমস্যার

সমাধান করাও দরকার। পূর্বকালে এসব বড়-বড় সমস্যাও ছিল না আর লোকেরা বৃহৎ পৃথিবীকেও জানত না। আমাদের দেশের সব চেয়ে বড় যুদ্ধ পানিপথের যুদ্ধ সম্বন্ধে তখন চীন ও জাপানের লোকেরা কিছুই জানতে পারেনি। আজ কিন্তু অবস্থা বদলে গেছে। পৃথিবীর কোন এক ক্ষুদ্রস্থানে সামান্য ঘটনা ঘটলেও তার প্রভাব সারা দুনিয়ার লোকের উপর এসে পড়ে। ইউরোপ আর আমেরিকায় যে-সব ঘটনা ঘটে তা ভারতবর্ষের পণ্যমূল্যকে প্রভাবিত করে। এইভাবে বৃহৎ সমস্যাসমূহ সৃষ্টি হচ্ছে আর তার দ্রুত সমাধানেরও প্রয়োজন হচ্ছে। তাই আজ নির্ণয়শক্তির যতটা প্রয়োজন হয়েছে, আগে তা ছিল না। আপনারা দেখছেন যে, আজ পদব্রজে চলবার অবসর কারও নেই। প্রত্যেকেই এরোপ্লেন ও ট্রেনে এমন দ্রুতবেগে দৌড়াচ্ছেন যে, মনে হয় যেন তাঁদের বাঘে তাড়া করেছে। আমাকেও জিজ্ঞাসা করা হয়, 'আপনি এরোপ্লেনে কেন যাতায়াত করেন না?' আমি উত্তর দিই, 'যদি হাওয়াই জাহাজে ঘুরি তো হাওয়া পাব, জমি তো পাব না।' আমার তো জমি চাই। তাই সময় নষ্ট করে আমাকে পায়ে হেঁটে ঘুরতে হয়। আমি একথা বলতে চাই যে, এখন দিনকাল এমনই হয়েছে যে খুব দ্রুত সমাধান না করলে চলে না। এই কারণে আজকের দিনের শ্রেষ্ঠশক্তি হচ্ছে নির্ণয়শক্তি। আর একেই প্রজ্ঞা বলা হয়। যার প্রজ্ঞা স্থির হয়েছে, তাকে স্থিতপ্রজ্ঞ বলা হয়। বিদ্যার্থীদের স্থিতপ্রজ্ঞ হতে হবে। তা হওয়ার উপায় হচ্ছে ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধিকে আপন বশে আনার চেষ্টা করা। বিদ্যার্থীদের সংকল্পে অটল থাকার শক্তি দৃঢ় করার প্রতিজ্ঞা করতে হবে।

আমরা একটা কিছু করব বলে স্থির করলাম আর সেই সংকল্প ভেঙ্গে গেল এমন যদি হয়, তাহলে আমাদের মনের জোর নষ্ট হয়ে যায়। এইজন্যে প্রাণ গেলেও সংকল্পে অটল থাকতে হবে। এতটা মনের বল সংগ্রহ করতে হবে। এইভাবে সংকল্পে দৃঢ় থাকবার জন্যে যে-শক্তির প্রয়োজন, সে-শক্তি জিতেন্দ্রিয় হয়ে লাভ করতে হয়।

নিরন্তর সেবাপরায়ণতা

বিদ্যার্থীর তৃতীয় কর্তব্য হচ্ছে অনুক্ষণ সেবাপরায়ণ হওয়া। সেবা ছাড়া জ্ঞানলাভ হয় না। মহাভারতে এই কাহিনীটি আছে।—একদিন অর্জুন, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আর যুধিষ্ঠির কথাবার্তা বলছিলেন। অর্জুনের প্রতিজ্ঞা ছিল যে, তাঁর গাণ্ডীবের যে নিন্দা করবে তাকে তিনি হত্যা করবেন। যুধিষ্ঠির অর্জুনকে উত্তেজিত করবার জন্যে বললেন, 'তুই আর তোর গাণ্ডীব এত শক্তিশালী, তবু আমাদের এত কষ্ট হচ্ছে আর শত্রুরাও বিনষ্ট হচ্ছে না।' অর্জুন খুব ধর্মনিষ্ঠ ছিলেন আর দাদাকে খুব ভালবাসতেন। তিনি নিজের নিন্দা সহ্য করলেন, কিন্তু গাণ্ডীবের নিন্দা সহ্য করতে পারলেন না। এইজন্যে শ্রীকৃষ্ণের সামনেই যুধিষ্ঠিরকে মারতে উদ্যত হলেন। কৃষ্ণ তাঁকে সংবরণ করে বললেন, 'আরে তুই কিরূপ মূর্খ, জ্ঞানহীন ? বড়দের সেবা করিস্ নি তাই জ্ঞান আর কিকরে পাবি ?' মহাভারতে অন্যত্র যক্ষের সঙ্গে প্রশ্নোত্তরের গল্প আছে। যক্ষকে প্রশ্ন করা হয়েছিল যে, জ্ঞান কি করে পাওয়া যায়। যক্ষ উত্তর দিয়েছিল—জ্ঞানং বৃদ্ধসেবয়া, জ্ঞান পাওয়া যায় বয়োবৃদ্ধদের সেবা করে। বৃদ্ধরা অভিজ্ঞ হন। আর যে বৃদ্ধকে সেবা করে তার কাছে বৃদ্ধের মন খুলে যায়। তাঁর

যথাসর্বস্ব সেবককে দিয়ে দেন। এইজন্যে বলেছি যে, বিদ্যার্থীদের সেবাপরায়ণ হওয়া চাই। বয়োবৃদ্ধদের, মাতাপিতার এবং সমাজস্থ সকলের সেবা করতে হবে। সেবাই যদি করি, তাহলে পড়াশুনা কখন করব—একথা ভাবা উচিত নয়। কারণ বুঝতে হবে যে, সেবাদ্বারাই জ্ঞানলাভ হয়। রামায়ণে এক গল্প আছে। বিশ্বামিত্র দশরথের কাছে গিয়ে যজ্ঞরক্ষার জন্যে রাম ও লক্ষ্মণকে চাইলেন। দশরথ মোহগ্রস্ত ছিলেন তাই বললেন যে, রামচন্দ্রের বয়স ষোল বছর হয়নি, তাকে কী করে দেওয়া যায়। একথা শুনে তপস্বী বিশ্বামিত্র ফিরে যাওয়ার জন্যে উদ্যত হলেন। বাল্মীকি বর্ণনা করেছেন যে, বিশ্বামিত্র যখন বললেন—'আচ্ছা, আমি ফিরে যাচ্ছি,' তখন তাঁর সেই কথা শুনে সমস্ত পৃথিবী কেঁপে উঠেছিল। জ্ঞানী-পুরুষের যাচ্ঞাকে রাজা ফিরিয়ে দিতে পারেন না। বিশ্বামিত্রকে ফিরিয়ে দিতে দেখে বশিষ্ঠ দশরথকে তিরস্কার করে বললেন, 'তুই কেমন মূর্খ? বুঝতে পারছিস নে বিশ্বামিত্র যে রাম-লক্ষ্মণকে চাইছেন, এতে তোর পুত্রদেরই কল্যাণ হবে? ছেলেরা বিশ্বামিত্রের সেবা করবে, এতে তাদের জ্ঞানলাভ হবে। সেবা থেকে শ্রেষ্ঠ কোন বিদ্যালয় নেই।' একথা শুনে দশরথ রাম-লক্ষ্মণকে বিশ্বামিত্রের হাতে সঁপে দিলেন। এরপর বাল্মীকি বর্ণনা করেছেন, কি করে সেবাদ্বারা রাম-লক্ষ্মণের জ্ঞানলাভ হয়েছিল।

বিশ্ব-নাগরিকত্ব

বিদ্যার্থীদের চতুর্থ কর্তব্য হচ্ছে সর্ববিষয়ে অবহিত হওয়া। পৃথিবীতে যে-সকল সামাজিক আন্দোলন চলছে, সে-সকল

আন্দোলন সম্বন্ধে পড়াশুনা করতে হবে। বিভিন্ন প্রকারের মতবাদ সম্বন্ধে নিরপেক্ষভাবে অধ্যয়ন করতে হবে। বিদ্যার্থীদের সর্বব্যাপক হতে হবে, অর্থাৎ সংকীর্ণতা ত্যাগ করতে হবে। তাদের বুদ্ধি যেন সংকুচিত না হয়। তারা কখনও মনে করবে না যে, তারা তেলেগু-ভাষাভাষী বা ভারতবর্ষের লোক। তারা মনে করবে যে, তারা দ্রষ্টা আর যা কিছু আছে সব দৃশ্য ; এ সকল থেকে তারা পৃথক, ভিন্ন। ধর্মে-ধর্মে, এক ভাষার সঙ্গে আরেক ভাষার যে-বাদবিসম্বাদ চলছে, তারা সে-সকলের উর্ধে। তারা নিরপেক্ষ থেকে এ সকল শুধু অধ্যয়ন করবে। বিদ্যার্থীর এইরকম ব্যাপক বুদ্ধি নিশ্চয়ই লাভ করতে হবে। কিন্তু আজকাল এর বিপরীত ভাবই লক্ষ্য করছি। ভাষাভাষী প্রদেশ গঠন নিয়ে কতই ঝগড়া হল। এতে হৃদয়ের সংকীর্ণতাই প্রকটিত হয়েছে। এই জাতীয় সংকীর্ণতা দূর করতে হবে। বিদ্যার্থীদের উদারতার সঙ্গে চিন্তা করতে হবে আর বলতে হবে—'আমি বিশ্বনাগরিক। সমগ্র জগতে বিশ্বনাগরিকতা স্থাপন করব আমি।' একথাও বলা উচিত নয়—আমি ভারতীয়। বর্তমানের যে নাগরিক সে ভারতীয়। কিন্তু বিদ্যার্থীরা তো ভারতীয়তার উর্ধে উঠতে সমর্থ। তারা ভাববে, 'আমরা বিশ্ব-মানব, আমরা বিদ্যার উপাসক। নিরপেক্ষভাবে চিন্তা করার শক্তি আমাদের আছে। আমরা সংকীর্ণ ও বিশেষ পন্থা অবলম্বনকারী হতে পারিনে।'

—[কর্নুল (অন্ধ্র) ১১-৩-৫৬]

আত্মজ্ঞান + বিজ্ঞান = গান্ধীজ্ঞান

॥ 'গান্ধী-জ্ঞান' কি তা একটু বোঝা দরকার। এদেশে প্রাচীনকালেই আত্মজ্ঞানের উদয় হয়েছিল আর তার পরম্পরা আজ পর্যন্ত অব্যাহত চলে আসছে। এদেশে বিজ্ঞানেরও উদয় হয়েছিল, কিন্তু তার পরম্পরায় ছেদ পড়েছে। আধুনিক যুগে বিজ্ঞানের বিকাশ হয়েছে পশ্চিমে। সামূহিক অহিংসার উদ্ভব হয়েছে আত্মজ্ঞান ও বিজ্ঞানের সংযোগ থেকে। সামূহিক অহিংসাই 'গান্ধী-জ্ঞান'। আমার দৃঢ় বিশ্বাস গান্ধী-জ্ঞানের উপর দুনিয়ার কল্যাণ নির্ভর করছে। শুধু তাই নয়, এর দ্বারা আমরা এই দুনিয়ায় স্বর্গ আনতে পারি। হাইড্রোজেন অক্সিজেনে মিলে যেমন জলের উৎপত্তি হয়, 'সর্বোদয়' বা 'সাম্যযোগ' তেমন আত্মজ্ঞান ও বিজ্ঞানের সহযোগে আসে ॥

—বিনোবা

ছাপায় কিছু ভুল রয়েছে, যেমন :—'যে-স্থান' লাভ করে নয় 'যে-জ্ঞান' লাভ করে (পৃঃ ৩) ; 'সম্ভবত' দুর্বল নয় 'স্বভাবত' দুর্বল (পৃঃ ১৪)।—প্রঃ

সর্বোদয়-সাহিত্য

১।	গীতা-প্রবচন (৩য় সং)	বিনোবা	টা ১·২৫
২।	প্রেমময় বাংলা	ঐ	,, ১·৫০
৩।	সাধনা	ঐ	,, ০·৫৬
৪।	গ্রামে-গ্রামে স্বরাজ	ঐ	,, ০·১৯
৫।	ভূদানযজ্ঞ কি ও কেন (৩য় সং)	শ্রীচারুচন্দ্র ভাণ্ডারী	,, ১·২৫
৬।	গ্রামদান	ঐ	,, ১·০
৭।	যাত্রার পথে	ঐ	,, ০·৯০
৮।	ভূদান-যজ্ঞ ও সর্বোদয় সমাজ	শ্রীবীরেন্দ্রনাথ গুহ	,, ০·২৫
৯।	বিনোবা	ঐ	,, ১·০
১০।	Vinoba and Gandhi	Birendranath Guha	0·19nP.
১১।	ক্রান্তির পথে	দাদা ধর্মাধিকারী	টা ০·২৫
১২।	ভূদান গাথা	নিরুপমা দেবী	,, ০·৬
১৩।	ভূদান গীতি (৪র্থ সং)	...	,, ০·১০
১৪।	প্রার্থনা (৩য় সং)	...	,, ০·৬
১৫।	সারথি (গীতিনাট্য)	মাখন গুপ্ত	,, ০·৩৭
১৬।	সর্বোদয় অর্থব্যবস্থা	গোবিন্দপ্রসাদ মাইতি	,, ১·০
১৭।	আচার্য বিনোবা (২য় সং)	বিধুভূষণ দাসগুপ্ত	যন্ত্রস্থ
১৮।	স্থিতপ্রজ্ঞ-দর্শন	বিনোবা	যন্ত্রস্থ

"কতগুলি পরের কথা ভাষান্তরে মুখস্থ করিয়া মাথার ভিতর পুরিয়া পাশ করিয়া ভাবিতেছ 'আমরা শিক্ষিত'। ছ্যাঃ! ছ্যাঃ! ইহার নাম শিক্ষা!! তোমাদের শিক্ষার উদ্দেশ্য কি? হয় কেরাণিগিরি না হয় একটা দুষ্ট উকীল হওয়া, না হয় বড় জোর কেরাণি-গিরিরই রূপান্তর একটা ডেপুটিগিরি চাকরি—এই ত? ইহাতে তোমাদেরই বা কি হইল, আর দেশেরই বা কি হইল? একবার চক্ষু খুলিয়া দেখ, স্বর্ণপ্রসূ ভারতভূমিতে অন্নের জন্য কি হাহাকার উঠিতেছে! তোমাদের ঐ শিক্ষায় সে অভাব পূর্ণ হইবে কি? কখনও নয়।"

—স্বামী বিবেকানন্দ